প্রস্তুতিপর্ব

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রণে ঃ
রূপা প্রেস
২০৯এ বিধানসরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
প্রণবেশ মাইতি

৪৫.০০

অমলেন্দু চক্রবর্তী
বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কেয়াপাতার নৌকো (১ম ও ২য় পর্ব)

ভাতের গন্ধ

মানুষের যুদ্ধ

আবিষ্কার

স্বর্গের এক বাসিন্দা

সীমারেখা মুছে যায়

॥ এক ॥

নমকপুরা টৌন বা টাউনে আজ তুমুল উত্তেজনা। শুধু আজই নয়, সপ্তাহখানেক আগে যেদিন প্রথম রটে গেল শুধু চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ রামঅবতার চৌবের ছেলে অর্জুন অচ্ছুত গাঙ্গোতাদের মেয়ে কমলাকে বিয়ে করবে সেদিন থেকেই উত্তেজনার শুরু। সেটা চড়তে চড়তে আজ একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে এসেছে। যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে।

পুরো সাত দিন এই শহরটা ঘুমোয়নি, বিপজ্জনক এক ঘোরের মধ্যে তার স্নায়ু টান টান হয়ে আছে।

অসবর্ণ, এমন কি নানা ধর্মের এবং নানা প্রভিন্সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আজকাল আকছার বিয়ে হচ্ছে। তা হ'লে অর্জুন আর কমলার বিয়ে নিয়ে এত হৈচৈ কেন? তার সঠিক জবাব পেতে হলে নমকপুরা সম্পর্কে দু-চারটে খবর জানা একান্তই জরুরী।

নমকপুরা উত্তর বিহারের অতি তুচ্ছ এক শহর। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতের মানচিত্রে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব মিলিয়ে এখানে হাজার চল্লিশ মানুষ। উচ্চবর্ণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং লালদাসিয়া কায়াথ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, বাকি পঞ্চাশ ভাগ অচ্ছুত, গঞ্জু, ধাঙড়, দোসাদ, তাতমা, গাঙ্গোতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। অচ্ছুতদের বেশির ভাগই হিন্দু, তবে কিছু কিছু খ্রিস্টানও রয়েছে। দু-তিন জেনারেশন আগে এরা 'ধরম বদল' করেছে। তবে দশ বারো বছরের ভেতর কনভার্সান বা ধর্মান্তরের কোনো ঘটনা এই শহরে ঘটেনি।

নমকপুরার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় এক পাক ঘুরে এলে মনে হবে, সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো সত্য যুগ এখানে অনড় হয়ে আছে। এমন কোনো রাস্তা বা গলিঘুঁজি নেই যেখানে অন্তত

দুটো করে রামসীতা, বিষ্ণুজি, কিষণজি বা বজরঙ্গবলীর মন্দির পাওয়া যাবে না। তবে শহরের শেষ মাথায় অচ্ছুতটুলির গা ঘেঁষে ছোটোখাটো পুরনো একটা গীর্জা দাঁড়িয়ে আছে, সেটার মাথায় সিমেণ্টের ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি, ভেতরে থাকেন একজন দিশী পাদ্রী।

নমকপুরার উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে রুগ্ণ চেহারার একটা নদী—বরখা। বরখা আসলে কোশীর ফ্যাঁকড়া, কোশীর গা থেকে বেরিয়ে কয়েক মাইল ঘুরে নমকপুরার পাশ দিয়ে অনেক দূরে পূর্ণিয়ার দিকে চলে গেছে। সারা বছর নদীটায় জল প্রায় থাকেই না। শীত এবং শুখা মরসুমে এধারে ওধারে বালির ডাঙা জেগে ওঠে, ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকে হাঁটুভরা চিকচিকে জল, কোথাও আবার তা-ও থাকে না। শীত-গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা নামলে সামান্য একটু স্রোত নামে বরখায়। কিন্তু তা আর ক'দিন? বড়জোর মাস দেড়-দুই, তারপর জল শুকিয়ে ফের নদীর হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে।

নমকপুরার জীবন শুখা মরসুমের বরখার মতোই। সেখানে না আছে ঢেউ, না কোনোরকম চাঞ্চল্য।

এই সেঞ্চুরিতে গোটা পৃথিবী জুড়ে, এমন কি এই ভারতবর্ষেও বিরাট বিরাট সব ঘটনা ঘটে গেছে। দুটো দুনিয়াজোড়া গ্রেট ওয়ার, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, পার্টিসান, স্বাধীনতা—এমনি কত কী। স্বাধীনতার পর আরো কত কিছুই তো হয়েছে—লোকসভা, বিধানসভা, প্রজাতন্ত্র, সংবিধান, পাকিস্তানের সঙ্গে দু দুটো যুদ্ধ, চীনের সঙ্গে একটা লড়াই, স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি—এমনি হাজার রকমের ব্যাপার। এখানকার বাসিন্দারা সে সব আবছাভাবে টের পেয়েছে। তাদের মনে হয়, এগুলি দূরবর্তী কোন অলীক জগতের দুর্বোধ্য কিছু শব্দ। তবে পাঁচ বছর পর পর বিধানমণ্ডলের আর দু বছর পর পর নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটির চুনাও আসে। সেই সময় কয়েকটা দিনের জন্য এখানকার আবহাওয়ায় কিঞ্চিৎ

উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। আসলে মান্ধাতার বাপের আমলের সংস্কার, ছুঁয়াছুতের বিচার, গোঁড়ামি নিয়ে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে নমকপুরা।

মোটামুটি এইভাবেই এই সেঞ্চুরি এবং তারপরেও আরো বহু বহু বছর এখানে কেটে যেত কিন্তু আচমকা পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশের ছেলের সঙ্গে নরকের পোকা গাঙ্গোতাদের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হ'বার পর থেকেই নমকপুরার মাথায় আগুন ধরে গেছে। উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে বামহনদের রক্তে অসহ্য রাগ রি রি করে চলেছে। আর অচ্ছুতটুলি ভয়ে আতঙ্কে একেবারে কুঁকড়ে রয়েছে।

এতদিনে গাঙ্গোতা গঞ্জু ধাঙড়দের পাড়াগুলো পুড়ে সাফ হয়ে যাবার কথা। বামহনটুলির লোকেরা পোষা পহেলবান পাঠিয়ে জীবন্ত অচ্ছুতদের স্রেফ লাশ বানিয়ে বরাখা নদীর বালির তলায় পুঁতে ফেলত। তাদের একটা হাড়ের খোঁজও কেউ কোনোদিন পেত না! এমন কি হাওয়ায় হাওয়ায় এমন খবরও রটে গিয়েছিল, অর্জুন এবং কমলাকেও পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো উধাও করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা যে হ'তে পারেনি, তার কারণ ওরা দু'জন সাতদিন ধরে পুলিশ পাহারায় এস. ডি. ও.'র বাংলোতে রয়েছে এবং তাদের বিয়েও হবে ওখানেই, বিরাট শামিয়ানা খাটিয়ে।

এ বিয়েতে স্বয়ং এস ডি.ও তো থাকবেনই, তা ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে আসছেন ডি.এম, এ.ডি.এম, এস পি, ডি.এস.পি., কালেক্টর, সার্কেল অফিসার থেকে শুরু করে তাবত সরগনা আদমী অর্থাৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা সবাই। আর যিনি আসছেন তিনি একজন বড় মাপের মন্ত্রী। মন্ত্রী প্রায় একটি বাহিনী নিয়ে পাটনা থেকে আসবেন। স্থানীয় এম.এল.এ তাঁকে আনতে চলে গেছেন।

এ তো গেল মন্ত্রী-টন্ত্রী এবং বড় বড় সরকারী অফিসারদের ব্যাপার। এঁরা ছাড়াও থাকবেন, 'জাতিভেদ দূরীকরণ সংস্থান'-এর

কয়েক জন নেতা। এ'রা সবাই আসছেন এই বিয়েকে বিশেষ একটি মর্যাদা দিতে এবং কমলা ও অর্জুনকে আশীর্বাদ জানাতে।

মন্ত্রী, সরকারী অফিসার, পুলিশ যেখানে জড়িয়ে গেছে সেখানে হঠকারী কিছু ঘটিয়ে ফেলতে সাহস হয়নি বামহনদের। অচ্ছুতরা তাই এখন পর্যন্ত কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে আছে এবং তাদের টোলাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি। আর অর্জুন এবং কমলার গায়ে হাত ওঠাতে হ'লে স্বয়ং এস. ডি. ও'র বাংলোয় হানা দিতে হয়। অতটা ঝুঁকি নেবার মতো দুঃসাহস আপাতত বামহনদের নেই। তবে ভেতরে ভেতরে তারা টগবগ করে ফুটছে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটে যাবে, নিশ্চিতভাবে তা বলা যাচ্ছে না।

অর্জুন এবং কমলার বিয়ের ব্যাপারটা নমকপুরায় এই সেঞ্চুরির সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এবং উত্তেজক ঘটনা। এর একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। কিন্তু সে কথা পরে।

এই মুহূর্তে এস. ডি. ও'র বাংলোয় অর্জুনকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কেননা, কয়েক সেঞ্চুরির স্থিতাবস্থা ভেঙেচুরে নমকপুরায় সে-ই প্রথম রেভোলিউসান ঘটাতে চলেছে।

বরখা নদীর ধার ঘেঁষে উঁচু টিলার মাথায় এস. ডি. ও'র বিশাল ব্যাংলো। প্রায় একরখানেক জায়গা জুড়ে এর কমস্পাউণ্ড। মাঝখানে টালির ছাদ-দেওয়া ইট-রঙের দোতলা বাড়ি। সামনে এবং পেছনে ফুলফল এবং সবজির বাগান। বাগানের মাঝখান দিয়ে সুরকির পথ চলে গেছে। পেছনে একতলা সারভেণ্টস্ কোয়ার্টার্স। সেখানে বাগানের মালী এবং ড্রাইভারও থাকে।

বিরাট কমপাউণ্ডটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে প্রকাণ্ড এবং মজবুত লোহার গেট। সেখানে অন্য সময় দু'জন জবরদস্ত সেণ্ট্রি কাঁধে রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয়। কিন্তু এখন অর্জুন আর কমলার নিরাপত্তার কারণে একটা কালো পুলিশ ভ্যানও দেখা যাচ্ছে। সেটা সাতদিন ধরে ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আর গেটের গা ঘেঁষে যে ছোট গোল ঘরটা

দেখা যায় তার ভেতর বেঞ্চ পেতে বসে আছে জন ছয়েক বাড়তি আর্মড গার্ড।

এই বাংলোটা তৈরি হয়েছিল ষাট সত্তর বছর আগে, সেই বৃটিশ আমলে। কলোনিয়াল মাস্টারদের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারটা মাথায় রেখে ইংলন্ডের কান্ট্রি-হাউসের ধাঁচে এটা বানানো হয়।

একতলা দোতলা মিলিয়ে মোট বারোখানা বিশাল বিশাল ঘর। পাঁচ ছ'টা বাথরুম এক শ-দেড় শ জন খেতে পারে এমন বিরাট ডাইনিং হল। যখন ইলেকট্রিসিটি আসেনি তখন ঘরে ঘরে টানা পাখা চলত, সীলিং থেকে ঝুলত ঝাড়বাতি। প্রতিটি কামরার দেওয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জর্জের পাঁচ ফুট লম্বা অয়েল পেইন্টিং আটকানো থাকত। মাঝে মাঝে কোনো পার্টি-টার্টি হ'লে কোরাসে শোনা যেত 'গড সেভ দ্য কিং'। তার সুর বাতাসে রাজভক্তি ছড়াতে ছড়াতে নমকপুরা টাউনের ওপর দিয়ে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে যেত।

স্বাধীনতার পর অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে। ঝাড়বাতির জায়গায় এসেছে ফ্যাশনেবল ল্যাম্পশেড, টানা পাখার বদলে ঝকঝকে নতুন মডেলের ফ্যান, দেয়াল ডিসটেম্পার করা। কামরাগুলো থেকে ভিক্টোরিয়া বা পঞ্চম ষষ্ঠ জর্জকে বিদায় দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে গান্ধীজি, জওহরলাল এবং ইন্দিরার ছবি। বৃটিশ আমলের পুরনো বাংলোটা হুবহু একই রকম রেখে রাজভক্তির জায়গায় দেশভক্তির একটা আবহাওয়া জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বাংলোরই দোতলার একটি ঘরে ডাবল-বেড বড় খাটের বিছানায় বসে আছে অর্জুন। তার চোখ সামনের জানালার দিকে ফেরানো।

ঘরটা চমৎকার সাজানো। অ্যাটাচড্ বাথ ছাড়া, ডান দিকের দেওয়াল-জোড়া ওয়ার্ডরোব, বুককেস, সোফা, মেঝেতে দামী

কার্পেট, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া যে খাটটায় অর্জুন বসে আছে সেটা তো রয়েছেই।

অর্জুনের বয়স চব্বিশ পঁচিশ। পাঁচ ফিট ন'ইঞ্চির মতো হাইট। গায়ের রং টকটকে। জোড়া ভুরু, খাড়া নাক, টান টান শিরদাঁড়া, দৃঢ় চোয়াল, ঘন চুল—সব মিলিয়ে তাকে ঘিরে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে। সূর্য দিগন্তের তলা থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলতে তুলতে আচমকা লাফ দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে।

সময়টা ফাল্গুনের শেষাশেষি। শীত কেটে গেছে কবেই। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তৌহার বা উৎসব হোলি ক'দিন আগেই শেষ হয়েছে। হোলির পরই এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে গরম পড়ে যাবার কথা। কিন্তু এ বছর ফাল্গুনের গোড়া থেকেই মাঝে মাঝে দিন কয়েক বৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণে রোদ এখনও তেমন তেতে ওঠেনি। বাতাসে, বিশেষ করে সকালের দিকটায়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা আমেজ ছড়িয়ে থাকে।

রোদ ওঠার অনেক আগেই আজ উঠে পড়েছিল অর্জুন। তখনও চারিদিকে বেশ অন্ধকার। গোটা নমকপুরা গাঢ় ঘুমের আরকে একেবারে ডুবে ছিল। এমন কি একটা পাখির ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছিল না। সেই থেকে জানালার বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে সে।

এখান থেকে সোজাসুজি তাকালে বরখা নদীর মরা খাতে অজস্র বালি, তার ওপারে ফাঁকা শস্যক্ষেত্র একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে গেছে। একটানা মাঠের মাঝে মাঝে ট্যারাবাঁকা চেহারার সীসম কি সিমার কিংবা পরাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

রোদ ওঠার পর থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরিয়ে পড়েছে। এখন আকাশ জুড়ে শুধু পরদেশী শুগা, মানিক, সিল্লি এবং বুলবুলি। বাতাসে ডানা ভাসিয়ে ডজন ডজন বক এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উড়ে যাচ্ছে।

অর্জুনের ডান দিকেও একটা বড় জানালা। সেটার বাইরে তাকালে নমকপুরা টাউনের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। এখানে বেশির ভাগই টিনের চালের বাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে বেঢপ চেহারার পুরনো একতলা দোতলা। কদাচিৎ দু-চারটে ঝকঝকে নতুন তেতলা চারতলা বাড়িও দেখা যায়। আর দেখা যায় অগুনতি মন্দিরের চুড়ো। রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, ভাঙাচোরা এবং ধুলোয় বোঝাই। পা ফেললে সেখানে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। চারিদিকে আবর্জনার পাহাড়। এ শহরে যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, রাস্তাঘাট বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে বোঝার জো নেই।

অর্জুন শহরের চেহারা দেখছিল না। কিংবা সামনের জানালা দিয়ে দূরের শস্যক্ষেত্র, বরথা নদীর বালি বা পাখিটাখিও লক্ষ্য করছে না। গেটের পাশের কালো পুলিশ ভ্যানটা আবছাভাবে দেখছে সে। মাঝে মাঝেই তার চোখ এসে পড়ছে সামনের ফুল-বাগানের ধারে, যেখানে দু'দিন আগেও ছিল অনেকটা ফাঁকা ঘাসের জমি। এখন সেখানে মোটামুটি বেশ বড় মাপের একটা প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। তার তলায় পূর্ণিয়া থেকে ডেকরেটররা এসে প্রচুর চেয়ার-টেয়ার দিয়ে সাজিয়েছে। একধারে উঁচু একটা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, সেটা লাল টকটকে জুট কার্পেট দিয়ে মোড়া। সেখানে দামী দামী গদি-বসানো অগুনতি চেয়ার। চেয়ারগুলোর মাঝখানে সিংহাসন টাইপের দুটো প্রকাণ্ড সোফা। অর্জুন শুনেছে তাকে এবং কমলাকে ওই সোফা দুটোয় বসানো হবে। বিয়েটা হবে ওখানেই। হোম যজ্ঞ করে বিয়ে নয়, একেবারে সিভিল ম্যারেজ। এজন্য পাটনা থেকে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে আনা হচ্ছে। তিনি আসবেন মন্ত্রীর সঙ্গে।

অর্জুন জানে, তাদের বিয়েতে আসার জন্য এস. ডি. ও. নমকপুরার প্রতিটি মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টের ক'জন এমপ্লয়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সাত দিন সবাইকে এস. ডি. ও'র তরফ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ

জানিয়েছে, তারা এসে যেন অর্জুন এবং কমলাকে শুভ-কামনা ও আশীর্বাদ জানিয়ে যায়।

এ শহরের মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসার জন্য শামিয়ানার তলায় চেয়ারের ব্যবস্থা। বাইরে যা জায়গা আছে তাতেও হাজার কয়েক লোক দাঁড়াতে পারবে।

এই যে বিপুল আয়োজন, এর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য। এস. ডি. ও, ডি. এম, মন্ত্রী, এম. এল. এ এবং সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চান নমকপুরার মানুষ এই বিয়েটাকে স্বাগত জানাক, আন্তরিকভাবে মেনে নিক।

এখানকার মানুষজন সত্যি সত্যিই বিয়ের সময় আসবে কিনা, অর্জুন জানে না। অন্যেরা কে কী করবে, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু বাপুজি মা এবং আত্মীয়স্বজনেরা শেষ পর্যন্ত আসবে কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে অর্জুনের। কেননা সাত দিন আগে তারা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে বাড়ি থেকে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। তা ছাড়া এ বিয়ের আরো একটি মারাত্মক দিক আছে।

মন্ত্রী, এম. এল. এ বা ডি. এম'রা বিয়ে হয়ে যাবার পর চলে যাবেন। এস. ডি. ও চিরকাল তাকে এবং কমলাকে বাড়িতে পুলিশ পাহারায় আশ্রয় দিয়ে রাখবেন না। তখন কী হবে তাদের? মা-বাবা বাড়িতে যদি থাকতে না দেয়, কোথায় গিয়ে তারা দাঁড়াবে? অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তা এবং দুর্ভাবনা চাক চাক বরফের চাঁইয়ের মতো তার মাথায় চাপ দিতে থাকে।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ঘাড় ফেরায় অর্জুন। দেখতে পায় দরজার কাছে মধ্যবয়সী ভরত দাঁড়িয়ে আছে। সে এই বাংলোর আর্দালি।

ভরত সসম্ভ্রমে বলে, 'সাব, মেমসাব আপনাকে নাহানা সেরে ডাইনিং রুমে যেতে বলেছেন।'

অর্জুন লক্ষ্য করেছে, এখানে আসায় ভরত তো বটেই, অন্য আর্দালি এবং চাকর-বাকরেরাও তাকে এবং কমলাকে যথেষ্ট

খাতিরদারি করছে। এতটা খাতির বা সম্ভ্রম তাদের প্রাপ্য নয়। এখান থেকে চলে যাবার পর রাস্তায় দেখা হ'লে হয়ত ওরা চিনতেই পারবে না। যেহেতু এই বাংলোতে আসার পর এস. ডি. ও এবং তাঁর স্ত্রী তাদের দিকে যথেষ্ট নজর দিচ্ছেন, অনবরত সাহস এবং উৎসাহ যুগিয়ে তাদের শিরদাঁড়া শক্ত রাখছেন, চাকর-বাকরদের স্তরেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

খাট থেকে নামতে নামতে অর্জুন বলল, 'ঠিক আছে। আমি আধঘণ্টার ভেতর চলে আসছি।'

'আচ্ছা সাব।' ভরত চলে গেল।

এখানে আসার পর ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের টিফিন এবং রাতের ডিনার—সবই এস. ডি. ও এবং তাঁর স্ত্রী সরযূর সঙ্গে গল্প করতে করতে খায় তারা। কমলা এবং তার প্রতি যত্নের শেষ নেই এই দু'টি মানুষের। প্রায় গোটা নমকপুরা শহর যেখানে তাদের ওপর ক্ষেপে আছে, হাতের কাছে পেলে তাদের টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে তখন এস. ডি. ও চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায় এবং সরযূ যা করছেন, ভাবা যায় না। পৃথিবীতে হৃদয়বান ভালো মানুষের ঘাটতি এখনও হয়নি।

অর্জুন আর দাঁড়ায় না, বড় বড় পা ফেলে সোজা অ্যাটাচড বাথরুমে চলে যায়। সকালে স্নান করা যে তার অভ্যাস, এতদিনে জেনে গেছেন সরযূরা।

আধঘণ্টা পর অর্জুন যখন বিশাল ডাইনিং হলে এল, চন্দ্রকান্ত সরযূ এবং কমলা তার জন্য অপেক্ষা করছে। একটা চেয়ারে বসতে বসতে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, কিছুটা ভয়ে ভয়েই অর্জুন বলল, 'ক্ষমা করবেন, একটু দেরি হয়ে গেল।'

টেবলের উলটোদিকে তার মুখোমুখি বসে আছেন চন্দ্রকান্ত, তাঁর পাশে কমলা। এধারে তার পাশের চেয়ারে সরযূ। এইভাবে মুখোমুখি এবং পাশাপাশি বসে তারা সাত দিন ধরে ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত খেয়ে আসছে।

চন্দ্রকান্তর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ইউ. পি'র বড় বংশের ছেলে। প্রায় ছ'ফিটের মতো হাইট, টান টান চেহারা, গায়ের রং বাদামী, ব্যাকব্রাশ করা ঘন চুল, লম্বাটে মুখ। চোখে পুরু লেন্সের ভারী চশমা। এমনিতে ভয়ানক গম্ভীর। যে বিরাট প্রশাসনিক দায়িত্বে তিনি আছেন সেখানে গাম্ভীর্যটা একান্ত জরুরী। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায়, গাম্ভীর্যের খোলসের তলায় তাঁর মধ্যে একটি মজাদার মানুষ রয়েছে।

চন্দ্রকান্ত দিল্লিতে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছেন। উদার কসমোপলিটান আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের বেশির ভাগই নানা ধর্মের, নানা কমিউনিটির এবং নানা প্রভিন্সের মানুষ। ছুঁয়াছুত, জাতপাতের গোঁড়ামি—এ সব কিছুই তিনি মানেন না।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ডোণ্ট বী সো ফরমাল। তোমাকে আগেই বলেছি, এটাকে নিজের বাড়ি মনে করবে। তোমার জন্যে পাঁচ মিনিট ওয়েট করতে হয়েছে, তাতে এমন কিছু ক্ষতি হয়নি।'

চন্দ্রকান্তর উদারতা এবং মহানুভবতার তুলনা নেই। প্রথম দিন থেকেই তিনি অর্জুনদের লেভেলে নেমে এসে মিশতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু অর্জুনরা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। তারা ভুলতে পারছে না, সামাজিক স্টেটাসের দিক থেকে চন্দ্রকান্ত অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, তিনি এই সাব-ডিভিসনের সবচেয়ে ক্ষমতাবান অফিসার। সঙ্কোচ এবং আড়ষ্টতা, হয়ত এক ধরনের ভয়ও, কোনোভাবেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে।

যাই হোক, অর্জুন উত্তর দেয় না। মুখ নিচু করে বসে থাকে।

সরযূ বেয়ারাকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলে গ্রীবা সামান্য হেলিয়ে পাশের চেয়ারের অর্জুনের দিকে তাকান। মজার গলায় বলেন, 'কেমন লাগছে আজকের দিনটা? এ গোল্ডেন ডে ওফ ইওর লাইফ—তাই না?'

সরযূর বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ। ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় তিনি অনেক লম্বা—প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। মুখ ডিম্বাকৃতি। বড় বড় দুই চোখে বুদ্ধির দ্যুতি। গায়ের রং বিকেলের রোদের মতো হলুদ। নিভাঁজ গলাটি যেন সোনার ফুলদানি। মুঠোয় ধরা যায় এমন সরু কোমর, মসৃণ ত্বক। বাদামী চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। সুগোল হাত দুটি কাঁধ থেকে সটান নেমে এসেছে।

সরযূর পরনে ঘি-রঙের মার্সেরাইজড কটনের শাড়ি এবং ওই রঙেরই জামা। পায়ে হালকা ফোমের স্লিপার। গলায় সরু একটি সোনার হার, মীনে-করা পানপাতার মতো লকেটটা বুকের কাছে ঝুলছে। ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে একটি পান্না-বসানো আংটি। এ ছাড়া সারা শরীরে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য বাঁ হাতের কবজিতে রয়েছে একটি চৌকো ফ্যাশনেবল ইলেকট্রনিকস ঘড়ি।

এই সামান্য সাজেই সরযূকে প্রায় অলৌকিক দেখাচ্ছে।

অর্জুন শুনেছে, চন্দ্রকান্তর মতো সরযূদেরও আদি বাড়ি ইউ পি'তে। তবে তাঁর জন্ম, লেখাপড়া এবং বড় হয়ে ওঠা—সবই কলকাতায়। কলকাতার কসমোপলিটান আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যেও চন্দ্রকান্তর মতো কোনোরকম গোঁড়ামি-টোঁড়ামি নেই। সব রকম নীচতা এবং সঙ্কীর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত। সকল দিক থেকেই তিনি এবং চন্দ্রকান্ত আদর্শ দম্পতি—ইংরেজিতে যাকে বলে 'মেড ফর ইচ আদার'।

সরযূর ছেলেমেয়ে হয়নি এখনও। ফলে তাঁকে বয়সের তুলনায় অনেক কম দেখায়। বড়জোর পঁচিশ ছাব্বিশ।

বিদুষী এবং সুন্দরী এই মহিলাটির ব্যবহার এক কথায় চমৎকার। তাঁর চোখে-মুখে, চেহারায় প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে নিষ্পাপ এক সারল্য।

লাজুক ভঙ্গিতে একবার মুখ তুলেই নামিয়ে নেয় অর্জুন।

সরযূ হেসে হেসে বলেন, 'বিয়েটা লজ্জার কোনো ব্যাপারই না। তোমাদের আগে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বিয়ে করেছে,

পরেও কোটি কোটি মানুষ বিয়ে করবে। তবে তোমরা এখানে যা করতে যাচ্ছ সেটা একটা রেভোলিউসান—একেবারে বিপ্লব। রিবেলদের অত গুটিয়ে থাকলে চলে না। বী স্টেডি অ্যান্ড ব্রেভ।'

অর্জুন মুখ নামানো অবস্থাতেই চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার কমলাকে দেখে নেয়। টেবলের উলটোদিকে কোণাকুণি সে বসে আছে।

কমলার বয়স আঠার উনিশ। লম্বাটে সতেজ চেহারা। গায়ের রং ঝকঝকে কাঁসার ফলার মতো। মুখ ঈষৎ চৌকো ধরনের, নাকটা সামান্য চাপা। অঢেল স্বাস্থ্য তার, কোমর ছাপানো পর্যাপ্ত চুল, ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ, ঝকঝকে সাদা দাঁত। তার সর্বাঙ্গে কোথায় যেন একটা অটুট দৃঢ়তা রয়েছে। এই সকালবেলায় কমলার পরনে মেরুন রঙের শাড়ি, দু হাতে রুপোর নকশা-করা কাংনা বা কঙ্কণ।

এই মুহূর্তে কমলার ঠোঁট দুটি শক্ত করে আঁটা, সারা মুখ আরক্ত। চোখ দুটিতে চাপা হাসির আভা।

সরযূ বলেন, 'জানো, আমি তোমাদের ভীষণ হিংসে করতে শুরু করেছি।'

রীতিমত অবাক হয়েই অর্জুন থুতনি তুলে এবার সরযূর দিকে তাকায়, নিজের অজান্তেই যেন বলে ফেলে, 'কেন ?'

এই সময় বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। পরটা, আলুর তরকারি, বেগুনভাজা, কিছু ফল, প্যাঁড়া এবং চা।

সরযূ নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে প্লেটগুলো সবার সামনে রাখেন। চা টী-কোজির ভেতর সুরক্ষিত থাকে। খাওয়ার পর চা তৈরি করে সবাইকে দেবেন। নিজের হাতে সার্ভ করে অন্যকে খাওয়াতে পছন্দ করেন সরযূ। এটা তাঁর একটা প্রিয় শখ।

চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আদৌ গোঁড়ামি নেই। মাছ মাংস থেকে শুরু করে তাঁরা সমস্ত কিছুই সমান আগ্রহে এবং তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে থাকেন। কমলা সম্পর্কেও সেই

একই কথা। এখানকার অচ্ছুতরা খাদ্যাখাদ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। কিন্তু অর্জুনের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। তাদের প্রচণ্ড গোঁড়া চতুর্বেদী বংশ পুরুষানুক্রমে নিরামিষাশী। মাছ মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, নাম শোনাটাও তাদের কাছে পাপ।

অর্জুনরা আসার পর এই বাংলোয় সবজি এবং দুধ-ঘি-মাখন ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না। এতে খুবই সঙ্কোচ বোধ করেছে অর্জুন। বার বার জানিয়েছে, অন্যরা মাছ মাংস খেলে তার এতটুকু অসুবিধা হবে না। কিন্তু সরযূরা তার কথা কানে তোলেননি।

এক টুকরো পরটা এবং আলুভাজা মুখে পুরে সরযূ বলেন, 'হিংসে হবে না, বল কি!'

তাঁর কথা বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকায় অর্জুন।

টেবলের ওধার থেকে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'সরযূ বলতে চাইছে, আমাদের বিয়েটা ঠিক করেছিলেন আমাদের দু'জনের মা-বাবারা। আমরা শুধু অতি সুবোধ ছেলেমেয়ের মতো সুড়সুড় করে মালা বদল করেছিলুম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ কিছু জানলো না, শুনলো না, কোথাও একটা ধাক্কা লাগলো না, স্রেফ ট্র্যাডিসানাল মামুলি রাস্তায় বিয়েটা হয়ে গেল। আর তোমরা যা ঘটিয়ে বসেছ সেটা হ'ল এক্সপ্লোসান। সারা নমকপুরা টাউন একেবারে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এমন কি পাটনা পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে গেছে। ইউ টু আর ভেরি ফেমাস নাউ। সরযূর হিংসেটা এই কারণে—বুঝেছ?'

সঙ্কোচে নিজেকে গুটিয়ে নেয় অর্জুন।

চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন, 'লাস্ট হানড্রেড ইয়ার্সে এরকম বিয়ের রেকর্ড আর একটিও নেই। এটা এই শহরের একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। ভেরি ভেরি বিগ ইভেন্ট। তোমাদের কথা এখানকার মানুষ কোনোদিন ভুলবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ সরযূ বলে উঠলেন, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার না ডেকে বিয়েটা যদি পুরোহিত দিয়ে করানো সম্ভব হ'ত, তা হলে খুব আনন্দ করা যেত। সবাই এগিয়ে এসে উবটান (গায়ে হলুদ জাতীয় অনুষ্ঠান) থেকে শুরু করে সব রকম নিয়ম-টিয়ম মানা যেত। বিয়ে হবে অথচ পাড়ার মেয়েরা এসে বিয়ের গান গাইবে না, মার্জাদ (বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়ি এলে তাদের আদর-যত্ন করা) হবে না—আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে।' একটু থেমে ফের শুরু করেন, 'আমার বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিয়ের আচার কিছুই মনে নেই, গানটানও জানি না। তা হ'লে আমিই আর্দালিদের বউ-টউদের ডেকে সেসব করতাম।'

ডাইনিং হলের আবহাওয়া মুহূর্তে ভারী হয়ে ওঠে।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়েন চন্দ্রকান্ত, 'সবাই যাতে বিয়েটা মেনে নেয়, সে চেষ্টা তো কম করিনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। সবাই যে যার সুপারস্টিসান আর গোঁড়ামি নিয়ে বসে রইল। এটা ভেঙে তাদের বের করে আনা খুবই ডিফিকাল্ট ব্যাপার।'

অর্জুন অন্যমনস্কর মতো খেতে খেতে চন্দ্রকান্তর কথা শুনে যাচ্ছিল। সে জানে, তারা এই বাংলোতে আশ্রয় নেবার পর চন্দ্রকান্ত নিজে নমকপুরা টাউনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাইকে বুঝিয়েছেন, এ বিয়েটা যেন সবাই মেনে নেয়। এটা অন্যায় কোনো ব্যাপার নয়—খুবই সঙ্গত এবং মানবিক। ছুঁয়াছুত এবং জাতপাতের বিচার নিয়ে থাকলে ভারতবর্ষ এক কদমও ভবিষ্যতের দিকে এগুতে পারবে না, তার প্রগতি চিরদিনের মতো থমকে যাবে। শুধু তা-ই না, কট্টর জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অন্য কেউ হ'লে, উচ্চবর্ণের লোকেরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা প্রচণ্ড ঘৃণায় এবং রাগে লাথি মারত, কিংবা পোষা পহেলবান লেলিয়ে চামড়া তুলে ফেলত কিন্তু এস. ডি. ও-কে ত সেভাবে অভ্যর্থনা করা যায় না। তারা শুধু কঠিন গম্ভীর মুখে

চোয়াল শক্ত ক'রে জানিয়ে দিয়েছে, চন্দ্রকান্ত যেন ক্ষমা করেন, এ বিয়ে তারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

শুধু ব্রাহ্মণ এবং কায়াথদের পাড়াতেই যাননি চন্দ্রকান্ত, অচ্ছুত টুলিগুলোতেও বার বার গেছেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে তারা জানিয়েছে, এ বিয়েতে তাদেরও সায় নেই। কেননা দেওতা-য্যায়সা (দেবতার সমতুল্য) চন্দ্রকান্ত আজীবন নমকপুরায় থাকবেন না। বদলি হয়ে বা প্রোমোশন পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তখন ব্রাহ্মণদের আক্রোশ এসে পড়বে তাদের ওপর। খুন করে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। অচ্ছুতদের মতে এ বিয়ে না হওয়াই মঙ্গল। দু পক্ষই চাইছে স্থিতাবস্থা বজায় থাক। জাতপাত ছুঁয়াছুতের বিচার নিয়ে সোসাইটি হাজার হাজার বছর ধরে যেভাবে পড়ে আছে, সেভাবেই থাক। কোনোক্রমেই তার শান্তিভঙ্গ যেন ঘটানো না হয়।

চন্দ্রকান্ত বোঝাতে চেয়েছেন, দেশটা মগের মুল্লুক নয়, যার যা ইচ্ছা তা করা যায় না। আইন-কানুন বলে কিছু পদার্থ এখনও রয়েছে। তা ছাড়া আপাতত বছর দুয়েক তিনি নমকপুরাতেই আছেন, এখান থেকে ট্রান্সফার হবার কোনোরকম সম্ভাবনাই নেই। আর তিনি যতদিন আছেন, অচ্ছুতদের গায়ে কাউকে একটা আঙুলও ঠেকাতে দেবেন না। যখন তিনি চলে যাবেন, পরের এস. ডি. ও'কে বলে যাবেন অচ্ছুতদের দিকে যেন নজর রাখেন। কিন্তু এত সব প্রতিশ্রুতি দেবার পরও তাদের উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনা এতটুকু কাটেনি। আসলে ওরা নিরাপত্তা বোধ করতে পারছিল না। আবহমান কাল ধরে বামহন-কায়াথদের কাছ থেকে অপমান এবং ঘৃণা পেয়ে পেয়ে এতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পান থেকে চুন খসলে উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাদের ওপর চালিয়েছে চরম নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার। এটা যেন এই অঞ্চলের চিরাচরিত প্রথা। ফলে অচ্ছুতদের মেরুদণ্ডে সাহস বা জোর বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভয়টা তাদের কাছে ধর্মপালনের মতো একটা ব্যাপার।

অচ্ছুতরা, বিশেষ করে কমলার মা-বাপ এবং আত্মীয়স্বজন জোড়হাতে সবিনয়ে জানিয়েছে. চন্দ্রকান্ত যেন এ বিয়ে ভেঙে দেন। এ বিয়ে হলে তারা খুবই বিপন্ন হবে।

কমলার মা-বাপের মতো অর্জুনের মা-বাবাও বিয়েটা ভেঙে দেবার জন্য চন্দ্রকান্তর কাছে প্রচুর আর্জি করেছে। বলেছে, চন্দ্রকান্ত স্বয়ং উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হয়ে আরেকটি সৎ শুধু ব্রাহ্মণ বংশের চরম সর্বনাশ যেন না করেন, কিন্তু তাঁকে টলানো যায়নি। অদম্য এক জেদ চন্দ্রকান্তকে যেন পেয়ে বসেছে। এই বিয়ে তিনি দেবেনই। সংস্কার ভাঙতে হলে কাউকে না কাউকে তো প্রথম এগিয়ে যেতেই হবে।

কমলা এবং অর্জুনের মা-বাপেরা কিংবা নমকপুরার অন্য কেউ এগিয়ে এলে হিন্দু প্রথা মেনে যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে বিয়েটা দেওয়া যেত কিন্তু তা হবার নয়।

অবশ্য চন্দ্রকান্ত একেবারে হতাশ হয়ে পড়েননি। নমকপুরার বাসিন্দারা তাঁকে ফিরিয়ে দেবার পরও একটি জীপে করে নিজের ডিপার্টমেন্টের একটি ক্লার্ককে তিনি ক'দিন ধরে সারা শহরে টহল দেওয়াচ্ছেন। ক্লার্ক ছেলেটি অর্থাৎ অবিনাশ দারুণ কাজের—যেমন চটপটে তেমনি তার টগবগে এনার্জি। সে একটা পোর্টেবল মাইক গলায় ঝুলিয়ে দিনে আট দশ ঘণ্টা করে চেঁচিয়ে নেমন্তন্ন করেছে—সবাই যেন এ বিয়েতে কিরূপা করে যোগ দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরযূ বললেন, 'শেষ পর্যন্ত কেউ না এলে কী আর করা যাবে।' তাঁকে সামান্য হতাশই দেখায়।

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'এ শহরের কে আসবে, কতজন আসবে, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে—'

'তবে কী?'

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে কমলা এবং অর্জুনকে লক্ষ্য করতে করতে হালকা গলায় চন্দ্রকান্ত বলেন, 'তোমাদের বিয়েতে

বরযাত্রী হিসেবে মন্ত্রী, এম. এল. এ., এস. পি., ডি. এম. এমনি অনেকে আসছেন। আমাদের বিয়েতে কিন্তু এত সব ভি. আই. পি আসেননি।'

অর্জুন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আধফোটা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন সরযূ, 'এই যা—

অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকান চন্দ্রকান্ত, 'কী হ'ল ?'

'একটা ভীষণ ভুল হয়ে গেছে।'

'কিসের ভুল ?'

'বিয়ের দিন দুলহা দুলহনকে উপোস থাকতে হয়। আমার একেবারে খেয়াল ছিল না। এদিকে অর্জুন আর কমলা ব্রেকফাস্ট করতে শুরু করেছে।'

একটু চুপ করে থাকেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর মনে সামান্য খুঁত-খুঁতুনি চলতে থাকে। আগে খেয়াল হ'লে অর্জুনদের ব্রেকফাস্টে ডাকা হ'ত না। বিয়ের লগ্ন পর্যন্ত তাদের উপোস করিয়ে রাখতেন। চন্দ্রকান্ত যতই প্রোগ্রেসিভ হোন, যতই জাতপাত ভাঙতে চান, দু-চারটে প্রাচীন সংস্কার তাঁর মধ্যে থেকেই গেছে। তবে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করে নেবার জন্য বলেন, 'এতে দোষ কিছু হয়নি। ওদের তো আনকনভেনশানাল ম্যারেজ। সব সিস্টেম যখন ভাঙতে চলেছে তখন উপোস দিয়ে থাকার মানে হয় না।' অর্জুনরা হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'খাও—খাও—'

দ্বিধাগ্রস্তের মতো আবার খেতে শুরু করে অর্জুন এবং কমলা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কী মনে পড়ায় অর্জুনের চোখে মুখে প্রবল দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরোয়। ভয়ে ভয়ে সে বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

'বিয়ের পর আমাদের কী হবে ?'

'মানে ?'

অর্জুন বলে, 'আমাদের বিয়েতে মা, বাবুজী কি আত্মীয়স্বজন, কেউ আসবে বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ের পর কোথায় গিয়ে উঠব, বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া—'

'কী?' চন্দ্রকান্ত সোজা অর্জুনের মুখের দিকে তাকান।

'আমার তো চাকরি-বাকরি কিছু নেই। কমলা ছোটখাটো একটা কাজ করে। কিন্তু তাতে তো চলবে না।'

'সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা?'

চন্দ্রকান্ত হাসেন। রহস্য কাহিনীর ঢংয়ে বলেন, 'সেটা এখন বলছি না। বিয়ের সময় তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। আর সারপ্রাইজটা দেবেন স্বয়ং মিনিস্টার।'

কী বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সে ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না অর্জুনের।

ব্রেকফাস্ট শেষ হ'তে আটটা বেজে যায়।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে সরযূ বলেন, 'তোমরা সবাই একবার আমার সঙ্গে ওধারের ঘরটায় চল—' আঙুল বাড়িয়ে তিনি দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটা দেখিয়ে দেন।

অর্জুন এবং কমলা উৎসুক চোখে সরযূর দিকে তাকায়, তবে কোনো প্রশ্ন করে না।

তাদের মনোভাব আন্দাজ করে সরযূ সস্নেহে বলেন, 'তোমাদের বিয়ের জন্যে নতুন জামা-কাপড় কেনা হয়েছে। দেখবে চল—'

অর্জুন এবং কমলা দু'জনেই জানে, ক'দিন ধরে তাদের জন্য কী সব কেনাকাটা করছেন সরযূ। এই কারণে একদিন কাটিহারের বড় মার্কেটেও চলে গিয়েছিলেন। কাপড়-চোপড় কী কিনেছেন, সে ব্যাপারে আগে কিছু বলেননি সরযূ। অর্জুনরাও জানতে চায়নি।

তবে তারা ভীষণ সঙ্কোচ বোধ করছে। দু'টি মানুষকে সরযূরা সাত দিন ধরে নিজেদের কাছে রেখেছেন। তার ওপর বিয়ের জন্য যেভাবে খরচ-টরচ করছেন তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করারই কথা। দু-একবার সামান্য বাধা দিতে চেষ্টা করেছে অর্জুন কিন্তু সে সব উড়িয়ে দিয়েছেন সরযূ।

চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর সঙ্গে দক্ষিণের শেষ ঘরটায় এসে একেবারে হাঁ হয়ে গেছে অর্জুনরা। এ ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খাট। দেয়ালের ধার ঘেঁষে আলমারি, ওয়ার্ডরোব ইত্যাদি। এক কোণে নিচু ডিভান। আলাদাভাবে বসার জন্য বেতের দু'টি মোড়ার মাঝখানে ছোট টেবল।

খাটের ওপর ডাঁই-করা রয়েছে অনেকগুলো প্যাকেট এবং বাক্স, প্রচুর কসমেটিকসের ফ্যাশনেবল শিশি, টিউব, কৌটো, দুটো দামী নতুন স্যুটকেস, এমনি প্রচুর জিনিসপত্র।

সরযূ একটার পর একটা প্যাকেট খুলে ঝলমলে শাড়ি বা ট্রাউজার্সের পীস বার করে অর্জুনদের দেখাতে দেখাতে বলতে লাগলেন, 'দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।'

শাড়ি-টাড়ি না দেখে অর্জুনরা বিস্ময়ের মতো সরযূদের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'এ আপনারা কী করেছেন! আমাদের জন্যে এত টাকা কেন নষ্ট করলেন!'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'তোমাদের কি ধারণা, এই সব জিনিস আমরা কিনেছি? অত টাকা আমাদের নেই।'

'তা হ'লে?'

'বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কাছে তোমাদের বিয়ের কথা জানাতে তারা উপহার পাঠিয়েছে। তবে বিয়ের সময় কমলা যে শাড়ি ব্লাউজ আর তুমি যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে সেগুলো আমরা কিনেছি।' চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন, 'আগে জানালে যদি বেঁকে বসো তাই পাঞ্জাবিটা আর অর্ডার দিয়ে বানানো হয়নি। তোমার মাপ আন্দাজ করে রেডিমেড কেনা হয়েছে।'

অর্জুনের আর কিছু বলার নেই, সে চুপ করে থাকে।

এদিকে ছোট ছোট ভেলভেটের ক'টি বাক্স খুলে সরযূ এক সেট রুপোর গয়না বার করে কমলাকে দেখান, 'এগুলো তোমার।'

কমলা অত্যন্ত বিব্রতভাবে বলে, 'জামাকাপড়ই তো যথেষ্ট। আবার গয়না কেন?'

সরযূ স্নিগ্ধ হাসেন, 'না সাজিয়ে কি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো যায়?'

কমলার কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কী উত্তর দেবে, সে ভেবে পায় না। সরযূ এবং চন্দ্রকান্তকে যত দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে কমলারা। তাঁদের উদারতা আর মহানুভবতায় তারা অভিভূত।

সরযূ বলেন, 'বিয়ের সময় আমি নিজের হাতে তোমাকে সাজিয়ে দেব।'

কৃতজ্ঞ কমলা তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

॥ দুই ॥

দুপুর থেকেই পুরোদমে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মন্ত্রী এবং এম. এল. এ আসছেন। তাঁরা অর্জুনদের বিয়ের সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। সমাজে অসবর্ণ বিয়ের উপকারিতা এবং ভারতবর্ষকে প্রগতির দিকে কয়েক কদম এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এর উপযোগিতা সম্পর্কে অবশ্যই একটি করে জমকালো ভাষণ দেবেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ডেকরেটররা মাইক নিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝেই 'হ্যালো মাইক টেস্টিং, এক দো তিন চার—' ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ মাইকটা কতখানি ঠিক আছে তা দেখে নেওয়া হচ্ছে। পরে মিনিস্টারদের বক্তৃতার সময় গোলমাল হলে বিশ্রী ব্যাপার হবে।

এত সব গণ্যমান্য লোক আসবেন। তা ছাড়া বিয়ে বলে কথা। সবার ভোজনের জন্য দু'দিন আগেই কিছু লাড্ডু, প্যাঁড়া, গুলাবজামুন এবং নিমকিনের অর্ডার দিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত। দুপুর হ'তে না হ'তেই পূর্ণিয়া থেকে মিঠাইবালার লোকেরা মাতাডোর ভ্যানে করে সেগুলো পেঁছে দিয়ে চলে গেছে। এই মিঠাই-টিঠাইয়ের খরচা দিচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

এখন আড়াইটার মতো বাজে। চারটে নাগাদ মিনিস্টার এম. এল এ এবং অন্যান্য ভি. আই. পি'দের পেঁছে যাবার কথা। মাঝখানে ঘণ্টা দেড়েক মাত্র সময় রয়েছে।

সরযূ লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সোজা উত্তর দিকের একটা ঘরে চলে এলেন। সঙ্গে তাঁদের আর্দালি ভরতের স্ত্রী পার্বতী। পার্বতী ভারী চেহারার মেয়েমানুষ। কপালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার ঘোমটা টানা। হাতে পেতলের রেকাবিতে নতুন আয়না, চিরুনি, তেল, বাটা হলুদ, গন্ধ তেলের শিশি এবং দই ভর্তি একটা বাটি। সরযূর হাতে রয়েছে একটা ব্যাগ। তাতে সাজের নানা জিনিসপত্র।

যে ঘরে সরযূরা এসেছেন সেটা কমলাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে কমলা জানালার মোটা মোটা গরাদ ধরে বাইরের 'লন'-এ বিরাট শামিয়ানাটার দিকে দুরমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে। হয়তো অর্জুনের সঙ্গে জড়ানো অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে সরযূ কোমল গলায় ডাকলেন, 'কমলা—'

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় কমলা। সরযূর সঙ্গে পার্বতী এবং তার হাতের রেকাবিটা দেখে রীতিমত অবাকই হয়। কয়েক পলক দু'জনকে লক্ষ্য করার পর পায়ে পায়ে সরযূর কাছে এগিয়ে আসে।

সরযূ সস্নেহে বলেন, 'সময় আর বেশি নেই। এবার তোমাকে স্নান করিয়ে নিজের হাতে সাজিয়ে দেব। আমি উত্তর প্রদেশের মেয়ে, থেকেছি কলকাতায়। এখানকার বিয়ের ব্যাপারটা-ট্যাপার কিছুই প্রায় জানি না। তাই পার্বতী বহীনকে ডেকে নিয়ে এলাম।' একটু থেমে কিছুটা আক্ষেপের গলায় আবার বলেন, 'আগে পার্বতী বহীনের কথা মনে পড়লে সব নিয়ম মানা যেত। কেন যে পড়ল না! আমারই ভুল। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাকি যেটুকু আছে সেটুকু করা যাক, না কি বল পার্বতী বহীন?'

সরযূ এবং চন্দ্রকান্তর ভদ্রতা, রাহান-সাহান এবং ব্যবহার একেবারে অন্যরকম। দুজনে দুই ধরনের কসমোপলিটান আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষকে তাঁরা সম্মান দিতে জানেন। না হ'লে সামান্য আর্দালির স্ত্রীকে 'বহীন' বলতেন না। আসলে যারাই তাঁদের বাংলোর কাজ-টাজ করে, বা চন্দ্রকান্তর অফিসে সাব-অর্ডিনেট স্টাফ, তাদের সবাইকে ভাই বা বহীন বলে থাকেন।

সরযূ এবার বলেন, 'পার্বতী বহীন, যা করার শুরু করে দাও—'

পার্বতীর যথেষ্ট বয়স হলেও অত্যন্ত লাজুক ধরনের মানুষ। পুরুষ হোক, মহিলা হোক, কারো সামনেই সে ঘোমটা ছাড়া বেরোয় না। কথা বলে খুব আস্তে আস্তে। মৃদু গলায় সে বললো, 'কমলা বহীন, বৈঠো—' বলে ঘরের মেঝে দেখিয়ে দেয়।

কমলা নিঃশব্দে বসে পড়ে। তার মুখোমুখি বসেন সরযূ এবং পার্বতী।

পার্বতী বলে, 'চুল খুলে ফেল।'

বাধ্য বালিকার মতো চুল খোলে কমলা। এবার পার্বতী বলে, 'পেছন ফিরে বসো।'

কমলা সেভাবেই বসে। এবার পার্বতী প্রথমে সযত্নে তার চুলে চিরুনি চালিয়ে জট-টট ছাড়িয়ে, সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেয়।

তারপর ফের তাকে ঘুরে বসতে ব'লে সারা মুখে, গলায়, হাতে এবং পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের নানা জায়গায় তেল-হলুদ মাখাতে মাখাতে গুনগুন করে চাপা দেহাতি সুরে বিয়ের গান গাইতে থাকে।

'আঙ্গনকে আজ আয়া মোরী সামহাল করকে
ইঁহা হ্যায় গরীব আঙ্গন, তুমি তো সপুত সাজন
ধীরেসে আপনে প্যারকো রাখনা সামহাল করকে
দাদা ও তেরে আয়া আভী বরাতী বনকে
দাদী যে তেরি আয়ী............'

তেল হলুদ মাখানো হয়ে গেলে পার্বতী বলে, 'যাও, নাহানা করে এসো।'

একটা সাদামাঠা আটপৌরে শাড়ি, জামা এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমে চলে যায় কমলা। সরযূ আর পার্বতী বসেই থাকে।

সরযূ বলেন, 'স্নান হয়ে গেলে আমি কিন্তু সাজিয়ে দেব কমলাকে। তুমি নজর রাখবে কোনো ভুলটুল হচ্ছে কিনা।'

পার্বতী বিনীত ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়।

মিনিট পনের বাদে কমলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে সরযূ ফুল স্পীডে ফ্যান চালিয়ে ওর চুল শুকিয়ে সাজাতে বসেন। পার্বতী আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, কিভাবে দুলহনের চুল বাঁধতে হবে।

কমলার দীর্ঘ ঘন চুল প্রথমে দই এবং কাঁচা সিঁদুর দিয়ে মেখে নেন সরযূ। সেগুলোর ভেতর আট দশখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে প্রচুর লাল-নীল রিবন এবং ক্লিপ দিয়ে বিশাল খোঁপা বেঁধে নাইলনের জাল আটকে দেন। তারপর গুঁজে দেয় প্রজাপতিওলা দুটো রুপোর কাঁটা। প্রজাপতির তলায় লেখা রয়েছে 'সদা সুখী রহো'।

সরযূ পার্বতীর কাছে আগেই শুনেছেন, এত ফিতে, ক্লিপ এবং ভেতরে টাকা গুঁজে খোঁপা বাঁধার কারণ একটাই।

শ্বশুরবাড়িতে পা দেবার পর এই জবরদস্ত জটিল খোঁপা খুলতে হবে দুলহনের ননদকে। চুলের ভেতর অদৃশ্য টাকা তারই প্রাপ্য।

দই এবং সিঁদুর মাখার ফলে চুলটা আর কালো নেই, লাল-সাদা-কালোয় মিশে কেমন যেন একটা রং ধরেছে। তা ছাড়া দইয়ের কারণে চটচটে হয়েও আছে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে গেলে গোটা মাথাটা কড়কড়ে হয়ে উঠবে।

বিহারের এই অঞ্চলে বিয়ের কনের চুল বাঁধাটা এক বিরাট ব্যাপার। সেটা চুকে যাবার পর সরযূ পার্বতীকে জিজ্ঞেস করেন, 'এবার কী করতে হবে?'

'নয়া কাপড়া-টাপড়া পরিয়ে দিতে হবে।'

'তাতেও কি দই-সিঁদুর মাখাতে হয়?'

'নেহ'ী।' পার্বতী বুঝিয়ে দেয় দুলহনের পোশাক পরার ব্যাপারে আর কোনো নিয়ম পালন করতে হয় না। এবার যেভাবে ইচ্ছা সরযূ তাকে সাজিয়ে দিতে পারেন।

দুশ্চিন্তা কেটে যায় সরযূর। হেসে হেসে বলেন, 'বাঁচা গেল। আমার মতো আনাড়ীদের ভীষণ মুশকিল।'

পার্বতীও হাসে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে সরযূ বলেন, 'আচ্ছা, অর্জুনকেও তো তেল হলুদ মেখে স্নান করতে হবে।'

'হাঁ।'

'তার মাথাতেও দই-সিঁদুর লাগাতে হবে নাকি?'

সরযূর অজ্ঞতায় হেসে ফেলে পার্বতী এবং কম্‌লা। মুখে কাপড় দিয়ে পার্বতী বলে, 'নেহ'ী, নেহ'ী, দুলহা নাহান সেরে যেমন চুল আঁচড়ায় তেমনি আঁচড়ে নেবে।'

সরযূ বলেন, 'আমি কম্‌লাকে শাড়ি-টাড়ি পরাচ্ছি। তুমি অর্জুনের ঘরে যাও। তাকে তেল-হলুদ দিয়ে বলবে, নাহানা সেরে নিতে।'

বিব্রত মুখে পর্বতী বলে, 'নেহী, আমি পারব না। বড়ী শরমকি বাত।'

'আরে বাবা, অর্জুন তোমার ছোটো ভাইয়ের মতো। আচ্ছা লেড়কা। ওর কাছে লজ্জার কিছু নেই। যাও—যাও—'

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। অত্যন্ত নিরুপায় হয়েই তেল-সিঁদুর নিয়ে অর্জুনের ঘরের দিকে চলে যায় পার্বতী।

এদিকে সরযূর ব্যাগ থেকে দামী সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি বার করে কমলাকে বলে, 'বাথরুম থেকে পরে এসো।'

শাড়িটাড়ি নিয়ে বাথরুমে চলে যায় কমলা। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলে কাপড়ের কুঁচি এবং ভাঁজগুলো ঠিক করে দিতে থাকেন সরযূ। ব্লাউজের হাতা যেখানে যেখানে কুঁচকে আছে সে সব জায়গা টেনে সমান করে দেন। পোশাকটি পরিপাটি করে পরানো হলে তাকে খাটে বসিয়ে প্রথমে সরু করে চোখে কাজল টেনে, নখে নেল-পালিশ লাগাতে থাকেন। তারপর গলায় হার, কানে করণফুল, নাকে সাদা পাথর-বসানো নাকফুল, হাতে কাংনা এবং চুড়ি, আঙুলে আংটি ইত্যাদি পরিয়ে কমলার সারা গায়ে দামী সেণ্ট ছড়িয়ে দেন। মুহূর্তে ঘরের বাতাস সুগন্ধে ভরে যায়। এবার পাতলা নরম তোয়ালে দিয়ে কমলার মুখ এবং গলা ভাল করে মুছে, তার গালে হালকা রঙের গোলাপী রুজ আলতো করে লাগিয়ে দেন সরযূ। তারপর আঙুল দিয়ে কমলার চিবুকটি সামান্য তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মুখটি দেখতে দেখতে বলেন, 'চমৎকার।'

লজ্জায় চোখের পাতা দু'টি বুজে আসে কমলার।

সরযূ আবার বলেন, 'এমন বহু দেখলে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মাথা ঘুরে যাবে।'

হঠাৎ কমলা চাপা গলায় বলে ওঠে, 'আমার ভীষণ ডর লাগছে বহীনজি।' এই বাংলোতে আসার পর প্রথম প্রথম সরযূকে 'মেমসাহেব' বলত কমলা এবং অর্জুন। তাতে

খুবই ক্ষুব্ধ হতেন সরযূ। তিনিই ওদের 'বহীনজি' বলতে শিখিয়েছেন।

'বিয়ের সময় ঐরকম একটু আধটু ডর সব মেয়েরই লাগে। আমারও লেগেছিল। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি সে ডরের কথা বলছি না।'

'তবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কম্‌লা বলে, 'আচ্ছা আপনারা সত্যিই কি আমাকে আমার সসুরাল পাঠাবেন।'

এবার কম্‌লার ভয়ের কারণটা বুঝতে পারেন সরযূ। সেখানে তার অভ্যর্থনাটা কিরকম হবে, সেটাও মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। খানিকটা অন্যমনস্কর মতো তিনি বলেন, 'বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই তো নিয়ম।'

কম্‌লা আবছা গলায় বলে, 'লেকেন আমাদের এই বিয়েটা তো সব নিয়ম-কানুনের বাইরে।'

বুকের ভেতর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে সরযূর। গাঙ্গোত্রাদের এই সুশ্রী শিক্ষিত এবং অত্যন্ত বিনীত মেয়েটির জন্য তিনি বিষণ্ণ বোধ করেন।

কম্‌লা আবার বলে, 'আমাদের বিয়েতে সসুরাল থেকে কেউ আসবে না মনে হচ্ছে। এর পরও আমরা যদি যাই, বাড়ির ভেতর কি ঢুকতে দেবে?'

কম্‌লার কাঁধে একটি হাত রেখে সস্নেহে সরযূ বলেন, 'তোমাদের মতো সংস্কার ভাঙার সাহস আগের জেনারেশনের মানুষদের নেই। তবু বলব তোমরা তোমাদের কর্তব্য করবে। তারপরও যদি বাড়িতে ঢুকতে না দেয় তখন সোজা এখানে চলে আসবে। আমরা দেখব কী করা যায়। আর কেউ থাক বা না থাক, আমরা তোমাদের পাশে আছি।'

কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে কম্‌লা বলে, 'সে আমরা জানি।'

সরযূ বলেন, 'একটা কথা তোমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার।'

'কী কথা?'

'যারা রিভোল্ট করে তাদের অনেক রকমের কষ্ট স্বীকারের জন্যে তৈরি থাকতে হয়।'

কমলা চুপ করে থাকে। সরযূর কথার মধ্যে যে গভীর ইঙ্গিতটি রয়েছে তা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পার্বতী এসে জানায়, 'গায়ে হলুদ মেখে অর্জুন স্নান সেরে নিয়েছে, এখন সে নতুন পোশাক পরছে।'

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বাইরে চেঁচামেচি হট্টগোল শোনা যায়। চমকে উঠে সরযূরা দেখতে পান, বাংলোর গেটের বাইরে অনেক লোক জমা হয়েছে। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তেজিত-ভাবে কী যেন বলছে। এতদূর থেকে তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটুকু মনে হ'ল, লোকগুলো এ শহরেরই বাসিন্দা।

সরযূ পার্বতীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?'

পার্বতী বলে, 'মালুম নেহী।'

'ভরত ভাইকে পাঠিয়ে খবর নাও তো।'

পার্বতী বেরিয়ে যায় এবং মিনিট পাঁচেক বাদেই ফিরে এসে জানায়, 'নমকপুরার বাগহন আর কায়াথরা একজোট হয়ে এই অসবর্ণ বিয়ের বিরুদ্ধে হল্লা মচাচ্ছে।'

গোঁড়া সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মণদের না হয় উত্তেজিত হবার মতো কারণ আছে। তবে কায়াথরা তাদের সঙ্গে হাত মেলালো কেন? পরক্ষণেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় সরযূর কাছে। ব্রাহ্মণদের ঘরে যে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটতে চলেছে, সেটা যে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, তার কোনো মানে নেই। ব্যাপারটা খুবই ছোঁয়াচে, জঘন্য ধরনের সংক্রামক রোগের মতো। আজ অর্জুন গাঙ্গোতাদের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাল কায়াথদের ঘরের কোনো ছেলে যে গঞ্জু বা ধাঙড়দের একটি মেয়েকে ঘরে এনে ঢোকাবে না, তার

গ্যারাণ্টি কোথায় ? তাই আগে থেকে হুঁশিয়ার হওয়া ভাল। গোড়াতেই বাধা দিলে রোগটা সহজে ছড়াতে পারবে না। তাই উচ্চবর্ণের বামহন কায়াথরা হাতে হাত মিলিয়ে এখানে হানা দিয়েছে। তাই এত হল্লা, এত হৈচৈ, এত স্লোগান।

পার্বতী ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'বহীনজি, কোনো গোলমাল হবে না তো ?'

সরযূ এক পলক পার্বতীকে দেখেই দ্রুত ঘুরে কমলার দিকে তাকান। কমলার মুখ আশঙ্কায় ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে সে।

ভেতরে ভেতরে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সরযূ। কিন্তু পার্বতী এবং কমলাকে তা বুঝতে দিলেন না। তাদের সাহস দেবার জন্য বললেন, 'ওই হল্লাটল্লা ছাড়া আর কিছু করতে ওরা সাহস পাবে না। ভয় নেই।'

পার্বতী বা কমলা উত্তর দিল না। সরযূ সাহস দিলেও কমলা কিন্তু আদৌ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে না। তার বুকের ভেতরটা এত ধকধক করছে যে সেই শব্দ যেন কানেও শুনতে পাচ্ছে।

ভয়ার্ত চোখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কমলার চোখে পড়ল, ঝাঁকে ঝাঁকে আরো অজস্র লোকজন এদিকে এগিয়ে আসছে। সে টের পায়, নিজের হৃৎপিণ্ডটা মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েই একশ' গুণ জোরে লাফাতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে অসহ্য ভয়ে তার বুকের ভেতরটা ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

॥ তিন ॥

এখন চারটে বেজে সতের মিনিট।

এস. ডি. ও'র বিশাল বাংলোটা এই মুহূর্তে গমগম করছে। তার কারণও রয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে ডি. এম, এ ডি এম, এস. পি, সার্কেল অফিসার, জেলা জজ ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে গেছেন। তাঁরা বাংলোর কমপাউণ্ডে পা দিতে না দিতেই পাটনা থেকে মিনিস্টার, স্থানীয় এম. এল. এ, রেজিস্ট্রার এবং আরো কিছু বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে বিশাল এক কনভয় এসে হাজির হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ডজনখানেক ঝকঝকে নতুন মডেলের প্রাইভেট কার এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে।

আগে থেকেই অর্জুন এবং কমলার কারণে বাংলোর কমপাউণ্ডে একটা পুলিশ ভ্যান এবং কয়েক জন আমার্ড গার্ড মজুত ছিল। এখন মন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য আর ব্রাহ্মণ ফাণ্ডামেণ্টালিস্টরা যদি কোনো অপ্রীতিকর ঝঞ্ঝাট বাধায়, সেই আশংকায় এস. পি আরো দু ভ্যান পুলিশ নিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া মন্ত্রীর নিজস্ব সিকিউরিটি গার্ড তো রয়েছেই।

প্যাণ্ডেলের একদিকে যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে সেখানে এখন পাশাপাশি বসে আছেন মন্ত্রী শুকদেও ঝা, এম. এল. এ মঙ্গেরিলাল। এঁরা ছাড়াও রয়েছেন ডি. এম, এ. ডি এম ইত্যাদি। মঞ্চের নিচে প্যাণ্ডেলের বিশাল অংশ জুড়ে যে অগুনতি চেয়ার পাতা রয়েছে সেখানেও কিছু কিছু লোকজন বসে আছে।

মন্ত্রী এসেই প্রথমে নির্দেশ দিয়েছিলেন, গেটটা যেন নমকপুরার মানুষজনের কাছে খুলে দেওয়া হয়। কেননা এই বিয়েটা আন্তরিকভাবে তাদের মেনে নেওয়ার ওপর একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওপর থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে তার ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভাল হয় না।

মন্ত্রীর কথামতো লোহার গেটের বিশাল দুই পাল্লা খুলে দেওয়া হয়েছে।

স্বয়ং ডি. এম মন্ত্রী আসার পর থেকেই মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অনবরত অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন,

সম্মানিত মন্ত্রী শ্রীশুকদেও ঝা'কা তরফসে হাম আপলোগোকা স্বাগত করতা হ্যায়। আপনারা কৃপা করে ভেতরে এসে বসুন এবং একটি মহৎ কাজে আমাদের সাহায্য করুন।

ডি. এম মারফত মন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ কেউ ভেতরে এসে বসে পড়েছে। কেউ কেউ এসেছে নিছক কৌতূহলে। কেননা মন্ত্রী দর্শন তাদের বরাতে কদাচিৎ ঘটে থাকে। হাইওয়ে দিয়ে দৈবাৎ বছরে এক আধ বার হুস করে তাঁদের দামী মোটর প্রচণ্ড স্পীডে বেরিয়ে যায়। গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে তাঁদের মুখ আবছাভাবে দেখা যেতে না যেতেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

মন্ত্রী বা ডি. এম জাতীয় মানুষেরা এদের কাছে সুদূর স্বপ্নজগতের বাসিন্দা। তাঁদের দেখা পাওয়াটা এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এখন, এই মুহূর্তে জলজ্যান্ত এক মন্ত্রী তাঁর চুস্ত-পাঞ্জাবি পরা বিপুল দেহ ঈষৎ এলিয়ে মাত্র বিশ ফুট দূরত্বে প্রকাণ্ড এক চেয়ারে বসে আছেন। ইচ্ছা করলে উঠে গিয়ে তাঁকে ছোঁয়াও যায়। তাঁর শরীরের মাপ এবং ওজনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে চন্দ্রকান্ত ডেকরেটারকে দিয়ে ওই স্পেশাল চেয়ারটা আনিয়েছেন।

ভেতরে যারা এসেছেন তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাইরেই বেশির ভাগ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ-মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র। তবে দুপুর থেকে গলার শির ছিঁড়ে তারা যে চিৎকার করছিল, মন্ত্রী আসার পর সেটা আপাতত বন্ধ আছে। কিন্তু আবহাওয়া রীতিমত থমথমে। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

ডি এম একনাগাড়ে নামতা পড়ার সুরে বলে যাচ্ছেন, 'আইয়ে, আইয়ে, কৃপা করকে অন্দর আইয়ে—'

কিন্তু নতুন করে কেউ আর ভেতরে ঢুকছে না।

এদিকে মন্ত্রীরা আসার পর চন্দ্রকান্তর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই। এতগুলি ভি. আই. পি'র কাছে তিনি অবিরাম ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কারো যেন এতটুকু অসুবিধা না হয়।

যদিও এই বিয়েটা তাঁর একার দায় নয়, মন্ত্রী থেকে প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর, তবু তিনিই সব চাইতে বেশি করে জড়িয়ে গেছেন। তিনি একই সঙ্গে কন্যাকর্তা এবং বরকর্তা। এ বিয়ের ভালমন্দ সব কিছুর দায়িত্ব যেন তাঁরই।

মন্ত্রী শুকদেও ঝা হাতের ইশারায় চন্দ্রকান্তকে কাছে ডেকে বললেন, আর দেরি করে কী হবে, অনুষ্ঠানটা শুরু করে দিন।'

'হ্যাঁ স্যার।' শশব্যস্তে তৎক্ষণাৎ সায় দেন চন্দ্রকান্ত।

'বিয়েটা এই মঞ্চেই হবে তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'দুলেহা দুলেহান কোথায়?'

'আমাদের বাংলোতেই আছে।'

'তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করান।'

মঞ্চ থেকে নেমে চন্দ্রকান্ত সোজা বাংলোর ভেতর চলে আসেন। অর্জুন এবং কমলা তাদের ঘরেই ছিল। কমলার কাছে ছিলেন সরযূ এবং পার্বতী। অর্জুন অবশ্য একাই রয়েছে।

চন্দ্রকান্ত প্রথমে কমলার ঘরে আসেন। সরযূকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা রেডি?'

সরযূ বললেন, 'হ্যাঁ। অনেকক্ষণ কনে সাজিয়ে বসে আছি।'

'এবার ওদের নিয়ে যেতে হবে। মিনিস্টার তাড়াতাড়ি যেতে বলছেন। দানের জিনিসপত্র নিয়ে চল।'

অর্থাৎ যে সব নতুন শাড়ি গয়না সুটকেস নানা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে সেগুলো মঞ্চে নিয়ে যেতে হবে।

একটু অবাক হয়ে সরযূ প্রশ্ন করেন, 'ওগুলো দিয়ে কী হবে? পরে যখন কমলা শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন সঙ্গে দিয়ে দেব।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আরে বাপু, নিজেও তো একটা বিয়ে করেছিলে। সেটা কি ভুলে গেলে?'

'মানে?'

'বিয়ের আসরে দানের জিনিসপত্র সাজিয়ে দিতে হয় না ?'

সরযূর সব মনে পড়ে যায়। ব্যস্তভাবে তিনি বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, তাই তো।'

'তুমি কাউকে দিয়ে শাড়ি জামাগুলো প্যাণ্ডেলে পাঠিয়ে দাও। আমি অর্জুনকে ডেকে নিয়ে আসছি। তারপর একসঙ্গে সবাই বিয়ের আসরে যাব।' বলে আর দাঁড়ান না চন্দ্রকান্ত, সোজা অর্জুনের ঘরে চলে যান।

মিনিট পনের পর দেখা যায় সরযূ এবং চন্দ্রকান্ত অর্জুনদের সঙ্গে করে নিচের শামিয়ানায় চলে এসেছেন। তাদের পেছন পেছন জামাকাপড়, বাসন-কোসন এবং প্রসাধনের জিনিসগুলি নিয়ে এসেছে ভরত, পার্বতী এবং এস. ডি. ও বাংলোর অন্য আর্দালি এবং শোফারদের বৌরা। জিনিসগুলো একটা বড় টেবলে সাজিয়ে দিয়ে পার্বতীরা চলে যায়।

অর্জুন এবং কমলার সঙ্গে প্রথমে মন্ত্রী শুকদেও ঝা'র পরিচয় করিয়ে দেন চন্দ্রকান্ত।

শুকদেও সস্নেহে এবং সহাস্যে বলেন, 'কনগ্রাচুলেসনস। সদা সুখী রহো।'

চন্দ্রকান্তর ইশারায় শুকদেওকে প্রণাম করার জন্য অর্জুন এবং কমলা যখন ঝুঁকে পড়ে, তৎক্ষণাৎ দু'জনকে ধরে ফেলেন তিনি, 'পায়ে ধুলো-ময়লা রয়েছে, হাত দিতে হবে না। রামচন্দ্রজি তোমাদের ভাল করুন।'

এর পর একে একে প্রতিটি গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে অর্জুনদের আলাপ করিয়ে দেন চন্দ্রকান্ত। সবাই তাদের অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ জানান। কামনা করেন দু'জনের দাম্পত্য জীবন যেন আমৃত্যু অটুট থাকে, সুখে এবং মাধুর্যে পূর্ণ হয়।

আলাপ-টালাপের পর দুলহা এবং দুলহনের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে অর্জুনদের বসানো হয়।

শুকদেও স্থানীয় এম. এল. এ মঙ্গেরিলালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'এবার তা হ'লে শুরু করা যাক।'

তৎক্ষণাৎ সায় দেন মঙ্গেরিলাল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ডি. এম সাহেবের আপীলে বিশেষ কাজ হচ্ছে না। আপনি অ্যাসেম্বলিতে লোকাল পীপলদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। মাইকের সামনে গিয়ে বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দয়া করে অনুরোধ করুন, যেন ভেতরে চলে আসে। এ এমন একটা বিয়ে যাতে সব মানুষের পার্টিসিপেসন হ'লে ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই। আমি বলছি স্যার।'

মন্ত্রীর কথা ডি. এম শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি মাইকের সামনে থেকে সরে গিয়ে সসম্ভ্রমে এম. এল. একে বলেন, 'আসুন স্যার—'

বিকেল ফুরিয়ে আসছে কিন্তু এখনও রোদে বেশ ধার। হাওয়া থেকে তাপ জুড়িয়ে যায়নি। সামনের রাস্তায় উল্টো-পাল্টা বাতাসে প্রচুর ধুলো উড়ছে।

মঙ্গেরিলাল মাইকের স্ট্যাণ্ডটা ধরে গাঢ় গলায় শুরু করেন, 'ভাই সব, সম্মানিত মন্ত্রী শুকদেও ঝাঁজি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন, কৃপা ক'রে সকলে ভেতরে আসুন। এখনই শ্রীমান অর্জুন আর শ্রীমতী কমলার শুভবিবাহের কাজ শুরু হবে। আপনাদের আশীর্বাদ ছাড়া এ বিয়ে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।'

গেটের বাইরের একটি লোকও তাঁর কথা শুনছে বলে মনে হয় না। জ্বলন্ত চোখে তারা পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

মঙ্গেরিলাল শুকদেওর কানের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলেন, 'কেউ ভেতরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। ওদের চোখ মুখ লক্ষ্য করেছেন?'

'এখানে আসার পর থেকেই করছি। ভয়ঙ্কর হোস্টাইল।'

'হ্যাঁ স্যার। ওদের মতলব বুঝতে পারছি না।'

শুকদেও মজা করে হাসলেন, 'না বোঝার কিছুই নেই। নিশ্চয়ই ওরা খুশিতে ডগমগ হয়ে এখানে আসেনি। আমি যা খবর পেয়েছি তাতে লোকগুলো খুব সম্ভব গোলমাল পাকাতে পারে। সে যাক, আপনি আরেক বার জানিয়ে দিন বিয়ের কাজ এখনই শুরু হচ্ছে।' ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার কাগজপত্র রেডি তো?'

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বিনোদানন্দ সহায় ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে বসে আছেন। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা। বয়স ষাট-বাষট্টি। লম্বা বোতলের মতো মুখ, ভাঙা গাল। পরনে ঢলঢলে স্যুট। গলা থেকে নেক-টাই ঝুলছে। পায়ে ব্রাউন রঙের চকচকে শ্যু।

বিনোদানন্দ দ্রুত ঢাউস একটা ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বার করে সামনের টেবলে গোছগাছ করে রাখতে রাখতে বলেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমি রেডি। কারা এ বিয়ের সাক্ষী থাকবেন?'

শুকদেও বলেন, 'আমি থাকব, এম.এল এ মঙ্গেরিলালজি থাকবেন, আর থাকবেন এখানকার এস. ডি. ও চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়।'

বিনোদানন্দ সবিনয়ে জানান, 'তিন জনের ঠিকানা দরকার।'

মন্ত্রী, এম.এল এ এবং এস. ডি ও—তিনজনই তাঁদের ঠিকানা জানিয়ে দেন। বড় মোটা একটা খাতায় সাক্ষীর নামধাম দ্রুত টুকে নেন বিনোদানন্দ। তারপর ছাপানো ফর্মে কী সব লিখতে থাকেন।

অর্জুন এবং কমলার নামে তাদের নাম-ঠিকানা এবং দু'জনের বাবা-মা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আগেই পাটনায় বিয়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কাজেই তাদের ব্যাপারে আর কিছু জানতে চান না বিনোদানন্দ।

এদিকে মঙ্গেরিলাল আবার মাইকের সামনে গিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জানান, 'বিয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কেউ যেন আর বাইরে দাঁড়িয়ে না থাকেন, ভেতরে এসে এই মহান ঘটনার সাক্ষী হন।'

এবারও কোনোরকম প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং কায়াথেরা আগের মতোই গেটের বাইরে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

অগত্যা শুকদেও ঝা'কে এগিয়ে আসতে হয়। মঙ্গেরিলাল মাইকের সামনে থেকে সরে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়েন।

মন্ত্রী শুকদেও ঝা'র বক্তা হিসেবে গোটা বিহার জুড়ে বিপুল খ্যাতি। একবার মাইক ধরলে তিনি আর ছাড়তে চান না। কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অ্যানুয়াল সোসালে নাটক-টাটক করার প্রচণ্ড শখ ছিল। সেই নাট্যপ্রতিভাকে তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার সময় কাজে লাগিয়ে থাকেন। কণ্ঠস্বর উঠিয়ে নামিয়ে এবং আবেগ নামক বস্তুটিকে নানা অনুপাতে গলায় মিশিয়ে এমনভাবে অনর্গল বলে যান, যাতে শ্রোতারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়।

শুকদেও ঝা গলার স্বর খাদে নামিয়ে, সামান্য কাঁপিয়ে এভাবে শুরু করেন। 'ভাই সব, ভারতবর্ষ আজ সব দিক থেকেই বিপন্ন। ঘরে-বাইরে তার অনেক শত্রু। বাইরের থেকে কারা শত্রুতাচরণ করছে তা আপনারা সবাই জানেন। এই বিয়ের আসরে, এই আনন্দের মুহূর্তে সে প্রসঙ্গ টেনে আনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের একটা বিরাট বিপদ কোনো কোনো সামাজিক প্রথা।

'আমরা চারদিকে দেখতে পাই মাঝে মাঝেই প্রাদেশিকতা আর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিচ্ছে। মানুষে-মানুষে বিভেদ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে মানুষের শুভ বুদ্ধির ওপর এখনও আমার আস্থা আছে। এই সব অশুভ শক্তিকে সাধারণ মানুষই একদিন ধ্বংস করে দেবে।

'শুধু প্রাদেশিকতা আর সাম্প্রদায়িকতাই না, হিন্দু সমাজে জাতপাতের সওয়ালটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বামহন কায়াথ হরিজন অচ্ছুত—এইভাবে যদি নিজেদের ভাগ করে রাখি, ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে আবহমান কালের এই মহান দেশ।

'আজ আমরা যে কারণে এখানে এসেছি সেটা হ'ল শ্রীমান অর্জুন এবং শ্রীমতী কমলার শুভ বিবাহ। আপনারা সকলেই জানেন অর্জুন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে আর কমলা হরিজন মা-বাপের সন্তান। দু'জনে জাতপাতের দীবার ভেঙে যে মিলিত হ'তে চলেছে সেটা এই নমকপুরা টাউনে একটা মহান ঐতিহাসিক ঘটনা। এমন ঘটনা এই শহরে কেন, সারা বিহারেই আর ঘটেছে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।

'এ জাতীয় বিয়ে একটা বিরাট শুভ লক্ষণ। এমন শাদি যত হয় দেশের পক্ষে তত মঙ্গল, জাতীয় সংহতির ভিত তত মজবুত হবে। জাতপাত আর ছুঁয়াছুতের বেড়া আমরা যত ভাঙতে পারব, মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ভেদাভেদ ততই কেটে যাবে। এই বিশাল দেশ, মহান জাতি তা হ'লে বাঁচবে। এর প্রতিক্রিয়া হবে বহুদূর পর্যন্ত।

'আপনারা অভিমান, জাতপাতের দম্ভ, সংস্কার নিয়ে দূরে সরে থাকবেন না, যারা চিরকাল আপনাদের কাছাকাছি রয়েছে তাদের আরো কাছে টেনে নিন। সব বাউণ্ডারি ভেঙেচুরে অখণ্ড ভারতীয় নেশন আর সোসাইটি গড়ে তুলুন। নইলে দেশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়াথ হরিজন, এমনই ছোট ছোট কামরায় ভাগ হয়ে যাবে। সেটা হবে পুরোপুরি খুদখুশির (আত্মহত্যা) সামিল।

'অর্জুন আর কমলা যে মহান ঐতিহাসিক নজির তৈরি করতে যাচ্ছে, আসুন আমরা তাকে স্বাগত জানাই।'

বক্তৃতা দিতে দিতে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করছিলেন শুকদেও ঝা। যেমনটি আশা করেন, হুবহু সেইভাবেই স্রোতের মতো উপযুক্ত এবং জরুরী কথাগুলি পরপর বেরিয়ে আসছিল।

তাঁর বক্তৃতা যে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে, এমনকি বিরুদ্ধ পক্ষের মানুষেরা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও মনে মনে তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়ে—এ বিষয়ে শুকদেও-এর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

বিহারে ভোট ক্যাচার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। জমায়েতে মানুষ টানার ম্যাজিকটি তাঁর হাতের মুঠোয়। এ ব্যাপারে তাঁর নিজেরও প্রবল আত্মবিশ্বাস।

বক্তৃতার পর দীর্ঘকালের অভ্যাস অনুযায়ী যখন শুকদেও অজস্র হাততালি প্রত্যাশা করছেন, সেই সময় গেটের বাইরে থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা যায়, 'বন্ধ্ করো ইয়ে শাদি, বন্ধ করো ইয়ে বকোয়াস।'

তারপরেই দেখা যায় একটা মাঝবয়সী লোক গেট পেরিয়ে উন্মাদের মতো মঞ্চের দিকে দৌড়ে আসছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের থমথমে আবহাওয়াটাকে চুরমার করে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ব্রাহ্মণ এবং কায়াথরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বন্ধ্ করো ইয়ে শাদি।'

'বন্ধ্ করো, বন্ধ্ করো।'

গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে অন্য লোকগুলোও আগের প্রৌঢ়টির পেছন পেছন ছুটে আসছে। সব মিলিয়ে ক্রুদ্ধ জনতার একটি ঢল যেন।

নিজের প্রতি আস্থা মুহূর্তের জন্য টলে যায় শুকদেও-এর। তিনি বুঝতে পারেন, অমন জমকালো বক্তৃতায় এতটুকু কাজ হয়নি। ব্রাহ্মণ কায়াথদের ক্ষোভ ক্রোধ এবং বিদ্বেষ অটুট রয়েছে। হাজার বছরের সংস্কার কি দশ মিনিটের বক্তৃতায় মুছে দেওয়া যায়?

এই যে পাটনা থেকে একটি তুচ্ছ বিয়ের ব্যাপারে শুকদেও এতদূর ছুটে এসেছেন, এর পেছনে রয়েছে তাঁর সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনা। দু' বছর পর বিধানমণ্ডলের যে চুনাও আসছে তাতে নমকপুরা কেন্দ্র থেকে শুকদেও-এর কনটেস্ট করার ইচ্ছা। এই শহরে হরিজন ভোট রয়েছে শতকরা তিরিশ বত্রিশ ভাগ। তাঁর ধারণা ছিল, সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুনদের বিয়ে দিতে পারলে অচ্ছুতদের ভোট তিনি পুরোটাই পেয়ে যাবেন। তার ওপর

বামহন কায়াথদের ভোট আর কিছু টানতে পারলে তাঁর জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষগুলোর প্রচণ্ড রাগের যা নমুনা দেখা গেল তাতে তাদের একটি ভোটও তাঁর পক্ষে পড়বে কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তা ছাড়া অচ্ছুতটোলি থেকে একজনও এখানে আসেনি। সেটা খুব সম্ভব বামহন-কায়াথদের ভয়ে। এই ভয়টা যদি চুনাও পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় তা হ'লে এ শহর থেকে জিতে বেরিয়ে আসার এতটুকু সম্ভাবনা নেই। যেচে কে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়! পরের নির্বাচনে এখন থেকে দাঁড়াবার আগে দশ বার ভাবতে হবে শুকদেওকে।

প্রথমটা কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না শুকদেও। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে উত্তেজিত ক্ষিপ্ত মানুষগুলোকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এদিকে এস. পি, ডি এম, এ. ডি এম থেকে শুরু করে মঞ্চের সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। এস. পি কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'রুখ যাও, রুখ যাও। এক কদম মাত বড়াও—'

তাঁর হুকুম কেউ কানে তুললো না, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো যেমন ছুটে আসছিল তেমনি আসতে লাগল। এখানে মন্ত্রী এবং অন্যান্য সকলের নিরাপত্তার যাবতীয় দায়িত্ব এস. পি'র। এই লোকগুলো যেভাবে ক্ষেপে উঠেছে তাতে হঠকারিতার বশে হঠাৎ কী করে বসবে, বোঝা যাচ্ছে না। সামনের দিকে দু পা এগিয়ে আর্মড গার্ডদের উদ্দেশে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'হটা দো এ আদমীলোগকো—'

পুলিশরা রাইফেল উঁচিয়ে লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তার আগেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন শুকদেও। রাজনীতি করে করে তাঁর হাড় পেকে গেছে। বামহন-কায়াথদের গায়ে হাত ওঠালে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। না, দু'বছর পরের সাধারণ নির্বাচনের কথা ভাবছেন না শুকদেও। এই

মুহূর্তে যে বিয়েটি তিনি দিতে যাচ্ছেন সেটা অবশ্য পণ্ড হবে না, পুলিশ পাহারায় কোনোরকমে তা চুকিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু বিয়ের পর তাঁরা তো এখান থেকে চলে যাবেন, তারপর অর্জুন আর কমলার হাল কী দাঁড়াবে? পুলিশ দিয়ে কি সব সমস্যার সমাধান হয়?

শুকদেও একটা হাত তুলে পুলিশদের থামিয়ে দেন। তারপর দুই হাত জোড় করে আবেদনের ভঙ্গিতে বলেন, 'শান্ত হো যাইয়ে, শান্ত হো যাইয়ে। আপনাদের যা বলার আস্তে আস্তে বলুন। এত হৈচৈ করলে কাজের কাজ কিছু হয় না।' একটু থেমে লোকগুলোকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে আবার শুরু করেন, 'কৃপা করে আপনারা বসুন।'

শুকদেও এমনিতে খুবই সুপুরুষ। তাঁর ধীর স্থির চেহারায় এবং মার্জিত কণ্ঠস্বরে এমন একটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাতে এবার খানিকটা কাজ হয়। লোকগুলো মঞ্চের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে বসে না। তাদের চোখে-মুখে এখনও প্রবল উত্তেজনা।

শুকদেও হাতজোড় করেই আছেন। স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'বসুন না। বসে বসে কথা হোক।'

লোকগুলো এবারও বসে না।

শুকদেও বুঝতে পারেন, তাঁরা 'চেরিসমা' এই লোকগুলোকে পুরোপুরি টলাতে পারেনি। তবু সবটুকু আশা বা আত্মবিশ্বাস একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর ধারণা এরা যদি একটু শান্ত হয়ে বসে, শেষ পর্যন্ত এদের দিয়ে অর্জুনদের বিয়েটা মানিয়ে নিতে পারবেন।

শুকদেও হেসে হেসে বলেন, 'বসে কথা বললে ভালো হ'ত। যাই হোক, কী বলতে চান বলুন—'

সেই প্রৌঢ় লোকটা—যার বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন, গোলগাল ভারী চেহারা, কাঁচাপাকা চুলে কদমছাঁট, গালে কয়েক দিনের না-কামানো

দাড়ি, পরনে খাটো ধুতি এবং মোটা লং-ক্লথের পাঞ্জাবি, মাথার পেছনে একগোছা মোটা টিকি, পায়ে তালিমারা চপ্পল—আরো একটু এগিয়ে এসে জোড়হাতে অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে বলেন, 'মিনিস্টারজি, আপনি আমাদের রক্ষা (রক্ষা) করুন।' তার হয়ত খেয়াল নেই কিছুক্ষণ আগে শুকদেও ঝা-ই অসবর্ণ বিয়ের পক্ষে সওয়াল করে ঝাড়া দশ মিনিট নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিয়েছেন।

যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড রাগে উন্মত্তের মতো ছুটে এসেছিল, মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব কিছু ভেঙেচুরে ধ্বংস করে ফেলবে, হঠাৎ তাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে রীতিমত হতভম্ব হয়ে যান শুকদেও। বলেন, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এস. ডি. ও সাহেব আমার জাত মারতে চেষ্টা করছেন। আপনি না বাঁচালে আমাদের নরকে যেতে হবে।'

চন্দ্রকান্ত খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্রুত শুকদেও-এর কাছে এসে তাঁর কানে চাপা নিচু গলায় বলেন, 'স্যার, ইনি রামঅবতার চৌবে, অর্জুনের পিতাজি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা শুকদেও-এর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি সাগ্রহে এবং আন্তরিকভাবে বলেন, 'আপনি অর্জুনের পিতাজি—এই অনুষ্ঠানের সব চাইতে সম্মানিত অতিথি। আসুন, মঞ্চে চলে আসুন—' বলে সসম্ভ্রমে মঞ্চে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়ে দেন।

রামঅবতারের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা বিপুল চেহারার এক আধবুড়ো লোক। তার পরনেও ধুতি, তার ওপর বুক-খোলা আধময়লা একটা ফতুয়া। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি মোটা পৈতার গোছা। ভারিক্কী গমগমে গলা যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলে, 'মাফ কীজিয়ে মিনিস্টারজি। রামঅবতার মঞ্চে যাবে না।'

শুকদেও-এর মতো ঝানু পার্লামেণ্টারিয়ানের মুখেও কয়েক সেকেণ্ড কথা যোগায় না। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করেন, 'আপ ?'

লোকটা বলে, 'আমাকে চিনবেন না, বহুত ছোটে আদমী। নৌকরের নাম মান্ধাতা শর্মা।'

চন্দ্রকান্ত শুকদেও-এর কানে আগের মতোই ফিসফিসিয়ে জানান, মান্ধাতা শর্মা নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার।

শুকদেও মান্ধাতার উদ্দেশে বলেন, 'রামঅবতারজি মঞ্চে আসবেন না কেন ? ছেলের শাদিতে বাপ না থাকলে চলে !'

'এর নাম শাদি !' ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁচকে যায় মান্ধাতার।

এদিকে রামঅবতার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নেমে আয় ওখান থেকে। আভ্ভি—' চাপা ক্রোধে তার গলা রি রি করতে থাকে। এখানে প্রবল প্রতাপান্বিত একজন মন্ত্রী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পি বা এস. ডি ও'র মতো ব্যক্তিরা যে রয়েছেন, এবং ওঁদের সামনে তার মতো তুচ্ছ একটি মানুষের যে এভাবে গলা চড়িয়ে কথা বলা উচিত না, সে সব খেয়াল থাকে না রামঅবতারের।

শুকদেও হকচকিয়ে যান। পরক্ষণেই নিজের অজান্তে তাঁর চোখ চলে যায় অর্জুন এবং কমলার দিকে। দু'জনের মুখ ভয়ে আতঙ্কে রক্তশূন্য। তারা ঘাড় নিচু করে বসে আছে। পারলে মাটিতে মিশে যেত যেন।

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর শুকদেও রামঅবতারকে একটু লক্ষ্য করেন। তারপরই তাঁর দুই চোখ এসে স্থির হয় মান্ধাতার মুখের ওপর। শুকদেও-এর স্নায়ুগুলো আবছাভাবে টের পাচ্ছে, যদিও রামঅবতার ছেলের বংশধারাবিরোধী বিবেকহীন কাজের জন্য উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আসলে নেতৃত্বটা মান্ধাতারই হাতে। খুব সম্ভব নমকপুরা টাউনের তাবৎ উচ্চবর্ণের মানুষজনকে জুটিয়ে সে প্রোটেস্ট জানাতে এসেছে।

শুকদেও-এর ধৈর্য অপরিসীম। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় নাটক করার কৌশলটাকে তিনি সময়মতো সঠিক কাজে লাগাতে জানেন। মধুর একটি হাসি ঠোঁটের কোণে ধরে রেখে, আগের কথার খেই ধরে বলেন, 'এটা শাদি নয় কেন ?'

তীব্র গলায় মান্ধাতা বলে, 'ব্রাহ্মণের জাত মারাটাকে আপনি শাদি বলেন ?'

এভাবে তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলতে পারে, মন্ত্রী হবার পর এমন অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি শুকদেও-এর। ইচ্ছা করছিল, লোকটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেন। কিন্তু সেই বিরল নাটকীয় কৌশলটা ভেতরে ভেতরে কাজ করতে থাকে। ঠোঁট থেকে হাসিটাকে তিনি বিচ্ছিন্ন হতে দেন না। অবিচল মধুর গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কি অচ্ছুতদের মানুষ মনে করেন না মান্ধাতাজি ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি। লেকেন স্যার, আপনারা বোধহয় হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ-অচ্ছুত-ছত্রিয় সব বিলকুল বরাবর করে দিতে চাইছেন ?'

হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দেন শুকদেও। বিয়ের এই আসরটাকে ইউনিভার্সিটির ডিবেট ক্লাস কিংবা বিধানমণ্ডলের উত্তপ্ত সভা বলে মনে হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে একটু মজাই অনুভব করেন তিনি। বলেন, 'আমাদের সংবিধান কিন্তু সেইরকমই চাইছে।'

ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে মান্ধাতার মতো নমকপুরার এক নগণ্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের বিন্দুমাত্র ধারণাই নেই। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সচমুচ ?'

'আমার ঝুট বলে ফায়দা আছে ?'

'বামহন-কায়াথ-চামার-গাংগোতা-ধাঙড়, সব কোঈ বরাবর ?'

'সবকোঈ বরাবর। প্রত্যেকের সমান অধিকার, ইকোয়েল রাইটস। দ্যাখেন না চুনাও-এর সময় ব্রাহ্মণের ভোটের যে দাম,

তাতমা কি দোসাদের ভোটেরও সেই একই কীম্মৎ।' ডান হাতের তিন আঙুলে মুদ্রা ফুটিয়ে বলেন, 'এক পাইসা কমতি নেহ্‌ী।'

কথাটা যে শতকরা একশ' ভাগ ঠিক, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কনটেস্ট করে মান্ধাতা সেটা ভাল করেই জানে। বলে, 'চুনাওতে যা হবার হোক, তাই বলে অচ্ছুতের মেয়েকে পুতহু করে তুলতে হবে? ইয়ে ভ্রষ্টাচার।'

'ভ্রষ্টাচার!'

'হাঁ হাঁ, জরুর ভ্রষ্টাচার।' রামঅবতার এবং মান্ধাতার পেছনে যারা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার তারা গলা মিলিয়ে চিৎকার করে ওঠে।

হাসিটা বেশিক্ষণ অম্লান রাখা যায় না। ক্ষোভের গলায় শুকদেও বলেন, 'আপনারা তা হ'লে পুরনো সম্‌স্কার ছাড়তে চান না?'

'সম্‌স্কার তো একদিনে তৈরি হয় না স্যার।' মান্ধাতা বলতে থাকে, 'হাজারো সাল ধরে বাপ, নানা, নানার বাপ, তার বাপ, তার বাপ—সবাই মিলে বুঁদ বুঁদসে এটা বানিয়েছে। এক কথায় আচানক সেটা ছাড়া যায়? এ বিচার ঠিক নেহ্‌ী।'

শুকদেও বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'দিনকাল বদলে যাচ্ছে। সব মানুষকে যদি আমরা সম্মান না দিই, সোসাইটি বিলকুল নষ্ট হয়ে যাবে।'

'যদি হুকুম দেন, গম্ভীর বাত ছেড়ে একটা ছোট্ট কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হাঁ-হাঁ, জরুর।'

'আপনার লেড়কা-লেড়কী আছে তো?'

মান্ধাতার দিক থেকে আক্রমণটা কীভাবে আসছে, সঠিক আন্দাজ করতে না পেরে সতর্ক ভঙ্গিতে শুকদেও বলেন, 'আছে। কেন?'

মান্ধাতা সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'ছেলের

জন্যে অচ্ছুতের ঘর থেকে পুতহু আনতে পারবেন ? মেয়েকে সোসাইটির ভালাই-এর নাম করে হরিজনের ঘরে পাঠাবেন ?'

শুকদেও চমকে ওঠেন। অন্য ব্যাপার হ'লে নমকপুরার সামান্য একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার তাঁর মতো জবরদস্ত মন্ত্রীর কাছে এসে এভাবে চোখের দিকে তাকিয়ে তর্ক করার সাহসই পেত না। কিন্তু এখানে সমস্যাটা হচ্ছে জাতপাতের, ছুঁয়াছুতের এবং চিরাচরিত সংস্কারের। রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিলে ধমকে, ভয় দেখিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সমস্যাটা যেখানে সামাজিক স্তরে সেখানে জোর খাটানো, ভয় দেখানো একেবারেই অসম্ভব। এইসব প্রশ্নে মান্ধাতার মতো ফাণ্ডামেণ্টালিস্টরা আদৌ আপস করে না। সামাজিক লেভেলে কোথাও একটু পরিবর্তন দেখা দিলে কিংবা পুরনো অভ্যাস, ধ্যানধারণা এবং সংস্কারের গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়লে এরা একেবারে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ায়। এইসব ব্যাপারে তারা ভয়ংকর বেপরোয়া আর একরোখা।

মান্ধাতা যে প্রশ্নটা করেছে তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না শুকদেও। প্রথমটা তিনি হকচকিয়ে যান। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ ক'রে একজন ঝানু রাজনৈতিক নেতা এবং পার্লামেণ্টারিয়ানকে কতক্ষণ আর কাবু করে রাখা যায় ? শুকদেও বলেন, 'সেরকম কোনো ঘটনার সম্ভাবনা এখনও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মান্ধাতা নাছোড়বান্দা জেদে বলে যায়, 'যদি সেরকম হয় কী করবেন ?'

নিজের মনের দিকে চোখ না ফিরিয়ে শুকদেও বলেন, 'যদি তেমন কিছু হয়, মেনে নিতে হবে। তবে—' এই পর্যন্ত বলে তিনি হঠাৎ থেমে যান।

'তবে কী ?'

'এসব বিয়েতে ছেলে বা মেয়ের বাপ-মা তো আগ বাড়িয়ে সম্বন্ধ করতে যায় না। ছেলেমেয়েরাই বিয়ে ঠিক করে, যেমন অর্জুন আর কম্‌লা করেছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শুকদেও আবার বলেন, 'অনেকটা সময় গেল। এবার তা হ'লে আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে বিয়ের কাজটা শেষ করে ফেলা যাক।'

'নেহী।' মান্ধাতা বলে, 'নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে একজন শুধু ব্রাহ্মণের জাত নষ্ট করবেন না স্যার।'

শুকদেও বলেন, 'জাত নষ্ট হবে না, বরং ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব এতে বাড়বে। এ বিয়ে বন্ধ করা যাবে না।'

ক্রুদ্ধ চোখে শুকদেওকে এক পলক দেখে মান্ধাতা রাম-অবতারকে বলে, 'চল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাপ কর্মের সাক্ষী হতে পারব না। দেখব, অর্জুন অচ্ছুতিয়ার মেয়েকে নিয়ে কী করে নমকপুরায় ঘর করে?'

আচমকা মাথায় প্রবল রক্তচাপ অনুভব করেন শুকদেও। এতক্ষণের সহিষ্ণুতা শেষ বিপজ্জনক সীমাটি পার হয়ে যায়। তিনি গম্ভীর থমথমে গলায় বলেন, 'একটু দাঁড়ান।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কর্তৃত্বের সুর রয়েছে যাতে পা বাড়াতে গিয়েও রামঅবতার মান্ধাতা এবং অন্য সবাই থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

শুকদেও আগের সুরেই বলে যান, 'একটা কথা সবাইকে জানিয়ে রাখছি, অর্জুন আর কম্‌লার যদি কোনো ক্ষতি হয়, তার ফল অনেক দূর গড়াবে। সরকার থেকে ওদের ওপর যে কোনো হামলার মোকাবিলা করা হবে। আমি এস. ডি. ও-কে সব বলে দিয়ে যাচ্ছি। ইয়ে হুঁশিয়ারি ইয়াদ রাখনা চাহিয়ে।'

মান্ধাতা বা অন্য কেউ উত্তর দেয় না। হিংস্র চোখে একবার শুকদেওকে দেখে আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

রামঅবতারও তাদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, শুকদেও পেছন থেকে ডাকেন, 'রামঅবতারজি, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

রামঅবতার রীতিমত ঘাবড়ে যায়। মন্ত্রীকে চটানো যায় না, আবার মান্ধাতারা অসন্তুষ্ট হ'লেও বিপদের কথা। কেননা মান্ধাতাদের সঙ্গে তাকে আমৃত্যু এই শহরে থাকতে হবে।

দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে রামঅবতার। ভয়ে ভয়ে একবার মন্ত্রীর দিকে তাকায়, আরেক বার মান্ধাতার দিকে।

মান্ধাতার হয়ত কিঞ্চিৎ করুণাই হয়। সে বলে, 'রামঅবতার, তুমি মন্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলে এসো। আমরা যাচ্ছি।' বলেই সে এবং তার সঙ্গীরা চলে যায়। এমন কি আগে যারা এসে শামিয়ানার তলায় বসেছিল, তারাও মান্ধাতাদের পেছন পেছন গেট পেরিয়ে রাস্তার বাঁকে উধাও হয়।

মন্ত্রী, কিছু সরকারী কর্মচারী, জনকয়েক আর্মড গার্ড, এস. ডি. ও'র কিছু আর্দালি, ড্রাইভার এবং তাদের ঘরবালীরা ছাড়া শামিয়ানার তলায় এখন আর কেউ নেই।

শুকদেও পরম সমাদরে রামঅবতারকে মঞ্চে ডেকে নেন। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ওপরে উঠে আসতে হয়। শুকদেও তার হাত ধরে নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসিয়ে দেন।

ভয়ে উৎকণ্ঠায় রামঅবতারকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। সে শুকনো গলায় বলে, 'বহুত বিপদে পড়ে গেলাম মিনিস্টারজি?'

শুকদেও প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, কী হ'ল?'

'ওরা চলে গেল। আপনি আমাকে রুখে দিলেন। পরে ওরা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে আমার জীওন বরবাদ করে দেবে।' বলতে বলতে রামঅবতারের বুকের ভেতর থেকে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দেখে মনে হয়, দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে সে একেবারে ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

রামঅবতারের দুর্ভাবনা এবং শঙ্কার কারণ যে মান্ধাতা এবং এই শহরের উচ্চবর্ণের লোকজন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শুকদেও-এর। তিনি তার কাঁধে একটা হাত রেখে কোমল গলায় বলেন, 'দেশ থেকে আইন-কানুন-থানা-পুলিশ আদালত—এসব উঠে যায়নি রামঅবতারজি। চিন্তা নেহী করনা—'

'আমি প্রাণের ভয় করছি না।'

'তা হ'লে ?'

রামঅবতার জানায়, গাঙ্গোতার মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুললে ব্রাহ্মণ সমাজে তারা বিলকুল পতিত হয়ে যাবে। মান্ধাতারা তাকে নিশ্চয়ই অচ্ছুত বানিয়ে ছাড়বে।

শুকদেও চমকে ওঠেন। এ ধরনের বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা তিনি আগে ভেবে দেখেন নি। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলেন, 'প্রথম প্রথম থোড়াকুছ গোলমাল হবে। দুনিয়ায় নতুন কিছু কেউ কি সহজে মেনে নিতে চায় ? তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। সব কুছ টাইমকা সওয়াল। ডরিয়ে মাত।'

শুকদেও-এর একটি কথাও রামঅবতারের মস্তিষ্কে ঢোকে না। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে সে বলে, 'সত্যনাশ হো গিয়া। জাতও যেতে বসেছে। নরকের থুতুও চাটতে হবে, লেকেন পেটও ভরবে না।'

বুঝতে না পেরে শুকদেও বলেন, 'মতলব ?'

'দেখুন মিনিস্টারজি, অর্জুন যে কাণ্ড করে বসেছে তাতে আমার জাতের লোকেরা তো ক্ষেপে উঠেছে, রিস্তেদাররা কোনো সম্পর্ক রাখবে না, দেখা হ'লে গায়ে থুতু দেবে। তার ওপর ছেলেটা বেকার। এতদিন তাকে পুষছিলাম। এখন যদি আপনারা জবরদস্তি অচ্ছুতদের মেয়েটাকে আমাদের ঘরে পাঠান, বিলকুল মরে যাব। নিজেরাই বা খাব কী, ওদেরই বা কী খাওয়াব ? আমি গরীব লোক।'

শুকদেও ভেবেছিলেন, আরো মারাত্মক কিছু শোনাবে রামঅবতার। তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ আরাম বোধ করেন। বলেন, 'এ নিয়ে ভাববেন না, আমরা আগের থেকেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

বিমূঢ়ের মতো রামঅবতার জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা ?'

'আগে বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর বলছি।' বলেই শুকদেও

এবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বিনোদানন্দ সহায়ের দিকে তাকান. 'বিনোদানন্দজি, আপনি শুভকাজটা এবার সেরে ফেলুন।'

বিনোদানন্দ সসম্ভ্রমে বলেন, 'আমি পেপার রেডি করে বসে আছি। দুলহা-দুলহন আর সাক্ষীরা সই করলেই কাজটা চুকে যাবে স্যার। মিনিট দশকের বেশি সময় লাগবে না।'

শুকদেও বলেন, 'এই হিস্টোরিক্যাল ইভেণ্টের আমি একজন সাক্ষী থাকতে চাই। চন্দ্রকান্তজি দুলহা-দুলহনের শুভফাদার। তিনিও একজন উইটনেস হোন। আর অর্জুনের বাপুজি রামঅবতার চৌবেজি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমার ইচ্ছা তিনিও একজন সাক্ষী থাকুন।'

শশব্যস্ত এবং অত্যন্ত বিপন্ন মুখে রামঅবতার বলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার।'

'ক্ষমা কেন ?'

'আমাদের বংশে কাগজে সই করে কারো কখনও বিয়ে হয়নি। আমি পরম্পরা ভাঙতে পারব না।'

শুকদেও বললেন, 'আপনার ছেলে তো ভেঙেছে।'

'ভাঙুক। আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না।'

শুকদেও বুঝতে পারছেন, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই রামঅবতার এখানে বসে আছে। কিন্তু তার সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন মন কোনোভাবেই এ বিয়েতে সায় দিতে পারছে না। সে মন্ত্রীকে চটাতে পারছে না, আবার জাতপাতের বাউণ্ডারি পেরিয়ে আসতেও সাহস করছে না। দুইয়ের মাঝখানে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো আটকে গেছে। এই অসহায় ভীরু মানুষটার ওপর জোরজার করতে আর ইচ্ছা হ'ল না শুকদেও-এর। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাকে সাক্ষী থাকতে হবে না। ডি. এম সাহেবকে তিন নম্বর উইটনেস হতে অনুরোধ করছি।'

শুকদেও-এর ডান পাশে বসে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তক্ষুণি বলে উঠলেন, 'আমি রাজি স্যার। এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারব জেনে খুব ভাল লাগছে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই ছাপানো খাতার খোপ-কাটা ঘরে সই-সাবুদ হয়ে যায়। প্রথমে সই করে অর্জুন এবং কমলা, তারপর একে একে সরকারী প্রশাসনের তিন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

স্টেনলেস স্টীলের রেকাবিতে রাখা নতুন সিঁদুর কৌটোটা তুলে অর্জুনের হাতে দিতে দিতে বিবেকানন্দ সহায় বলেন, 'ধরমপত্নীর কপাল আর সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে দাও।'

অর্জুন কাঁপা হাতে কমলাকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে নমকপুরায় ব্রাহ্মণ-হরিজন বিয়ের প্রথম ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি মোটামুটি শেষ হয়।

এবার শুকদেও অর্জুনদের বলেন, 'এত মানুষকে সাক্ষী রেখে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। সবাইকে প্রণাম করে নাও।'

অর্জুন এবং কমলা প্রথমেই শুকদেও-এর দিকে এগিয়ে আসছিল। তিনি বলে ওঠেন, 'আমাকে পরে। আগে বাবুজিকে প্রণাম কর বেটা—' ব'লে রামঅবতারকে দেখিয়ে দেয়।

রামঅবতার প্রায় আঁতকে ওঠে। রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলতে চায়, 'নেহী নেহী—' কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না। তার আগেই অর্জুনরা এসে তাকে প্রণাম করেছে।

কমলা যখন ঝুঁকে রামঅবতারের পা ছোঁয়, তার সমস্ত শরীর একটা পিছল ঘিনঘিনে অনুভূতিতে গুটিয়ে আসতে থাকে। তার গায়ে এই প্রথম একটি অচ্ছুতের ছোঁয়া লাগল। যদিও মন্ত্র পড়ে গাঙ্গোতাদের মেয়েটা গোত্রান্তরিত হয়নি, তবুও আইনতঃ এতগুলো মান্যগণ্য মানুষের সাক্ষির জোরে সে তার পুতহু হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজন্মের সংস্কারে তার স্পর্শে রামঅবতারের ধমনীতে প্রবাহিত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্ত পুরোপুরি অপবিত্র হয়ে যায়। সে একেবারে কাঠ হয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে।

এরপর একে একে শুকদেও থেকে শুরু ক'রে সরযু পর্যন্ত সবাইকে প্রণাম করে অর্জুনরা। শুকদেওরা আন্তরিকভাবেই

আশীর্বাদ করেন, 'সদা সুখী রহো। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

প্রণামের পর অর্জুন এবং কমলা তাদের নির্দিষ্ট চেয়ার দু'টিতে গিয়ে বসলে শুকদেও উঠে দাঁড়িয়ে এভাবে শুরু করেন, 'আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সবাইকে, এবং বিশেষ ক'রে রামঅবতারজিকে একটা সুখবর দিচ্ছি। সরকার সম্প্রতি একটা কানুন পাশ করেছে। ব্রাহ্মণ কায়াথ যা অন্য উঁচু জাতের ছেলেমেয়েরা যদি অচ্ছুতের ঘরে বিয়ে করে, তাদের সরকারি নৌকরি আর পাঁচ হাজার টাকা নগদ উপহার দেওয়া হবে।

'আপনাদের আরো জানাই, নমকপুরায় হরিজন মেয়েকে বিয়ে করার জন্য এখানকার ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে অর্জুনের নৌকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আর উপহারের টাকা আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি। বলতে পারেন এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য এটা সরকারি তরফের যৌতুক।'

শুকদেও-এর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই নিঃশব্দে, প্রায় যান্ত্রিক কোনো পদ্ধতিতে তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট একটি কারুকাজকরা সুদৃশ্য কাঠের বাক্স এনে হাতে তুলে দেয়। বাক্সটা লাল সিল্কের রিবনে বাঁধা।

এবার একটি চতুর ডিপ্লোম্যাটিক চাল চালেন শুকদেও। বাক্সটি খুলে তার ভেতর থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বের ক'রে অর্জুনকে ডেকে বলেন, 'এই নাও বেটা, আসছে মাসের পয়লা তুমি অফিসে জয়েন করবে।'

এ জীবনে চাকরি পাবে এবং স্বয়ং একজন প্রবল প্রতাপশালী মন্ত্রী নিজের হাতে ক'রে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেবেন, এ ছিল অর্জুনের পক্ষে একান্তই অভাবনীয়। কৃতজ্ঞ, অভিভূত অর্জুনের চোখের কোণে কোনো অদৃশ্য অশ্রুবাহী শিরা সিরসির করতে থাকে। শুকদেও ঝা নামে এই মানুষটি দেবদূতের মতো

এসে তাকে যেন পুনর্জন্ম দিয়ে গেলেন। নিজের অজান্তে কখন যে তার মাথা শুকদেও-এর পায়ে নুয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই।

অর্জুনকে তুলে শুকদেও বুকে জড়িয়ে ধরেন। তার প্রতিক্রিয়াটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। একসময় তাকে মুক্ত ক'রে গাঢ় আবেগে বলে ওঠেন, 'যাও বেটা, বসো—'

অর্জুন চলে গেলে রামঅবতারকে ডাকেন শুকদেও, 'একটু কষ্ট ক'রে এখানে আসুন রামঅবতারজি—'

রামঅবতার অবাক বিস্ময়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। মান্ধাতাদের সঙ্গে মাথায় বারুদ ঠেসে যখন সে ছেলের বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আসে তখন এত বড় একটা চমকের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। আচ্ছন্নের মতো সে উঠে আসে।

শুকদেও-এর হাতে বাক্সটা খোলাই ছিল, তার ভেতর নতুন করকরে একশ' টাকার পঞ্চাশখানা নোট সিল্কের সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাক্সটা রামঅবতারের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'এটা আমাদের দিক থেকে আপনাকে ভেট। ছেলের শাদি হলো, এ দিয়ে রিস্তেদার আর পড়শিদের মুহ্ মিঠা করাবেন।'

একসঙ্গে এত টাকা নিজের হাতে আর কখনও পায়নি রামঅবতার। স্বজাতের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক সে আদায় করতে পারত কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। আর যদিও টানাহ্যাঁচড়া করে টাকাটা আদায় করা যেত, বেকার দামাদের জন্য মেয়ের বাপেরা কেউ যে চাকরি জুটিয়ে দিতে পারত না, এটা সে জোর দিয়েই বলতে পারে।

কে ভাবতে পেরেছিল অচ্ছুতদের মেয়েটা এত বিরাট আকারে তাদের জন্য সুখ এবং সৌভাগ্য নিয়ে আসবে? অর্জুন এবং তার নিজের হাতে সৌভাগ্যের সলিড প্রমাণ রয়েছে। কমলার কাছে যে আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং শুকদেও ঝা'কে যে অন্তত ধন্যবাদ দেওয়াটাও কর্তব্য, সে-সব আর মনে রইল না রামঅবতারের। বিমূঢ়ের মতো সে শুধু তাকিয়ে থাকে।

শুকদেও তার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। মধুর হেসে বলেন, 'কি, খুশি তো?'

আচমকা কিছু মনে পড়ে যেতে রামঅবতার শ্বাস টানার মতো শব্দ করে দ্রুত বলে ওঠে, 'অর্জুনের চাকরিটা পাকা তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পার্মানেণ্ট সারভিস। এমন কি এক বছর যে প্রবেশনার হিসেবে থাকতে হয়, অর্জুনকে তা-ও থাকতে হবে না। প্রথম দিন থেকেই তার পাকা নৌকরি।' শুকদেও বলতে থাকেন, 'আশা করি এবার আপনার চিন্তা দূর হবে।'

আর কোনো প্রশ্ন না করে রামঅবতার ফিরে যায় এবং তার চেয়ারে বসে পড়ে।

শুকদেও চন্দ্রকান্তকে বলেন, 'এখানকার কাজ তো মিটলো, এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'স্যার, একটু মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে পাঁচ মিনিট যদি বসে যান—

'মিঠাই! ভেরি গুড।' শুকদেও হেসে হেসে বলেন, 'মুহ্‌ মিঠা না করলে শুভকাজ কমপ্লীট হয় না। নিশ্চয়ই বসে থাকব—'

আর্দালি ভরত মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ডেকে অতিথিদের জন্য মিঠাই আনতে বলেন চন্দ্রকান্ত। দু মিনিটের ভেতর ভরত এবং সাব-ডিভিসনাল অফিসের ক্লার্ক অবিনাশ, দু'জনে দুটো বিরাট ট্রে নিয়ে আসে। একটা ট্রে-তে প্রচুর পরিমাণে লাড্ডু, নিমকিন, গুলাবজাম এবং প্যাঁড়া। আরেকটি ট্রেতে কাগজের প্লেট এবং স্টীলের ঝকঝকে অগুন্তি চামচ।

চন্দ্রকান্ত চোখের ইশারায় সরযূকে নিজের হাতে মিঠাই পরিবেশন করতে বলেন। আর্দালিদের সঙ্গে ক'রে সরযূ প্রথমে আসেন রামঅবতারের কাছে। শুকদেও-এর কাছে আগে গেলে তিনি যে রামঅবতারকে প্রথমে আপ্যায়ন করতে বলবেন, সরযূ তা জানেন। কেননা কিছুক্ষণ আগেই বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি

প্রথমে প্রণাম নেননি, রামঅতারের কাছে অর্জুন এবং কম্‌লাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা কাগজের প্লেটে অনেকগুলো মিষ্টি নিমকিন আর চামচ সাজিয়ে রামঅবতারের দিকে বাড়িয়ে দেন সরযূ। খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'এই নিন—'

রামঅবতার অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে। সে জানে সরযূরা ব্রাহ্মণ কিন্তু যে বেয়ারা দুটো খাবার-দাবার বয়ে এনেছে তাদের কী জাত, কে জানে। তা ছাড়া যে হালুইকরেরা এসব বানিয়েছে তারা জল-চল কিনা তার কোনো গ্যারাণ্টি নেই। যদিও আধঘণ্টা আগে তার ছেলে অচ্ছুত মেয়ে বিয়ে করেছে এবং এই বিয়ের কারণে একটি পার্মানেণ্ট সারভিস এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাওয়ায় মন কিছুটা দুর্বল যে হয়নি তা নয়। কিন্তু জাতপাতের ব্যাপারে হাজার বছরের সংস্কার তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এখানে বসে মিষ্টি খাওয়ার মতো উদারতা বা মহত্ত্ব এখনও অর্জন ক'রে উঠতে পারেনি সে। কিন্তু এস. ডি. ও'র মতো নমকপুরার প্রবল প্রতাপশালী একজন অফিসারের স্ত্রীকে মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া যায় না। তাছাড়া মন্ত্রী, ডি এম, এস পি ইত্যাদি প্রবল প্রতাপশালী মানুষগুলি দশ ফুট দূরত্বে বসে আছেন এবং সকলের চোখ তাঁর দিকেই ফেরানো। কাজেই মনে মনে চতুর একটি চাল ভেবে নিয়ে রামঅবতার করুণ মুখে বলেন, 'মাতাজি, আমি বাইরে কিছু খাই না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

সরযূ আরো নম্র হয়ে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শুকদেও বলে ওঠেন, 'থাক থাক, রামঅবতারজি যখন বাইরে খান না তখন আর ওঁকে বিব্রত করার দরকার নেই।' আসলে তিনি জানেন, ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক ক'রে নেওয়া ভাল। তাড়াহুড়ো করতে গেলে তার ফল উলটো হ'তে পারে। এই সবে অচ্ছুতের মেয়ে রামঅবতারের পুতহু হয়েছে, তার ওপর মিঠাই খাওয়াবার জন্য জোর না করাই উচিত। তাতে যে বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হবে তার সবটাই গিয়ে পড়েব কম্‌লার ওপর। মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

সরযূ শুকদেও-এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আর কিছু বললেন না। ঘুরে ঘুরে সবার কাছে গিয়ে মিষ্টির প্লেট দিতে থাকেন। অন্য দুই আর্দালি নিয়ে আসে চা, পান আর জলের গেলাস।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুকদেও হাতজোড় করে সবার কাছ থেকে বিদায় নেন। বিশেষ করে রামঅবতারের সামনে এসে তার হাত দু'টি ধরে বলেন, 'মনে কোনোরকম ক্ষোভ রাখবেন না। অচ্ছুতের মেয়ে হ'লেও কম্‌লা আপনারা পুতহু। তার সম্মান যাতে থাকে সেদিকে কৃপা ক'রে নজর রাখবেন।'

তিনি কী বলতে চান, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না রামঅবতারের। অর্থাৎ বাড়িতে নিয়ে যাবার পর কেউ যাতে গাঙ্গোভাদের মেয়েটার ওপর অত্যাচার বা উৎপাত না করে, সেটাই জানিয়েছেন শুকদেও। সে উত্তর দিল না, শুধু অনিশ্চিতভাবে মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করলো।

'আচ্ছা নমস্তে—'

শুকদেও মঞ্চ থেকে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে চললেন। তাঁর পেছন পেছন ডি. এম, এস. পি, এ. ডি. এম, চন্দ্রকান্ত, সরযূ এবং বাকি সবাই যেতে থাকেন।

শুকদেওরা গাড়িতে ওঠার পর বিরাট কনভয় নমকপুরার আকাশে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে উধাও হ'য়ে যায়। চন্দ্রকান্ত আর সরযূরা আবার মঞ্চে ফিরে আসেন।

রামঅবতার, অর্জুন বা কম্‌লা কেউ মন্ত্রীকে এগিয়ে দিতে যায়নি। যে যেখানে ছিল সেখানেই কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে। রামঅবতার এবারও ছেলে বা পুতহুর দিকে তাকায় নি, অর্জুনরাও তার দিকে মুখ ফেরায়নি। মনে হয় তারা পরস্পরকে চেনে না, আগে কেউ কাউকে কখনও দেখেনি পর্যন্ত।

দূরে গাছপালা এবং ছোটোখাটো পাহাড়ী রেঞ্জের তলায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রোদের রং এখন ম্যাড়মেড়ে, বাসি হলুদের মতো। আরো খানিকক্ষণ নির্জীব একটু আলো ছড়িয়ে দিনটা ফুরিয়ে যাবে। বাতাস দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্ত চরাচর জুড়ে এখন আরামদায়ক শীতলতা।

চন্দ্রকান্ত রামঅবতারের কাছে এসে বলেন, 'চৌবেজি, সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে। আপনি বাড়ি গিয়ে খবর দিন, ঘণ্টাখানেকের ভেতর অর্জুন আর কম্‌লা যাচ্ছে।'

পুতহুকে আজই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এই ব্যাপারটা এতক্ষণ রামঅবতারের মাথায় একেবারেই আসেনি। ছেলের বিয়ে, মন্ত্রী ডি. এম, অর্জুনের চাকরি, পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক, ইত্যাদি মিলিয়ে তার মাথায় একখানা চাকা ঘুরে যাচ্ছিল যেন। এই মুহূর্তে চন্দ্রকান্তর কথায় মারাত্মক রূঢ় বাস্তবের একটি ছবি চোখের সামনে সমস্ত ডিটেল নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। অচ্ছুতের মেয়েটা বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে তুমুল হুলুস্হুল বেধে যাবে, সেটা ভাবতেই শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে আগুনের স্রোত নেমে যায়। বিকেলের এই সুখকর বাতাসেও গল গল ক'রে ঘামতে থাকে সে।

রামঅবতার শুকনো ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আজই ওদের পাঠাবেন স্যার?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না রামঅবতার। অত্যন্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে নিজের শরীরটাকে টেনে তুলে আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে যায়। গেটের দিকে চলতে চলতে তার মনে হয়, মান্ধাতাদের সঙ্গে তখন চলে গেলেই ভাল হতো। তা হ'লে তাকে এভাবে বিপন্ন হতে হতো না। তার মনে হয়, এই মুহূর্তে যেন আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

॥ চার ॥

রামঅবতার চলে যাবার পর চন্দ্রকান্ত এবং সরযূ কমলাদের কাছে চলে আসেন।

সরযূ কমলার কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রেখে বলেন, 'ভীষণ ঘেমে গেছ। কপালের চন্দন সিঁদুর সব লেপটে গেছে। ভেতরে চল, নতুন ক'রে তোমাকে আবার সাজিয়ে দিই।'

চন্দ্রকান্ত অর্জুনকে বলেন, 'তুমিও চল। ঘেমে জামাকাপড় একেবারে ভিজিয়ে ফেলেছ। ওগুলো বদলে নেবে।'

বাংলোর ভেতরে এসে কমলাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ফের সাজাতে বসেন সরযূ। চন্দ্রকান্তর সঙ্গে অর্জুন তার ঘরে চলে যায় কিন্তু ভেজা সপসপে পোশাক সে আর বদলায় না, শুধু মুখটা ধুয়ে ভাল ক'রে মুছে নেয়। সে জানে, শুকনো জামাকাপড় পরলেও দশ মিনিটের ভেতর ভয়ে, নার্ভাসনেসে সেই একই হাল হবে। কাজেই পালটাবার মানে হয় না।

সাজানো শেষ ক'রে সরযূ অর্জুনের ঘরে চলে আসেন। স্বামীকে বলেন, 'সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ওদের পাঠাবার কী ব্যবস্থা করেছ?'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'আমাদের বড় গাড়িটা ক'রে পাঠিয়ে দেব।'

'সে-ই ভাল। সঙ্গে প্রেজেণ্টেসনের অতগুলো প্যাকেট-ট্যাকেট যাবে। বড় গাড়ি না হ'লে জায়গা হবে না।'

'হ্যাঁ। কমলা এখন বেরুতে পারবে তো?'

'পারবে।'

চন্দ্রকান্ত অর্জুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এসো।'

অর্জুনের ঘর থেকে বেরিয়ে চন্দ্রকান্তরা কমলার ঘরের কাছে এসে তাকে ডেকে নেন। তারপর একটানা লম্বা বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

এদিকে সূর্য কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে। তবে রাত্রি এখনও গাঢ় হয়নি। পাতলা অন্ধকারে চারদিক দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

এস. ডি. ও'র বাংলোর প্রতিটি ঘরে বারান্দায় প্যাসেজে এবং সামনের লন-এ শামিয়ানাটার তলায় আলো জ্বলে উঠেছে।

আলোকিত সিঁড়ি দিয়ে সবাই নিচে নেমে আসে। শামিয়ানার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অর্জুন বলে, 'বাড়ি না গেলেই কি নয়? আমাদের অন্য জায়গায় থাকার যদি একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন—'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'সেটা পরে ভাবা যাবে। বিয়ে করলে, মা'কে তার পুত্রবধূর মুখ দেখাবে না! দেখো, কমলাকে দেখে তিনি খুব খুশি হবেন।'

অচ্ছুত পুত্রবধূর মুখ দেখে মা যে আহ্লাদে কতখানি নেচে উঠবে, বাড়িতে তার কী ধরনের অভ্যর্থনা জুটবে, সেটা অর্জুনের চাইতে ভাল ক'রে কেউ জানে না। সে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না, ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপতে থাকে শুধু।

চন্দ্রকান্ত সবই বুঝতে পারেন। গভীর সহানুভূতিতে অর্জুনের একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন, 'তুমি তোমার কর্তব্য করবে। তোমার বাবা-মা যদি কমলাকে শেষ পর্যন্ত মেনে না নেন, তখন অন্য রাস্তা তো খোলাই আছে। আমার মনে হয়—'

আবছা গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'চ্যালেঞ্জের অনেকগুলো স্টেজ তো পেরিয়েই এসেছ। এখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। যাই-ই ঘটুক না যুদ্ধের শেষ রাউণ্ড পর্যন্ত তোমাকে লড়তেও হবে, জিততেও হবে। নইলে—'

'কী?'

'এ দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

ভারতের মতো বিশাল দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আদৌ কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই অর্জুনের। তার সমস্যা খুবই ছোট, অতি নগণ্য এবং একান্তই ব্যক্তিগত। প্রচুর অপমান এবং গোলমালের পরও যদি বাবা-মা তাদের একটু জায়গা দেয়, তাতেই

খুশি হয়ে যাবে অর্জুন। সে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন তা-ই হবে। আমরা বাড়িই যাব।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, একটা দামী ঝকঝকে গাড়ির ক্যারিয়ারে উপহারের অজস্র প্যাকেট, নতুন স্যুটকেস এবং অন্যান্য জিনিস তুলে দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে বলেন, 'ওঠো—'

কমলা এবং অর্জুন চন্দ্রকান্ত আর সরযূকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠে বসে।

মাত্র সাত দিন চন্দ্রকান্তদের সঙ্গে অর্জুন এবং কমলার পরিচয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের স্নেহ-মমতা এবং সহানুভূতি তারা যেভাবে পেয়েছে, আজীবন তা মনে থাকবে। এঁরা যদি অনবরত সাহস না যোগাতেন এবং আশ্রয় না দিতেন, বিয়েটা কোনোদিনই হতো না। অসহায় সন্ত্রস্ত একটি তরুণ এবং একটি তরুণীকে নমকপুরার বামহন-কায়াথরা একেবারে শেষ করে ফেলত। গাঢ় আবেগে অর্জুন আর কমলার চোখে জল এসে যায়।

অর্জুন ঝাপসা গলায় বলে, 'চলি - '

অর্জুনদের আবেগ চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর বুকের ভেতর অদৃশ্য গোপন কোনো প্রক্রিয়ায় চুইয়ে চুইয়ে ঢুকে গিয়েছিল। ভারী গলায় তাঁরা বলেন, 'এসো—'

মহকুমা শাসকের কঠোর চোখ সহজে সিক্ত হয় না, কিন্তু সরযূর চোখ ক্রমশ জলে ভরে উঠেছে।

শোফার সামনের সীটে স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল। চন্দ্রকান্ত তাকে বললেন, 'এদের পুরানা টৌলিতে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

শোফার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আস্তে আস্তে সেটাকে গেটের বাইরে রাস্তায় নিয়ে এল। এবার গাড়িটা ডাইনে ঘুরে শহরের ভেতর ঢুকে যাবে।

পেছন ফিরে অর্জুনরা দেখতে পেল, শামিয়ানার বাইরে লন-এর মাঝখানের রাস্তায় চন্দ্রকান্ত এবং সরযূ স্তব্ধ মূর্তির মতো

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পর গাড়িটা ক্ষিপ্র একটি মোচড়ে ডান দিকে ঘুরতেই চন্দ্রকান্তদের আর দেখা যায় না।

ডাইনের এই রাস্তাটা নমকপুরা টাউনের শিরদাঁড়া। সেটার ওপর দশ ইঞ্চি পুরু লালচে ধুলোর স্তর। দু'ধারের কাঁচা নর্দমা দুটো লক্ষ লক্ষ মশার মেটারনিটি হোম। তারপর বেঢপ পুরনো চেহারার একতলা দোতলা তেতলা। মাঝে মাঝে চমকে দেবার মতো দু-একটা ঝকঝকে নতুন বাড়ি। তবে টিন এবং খাপরার চালাও রয়েছে অজস্র। বেশির ভাগ বাড়ির মাথাতেই রামসীতা বা শিবের মন্দির। অবশ্য সামনের দিকে গরু বা মোষ বাঁধা।

রাস্তায় নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটির বাড়িগুলো টিম টিম করে জ্বলছে। এখানে ভোল্টেজ ভীষণ কম।

বিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু বায়ুস্তরকে ধুলোয় আচ্ছন্ন ক'রে গাড়িটা পুরানো মহল্লার দিকে মাঝারি স্পীডে ছুটে চলেছে।

অর্জুন জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। উলটো দিক থেকেও জীপ, মোটর, ট্রাক, টাঙ্গা, ভৈসা ও গৈয়া গাড়ি এবং সাইকেল রিকশা অনবরত পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ধ্যেবেলায় চারিদিকে প্রচুর লোকজন। খানিকটা দূরে একটা সিনেমা হল রয়েছে—'বিজলী'। ইভিনিং শো বসার আগে সেখান থেকে মাইকে ফুল ভলিউমে হিন্দি গান বাজানো হচ্ছে।

আকাশে চাঁদির থালার মতো পুনমের সুগোল চাঁদটি উঠে এসেছে।

অর্জুন কিন্তু বাড়িঘর, ধুলোর ঝড়, পূর্ণিমার চাঁদ, গাড়িঘোড়া, মানুষজন বা অন্য কিছুই দেখছিল না। গাড়িটা যত পুরানো মহল্লার দিকে এগুচ্ছে, ততই তীব্র উৎকণ্ঠায় তার হৃৎপিণ্ড থেকে একসঙ্গে পঞ্চাশটা উদ্‌ভ্রান্ত তেজী ঘোড়া ছুটে যাওয়ার আওয়াজ উঠে আসছে যেন। চারিদিকের দৃশ্যাবলী তার কাছে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে সিনেমার স্ক্রীনের মতো অদৃশ্য কোনো পর্দায় কয়েক বছর আগের দিনগুলো ফুটে উঠতে থাকে।

নমকপুরা টাউনের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় পুরানা মহল্লা। জায়গাটাকে শুধু (শুদ্ধ) ব্রাহ্মণদের কলোনি বলা যায়। প্রায় পাঁচ জেনারেশন ধরে অর্জুনরা এখানে রয়েছে।

পুরনো একতলা বাড়ি তাদের। আশি বছর আগে এটা তৈরি করিয়েছিল তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা রামআশ্রয় চৌবে। তারপর থেকে ওটার গায়ে আর হাত পড়েনি। আশি বছরের ঝড়বৃষ্টি এবং রোদে বাড়িটার দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে প্রায় সব জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। ভেঙেচুরে গেছে ছাদের কার্নিস, জানালার কাচ। প্রতিটি ঘরের মেঝে ফেটে চৌচির হয়ে আছে। দেয়ালে এবং ছাদে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। আর বেশিদিন না, কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে পড়ে একেবারে ধ্বংসস্তূপ হ'য়ে যাবে।

আসলে অর্জুনরা মিডল ক্লাসের একেবারে নিচের লেভেলে পড়ে আছে। ঠাকুরদার ঠাকুরদা বাড়িঘর যেটুকু করে গিয়েছিল সেটাকে ভালভাবে টিকিয়ে রাখার মতো পয়সার জোর পরের চার জেনারেশনের ছিল না।

অর্জুনের বাবার ঠাকুরদা কী করত, সে জানে না। ঠাকুরদা ছিল একটা স্কুলের সংস্কৃতের টিচার। বাবা অর্থাৎ রামঅবতারও স্কুলে পড়ায়। সে প্রাইমারি স্কুলের অ্যাসিসটাণ্ট হেডমাস্টার।

অর্জুনদের ফ্যামিলি প্যাটার্নটা এই রকম। বাবা, মা, তিন বোন এবং দুই ভাই, সব মিলিয়ে ছ'জন। বোনেদের দু'জন বড়, একজন ছোট। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। একজন থাকে গয়ায়, আরেক জন সাহারসায়। ছোট বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। নমকপুরা গার্লস হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে বার চারেক ফেল করার পর নাম কাটিয়ে এখন বাড়িতেই বসে আছে। ছোট ভাই স্কুলে পড়ে।

রামঅবতার যে প্রাইমারি স্কুলটায় পড়ায় সেটা নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটি চালায়। এরকম একটা নগণ্য শহরের আয়ই বা

কতটুকু, আর প্রাইমারি স্কুলের টিচারদেরই বা কী স্কেল দিতে পারে! স্টেট গভর্নমেণ্টের একজন নূতন ক্লার্ক চাকরিতে ঢুকেই যা মাইনে পায়, তিরিশ বছর পড়াবার পর রামঅবতার তার অর্ধেকও পায় না। কাজেই সংসার চালাবার জন্য হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় রামঅবতারকে। বারো মাসই টিউশানি ক'রে সে, তা ছাড়া স্থানীয় রামসীতা মন্দিরে রামায়ণ পাঠ ক'রে কিছু পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ঘটকালি এবং জমির দালালিও ক'রে থাকে। পঞ্চাশ মাইল দূরে সামান্য কিছু ল্যাণ্ড প্রপার্টি আছে তাদের। কিষাণদের কাছে সেগুলো জমা দেওয়া আছে। তাতে ধান গেঁহু এবং রাই-কলাই-মুগ-মসুরি ফলে। বছরের শেষে ফসল বেচে কিষাণরা কিছু পাঠায়। এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলছে।

এর মধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে রামঅবতার। তাদের সোসাইটিতে দহেজ (পণ) ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক। কাজেই দুই মেয়ের বিয়েতে হাতে যে দু-চার পয়সা জমানো ছিল তা তো গেছেই, এমন কি অর্জুনের মায়ের সোনাদানাটুকুও শেষ। তাতেও কুলোয়নি, দেহাতের কয়েক বিঘে জমি বেচে ফেলতে হয়েছে এবং করজ নিতে হয়েছে হাজার চারেক টাকা। টাকাটা শোধ তো করা যায়ই নি, সুদের একটা পয়সাও মেটাতে পারেনি সে। এভাবে আর কিছুদিন চললে দেনার দায়ে নমকপুরার বাড়িটা খোয়াতে হবে। তার ওপর আরো একটি মেয়ে ঘাড়ের ওপর চেপে আছে। তাড়াতাড়ি তার বিয়েটা চুকিয়ে না ফেললেই নয়।

প্রচুর ঋণ, একটি মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা, ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন দম্ভ, জাতপাত ছুঁয়াছুতের হাজারটা সংস্কার, ইত্যাদি নিয়ে এই পৃথিবীতে টিকে আছে রামঅবতার।

অতীতের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না রামঅবতার, বর্তমান নিয়ে প্রতি মুহূর্তে সে ঝালাপালা। একটি ক'রে দিন কাটে, তার শিরদাঁড়া এক মিলিমিটার ক'রে দুমড়ে যায়। তার দুই চোখ এখন

ভবিষ্যতের দিকে ছড়িয়ে আছে। রামঅবতারের কাছে ভবিষ্যৎ বলতে এখন একটাই। সেটা হ'ল তার বড় ছেলে অর্জুন।

তিন বছর আগে অর্জুন যখন সেকেণ্ড ডিভিসানে ম্যাট্রিক পাশ করলো তখন থেকেই স্বপ্ন দেখছে রামঅবতার। অর্জুন চাকরি-বাকরি ক'রে তার পেছনে দাঁড়াবে, বোনের বিয়ে দেবে, রামঅবতারকে ঋণমুক্ত ক'রে যাবতীয় অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। ছেলেকে ঘিরে তার অনেক উচ্চাশা।

রেজাল্ট বেরুবার পর অর্জুন জানিয়েছিল, কলেজে ভর্তি হবে।

রামঅবতার বলেছিল, 'আমার ক্ষমতা নেই অর্জুন। এখন নৌকরি-উকরি ক'রে সমসারটাকে বাঁচা। আমি তোর ওপর ভরসা ক'রে আছি বেটা।'

ক'দিন কান্নাকাটি ক'রে শেষ পর্যন্ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল অর্জুন।

কিন্তু নমকপুরা রাঁচী ধানবাদ সিন্দ্রি বারাউনি বা জামশেদপুর নয়। জায়গাটা বিহারের ব্যাকওয়ার্ড এরীয়া। এখানে স্বাধীনতার আগে বা পরে ইণ্ডাস্ট্রি-টিণ্ডাস্ট্রি বলতে কিছুই হয়নি। কলকারখানা আর নতুন নতুন অফিস না বসলে নৌকরির সুযোগ কোথায়? অথচ ধোকার টাটির মতো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের ছোটখাটো একটি অফিস আছে নমকপুরায়। ফি বছর দেড় হাজার যুবক স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে ওখানে নাম লেখায়। এক্সচেঞ্জের অফিসাররা তার ভেতর থেকে ঝাড়াই বাছাই ক'রে কিছু নাম পাঠায় জামশেদপুরে বা ধানবাদে কিংবা রাঁচীতে। সেই লিস্ট থেকে বছরে দশ বিশ জনের বেশি ইণ্টারভিউতে ডাক পায় না। চাকরি পায় বড় জোর চার পাঁচজন।

যেখানে কয়েক হাজার গ্র্যাজুয়েট বছরের পর বছর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে হানা দিচ্ছে, সেখানে অর্জুনের মতো একজন ম্যাট্রিকুলেটের আশা আর কতটুকু? তিনি চারটে বছর ঘোরাঘুরি ক'রে গোড়ালির আধাআধি ক্ষইয়ে ফেলার পরও যখন একটা

ইণ্টারভিউ পর্যন্ত জোটানো গেল না তখন সে সিনিক হয়ে পড়তে থাকে।

অবশ্য রামঅবতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে ধরে-টরে প্রাইমারি স্কুলে অর্জুনের একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারত কিন্তু যে পে-স্কেলে তার জীবন শুরু হবে তা বলার মতো তো নয়ই, পেটও তাতে ভরবে না। ছেলে সম্পর্কে রামঅবতারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি। আরম্ভটা ভদ্র রকমের না হ'লে অর্জুনকে তার মতো সারা জীবন ধুঁকতে ধুঁকতে এগুতে হবে। রামঅবতারের ইচ্ছা, সরকারী নৌকরি দিয়ে সে জীবন শুরু করুক। তাতে স্কেল তো ভাল পাওয়া যাবেই, বিয়ের বাজারে দরও উঠবে অনেক। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যায়, সরকারী নৌকরি আর জোটে কই ?

নিয়মিত যাতায়াতের কারণে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের এক জুনিয়ার অফিসারের সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল অর্জুনের। এমনিতে তার ব্যবহার খুবই নম্র, বিনীত। এই কারণে নমকপুরার সবাই তাকে ভালবাসে। জুনিয়ার অফিসারটিও তাকে বেশ পছন্দ করত। এই ভদ্র, মধুর স্বভাবের যুবকটির জন্য তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

অফিসারটি একদিন তাকে ডেকে জানিয়েছিল, একজন সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করা ম্যাট্রিকুলেটের চাকরি পাওয়া দেশের এই সিস্টেমে প্রায় অসম্ভব। চাকরির জন্য এক্সট্রা কিছু কোয়ালিফিকেশন দরকার। তার পরামর্শ, ইংরেজিতে টাইপ রাইটিং এবং শর্টহ্যাণ্ডটা শিখে নেওয়া দরকার। সেই সঙ্গে ওই ল্যাংগুয়েজটাও ভাল ক'রে শিখতে হবে। ভাষাটার ওপর দখল না থাকলেই নয়।

অর্জুন হকচকিয়ে গেছে। কেন না কিছুদিন আগেও 'আংরেজি হটাও'-ওলারা এখানে প্রচুর হৈচৈ করেছে। শুধু তাই না, এখানে ওখানে দোকানের মাথায় যা দু-চারটে ইংরেজি হরফের সাইনবোর্ড ছিল তার ওপর এক পোচ করে আলকাতরা লেপে দিয়েছে। এ সব দেখতে দেখতে অর্জুনের ধারণা হয়েছিল, ঘাড়-

ধাক্কা দিতে দিতে ইংরেজিকে দেশের বাউণ্ডারি পার ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের জুনিয়ার অফিসারটি তাকে সেই অচ্ছুত ল্যাংগুয়েজটাকেই ভাল ক'রে শিখতে বলেছিল। অর্জুনের বিস্ময় সেই কারণেই।

অর্জুন বলেছিল, 'লেকেন স্যার, আজকাল ইংলিশের হাল তো খুব খারাপ হ'য়ে গেছে। কেউ আর ওটা তেমন শিখতে চায় না।'

অফিসার গলা নামিয়ে বলেছিল, 'বরং তার উলটোটাই। তুমি পাটনা রাঁচী ধানবাদ জামশেদপুর—বড় বড় টাউন একবার ঘুরে এসো। 'আংরেজি হটানে'ওয়ালারা ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লুকিয়ে পড়াচেছ। বেশির ভাগ এম. এল. এ এবং এম. পি আর মিনিস্টারের ছেলেমেয়েরাও বড় বড় মিশনারী স্কুল কলেজ আর কনভেণ্টে পড়ছে।'

'হ্যাঁ!' অর্জুন অবাক হয়ে গেছে।

অফিসারটি এবার বলেছে, 'এসবের ভেতর অনেক রকম পলিটিকস রয়েছে। তা নিয়ে আমাদের কারো মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তোমার দরকার একটা ভাল চাকরি-বাকরি তাই তো?'

আস্তে মাথা নেড়েছে অর্জুন।

অফিসারের পরামর্শটা তার কাছে খুবই দামী মনে হয়েছিল। সেই দিনই সে টাইপ রাইটিং এবং শর্টহ্যাণ্ড শেখার জন্য চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু নমকপুরার মতো ছোট্ট নগণ্য শহরে এসব শেখাবার মতো একটি স্কুলও নেই। ইংরেজিটাও যে ভাল ক'রে রপ্ত করবে, তেমন টিচার এখানে পাওয়া গেল না। কেন না আজকাল হিন্দি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে, বিশেষ ক'রে নমকপুরার মতো ছোটোখাটো শহরে, ইংরেজির ওপর আদৌ জোর দেওয়া হয় না। কোনোরকমে দায়সারা ভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। ইংরেজির যারা ভাল টিচার, বড় শহরে তাঁদের প্রচুর ডিমাণ্ড, তাঁরা সেখানেই চলে যান।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অর্জুন খবর পায় নমকপুরা চার্চের রেভারেন্ড টিরকের কাছে একটা দামী টাইপ রাইটার মিশিন রয়েছে। তিনি শর্টহ্যান্ড, টাইপ রাইটিংটা ভালই জানেন। ইংরেজি ভাষাটার ওপর তাঁর প্রচন্ড দখল।

চার্চের প্রয়োজনে রেভারেন্ড টিরকেকে পাটনা কলকাতা দিল্লি বম্বে ছাড়াও, এমনকি দূর বিদেশেও যোগাযোগ করতে হয়। প্রায় রোজই দশ বারোটা ক'রে চিঠি টাইপ ক'রে তিনি ডাকে দেন।

অর্জুন সোজা চার্চে চলে গিয়েছিল।

নমকপুরা চার্চটা এই শহরেরই আরেক মাথায়, অচ্ছুতটুলির গা ঘেঁষে।

বছর পঞ্চাশেক আগে চার্চটা বসানো হয়েছিল। তখন ইংরেজ রাজত্ব জাঁকিয়ে চলেছে। এটা বসবার সঙ্গে সঙ্গে অচ্ছুতদের মধ্যে ব্যাপক কনভারসন বা ধর্মান্তর ঘটতে থাকে। বেশ কিছু দোসাদ, তাতমা এবং গাঙ্গোতা খ্রিস্টান হয়ে যায়। তবে স্বাধীনতার পর কনভারসনের হার অনেক কমতে থাকে। আজকাল কুচিৎ কখনও দু-একজন খ্রিস্টান হয়।

পঞ্চাশ বছরে জনা দশেক পাদ্রী এই চার্চে এসে ধর্মপ্রচার এবং সেবামূলক কাজ ক'রে গেছেন। প্রীচিং আর সোসাল সারভিস।

প্রথমে এখানে এসেছিলেন একজন ইংরাজ পাদ্রী—ফাদার রবার্টস। তারপর যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই ভারতীয়। গত দশ বছর ধরে এখানে আছেন রেভারেন্ড টিরকে। তিনি রাঁচী অঞ্চলের আদিবাসী।

রেভারেন্ড টিরকে ধর্মান্তরের বা প্রীচিং-এর ওপর আদৌ জোর দেন না। তাঁর কাজটা হ'ল প্রধানত সমাজসেবার। তিনি আসার পর চার্চে একটা স্কুল আর একটা হাসপাতাল খোলা হয়েছে। খুবই ছোট স্কুল এবং নগণ্য হাসপাতাল। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসে অচ্ছুতটুলি থেকে। হাসপাতালের রোগীরাও সবাই হরিজন। খ্রিস্টানরা তো আসেই। এখনও যারা হিন্দুত্ব বজায় রেখে কোনোরকমে টিকে

আছে সেই সব দোসাদ তাতমা ধাঙড় গাঙ্গোতাদের ঘর থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, কারো রোগ হ'লে এখান থেকে 'দাওয়াই' নিয়ে যায়। তবে নমকপুরায় উচ্চবর্ণের মানুষেরা এখানকার ছায়া মাড়ায় না।

এক রবিবার সকালের দিকে চার্চে এসেছিল অর্জুন। প্রায় আধ একর জমির মাঝখানে ছোটখাটো গীর্জা বাড়িটা। বড় জোর চল্লিশ ফিট লম্বা এবং বিশ ফিটের মতো চওড়া, উচ্চতা খুব বেশি হ'লে সাতাশ আটাশ ফিট। ছাদের মাথায় কাঠের উঁচু ক্রুশ।

বিশাল কমপাউণ্ডটা বাউণ্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। গীর্জার পেছন দিকে ছোট ছোট দু'টো একতলা বাড়িতে স্কুল এবং হাসপাতাল। তা ছাড়া বাদ বাকি জায়গা ফাঁকা। সেখানে সব্জির এবং নানারকম ফুল-ফলের বাগান। আর রয়েছে একটা মাঝারি পুকুর, কুয়ো। পুকুরের একধারে বাঁধানো ঘাট, সেখানে বসার জন্য সিমেন্টের বেঞ্চ রয়েছে। অবশ্য বাগানেও সিমেন্টে বাঁধিয়ে অনেকগুলো জায়গায় বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছুটির দিন বলে স্কুল বন্ধ। তবে হাসপাতাল খোলা রয়েছে। সেখানে বেশ ভিড়। কিন্তু এতটুকু হৈচৈ, চিৎকার নেই। শান্ত পবিত্র এই গীর্জার মর্যাদা রেখে এবং শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে চুপচাপ রোগীরা আসছে, যাচ্ছে। এখানকার অগাধ শান্তি এবং পবিত্রতায় যাতে এতটুকু বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে সবার সীমাহীন সতর্কতা।

রেভারেণ্ড টিরকে গীর্জাবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ আকাশের দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশী 'শুগা' দূরের সীমাহীন শস্যক্ষেত্রগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। আর আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অগুনতি শঙ্খচিল। রেভারেণ্ড টিরকে দূরমনস্কর মতো এই সব পাখি দেখছিলেন।

তাঁর বয়স ষাট বাষট্টি। চুলের বেশির ভাগটাই সাদা হয়ে গেছে। খুব লম্বা নন, আবার বেঁটেও বলা যাবে না তাঁকে।

মাঝারি উচ্চতার এই মানুষটির শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই, অথচ স্বাস্থ্যটি খুবই মজবুত। গায়ের রং তামাটে, ঠোঁট পুরু এবং কালচে, ছড়ানো মোটা নাক, চাপা চোখ। পরনে ধবধবে ঢোলা সারপ্লিস।

তাঁর চোখে-মুখে এক ধরনের সারল্য এবং পবিত্রতা মাখানো। বোঝাই যায়, এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘকালের শুদ্ধ জীবনযাপন।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে অর্জুন। আসলে ঠিক কিভাবে শুরু করবে, সেটাই ভেবে উঠতে পারছিল না। একসময় আস্তে ক'রে নিচু গলায় বলেছিল, 'নমস্তে—'

চমকে আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়েছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। একটু অবাক হয়ে অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে হাতজোড় ক'রে বলেছিলেন, 'নমস্তে। তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কোত্থেকে আসছ?'

'আমি নমকপুরাতেই থাকি। আপনি না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি।'

'তোমার নামটা জানা হয়নি।'

ব্যস্তভাবে অর্জুন তার নাম জানিয়ে দেয়।

রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'ব্রাহ্মণ!'

'হ্যাঁ।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'এখানে তো কখনও কোনো ব্রাহ্মণ আসে না। আমার কাছে তোমার কি কিছু দরকার আছে?'

বিনীত ভঙ্গিতে অর্জুন বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'বল।'

চার্চে আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছিল অর্জুন। রেভারেন্ড টিরকে একটু ভেবে বলেছিলেন, 'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি যে এখানে এসেছ তোমার বাবুজি জানেন ?'

'জানেন। আমি তাঁকে বলেই এসেছি।'

কথাটা ঠিকই বলেছে অর্জুন। রামঅবতার বুঝতে পেরেছিল ইংরেজি শেখা, টাইপ রাইটিং আর শর্টহ্যান্ড চাকরির পক্ষে অত্যন্ত হিতকর এবং জরুরি। একান্ত নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত কড়া শর্তে অর্জুনকে এখানে আসতে দিয়েছে সে। এখানকার কোনো কিছুই খেতে পাবে না অর্জুন। এমন কি জল পর্যন্তও না। এখান থেকে ফিরে গিয়ে ঘরে ঢোকার আগে তাকে 'নাহানা' অর্থাৎ স্নান ক'রে মাথায় গঙ্গাপানি ঢেলে শুদ্ধ হ'তে হবে।

রেভারেন্ড টিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বাবুজি একটুও আপত্তি করেননি ?'

কোন কোন শর্তে অর্জুনকে এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে তা তো আর তার পক্ষে বলা সম্ভব না। কিছুটা ইতস্তত ক'রে অর্জুন বলেছে, 'না। তেমন কিছু—'

রেভারেন্ড টিরকে এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে বলেছিলেন, 'চল, আমার বাংলোতে যাওয়া যাক।'

চার্চ কমপাউন্ডের দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে ছোটখাট ছিমছাম একটা বাংলো। দেওয়ালগুলো ইটের। লাল সিমেন্ট জমিয়ে মেঝে। জানালায় দুটো ক'রে পাল্লা—একটা কাচের, আরেকটা কাঠের ঝিলমিল। চারপাশ পরিচ্ছন্ন। কোথাও এক কুচি বাজে কাগজ কি শুকনো পাতা বা এতটুকু ধুলোবালি নেই।

বাংলোটা বেশ কিছুটা উঁচুতে। আট দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। প্রতিটি সিঁড়ির দু'ধারে টবে এক মাপের ঝাউ।

রেভারেন্ড টিরকে অর্জুনকে সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখা গেল সামনের দরজাটা খোলা রয়েছে।

ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই বিশাল একখানা ঘর। বসবার জন্য বেতের কয়েকটি সোফা এবং গোলাকার পাঁচ-সাতটা মোড়া।

সেগুলোর মাঝখানে বেতেরই চৌকো সেণ্টার টেবল। একপাশের সলিড দেয়ালের গোটাটা জুড়েই বইয়ের আলমারি। তার ভেতর অজস্র বই ঠাসা রয়েছে। আরেক দিকের দেয়ালে যিশুখিস্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তির বিরাট অয়েল পেইণ্টিং। তাছাড়া অত বড় না হ'লেও বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্য বিবেকানন্দ গান্ধীজি এবং অশোকচক্রের একটি ছবিও টাঙানো রয়েছে। ছবির দেয়াল ঘেঁষে একটা বড় টেবলে টাইপ রাইটার মেশিন থেকে শুরু ক'রে প্রচুর ফাইল, অন্যান্য কাগজপত্র, কলম. পেন্সিল ইত্যাদি চমৎকার সাজানো রয়েছে। এই বাংলোর সব কিছুতেই যত্ন এবং পরিচ্ছন্নতার ছাপ।

অসীম কৌতূহলে সব কিছু দেখতে দেখতে নিজেদের বাড়ির একটা ছবি অর্জুনের চোখের সামনে পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল। সেখানকার নোংরা আবহাওয়া, এখানে ওখানে জঞ্জাল এবং গোবরের স্তূপের কথা ভাবতেই তার মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিল।

রেভারেণ্ড টিরকে একটা সোফা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বোসো—'

অর্জুন বসার পর মুখোমুখি বসতে বসতে রেভারেণ্ড টিরকে গলার স্বর সামান্য তুলে ডাকতে শুরু করেছিলেন, 'কমলা, কমলা—'

ঘরটার পেছন দিকেও একটা খোলা দরজা। তার ভেতর দিয়ে ওদিকের বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছিল. সেখানে আরো দু-তিনটে শোবার ঘর, রান্নাঘর এবং বাঁধানো কুয়োতলা।

ভেতর থেকে তক্ষুণি সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, 'কী বলছ?'

কোনো মেয়ের গলা। কণ্ঠস্বরটি মিষ্টি এবং সুরেলা। রেভারেণ্ড টিরকে কি বিবাহিত? তাঁর কি ছেলেমেয়ে সংসার আছে? অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না।

রেভারেণ্ড টিরকে বলেছিলেন, 'কী করছিস তুই?'

'মঙ্গরা বহীন রসুই চড়িয়েছে। আমি তার সবজি কুটে দিচ্ছি।'

'একটু এ ঘরে আসতে পারবি?'

'কেন?'

‘একজন গেস্ট এসেছে।’

‘যাই।’

কিছুক্ষণ পর কমলা বাইরের ঘরে চলে এসেছিল। তখন তার বয়স ষোল। এখনকার চেয়ে কিছুটা রোগা। পরনে ছিল একটা হলুদ রঙের শাড়ি আর লাল জামা। কপালে গলায় এবং গালে দানা দানা ঘাম জমেছিল। দু’হাতে নকশা-করা রুপোর কাংনা বা কঙ্কণ।

রেভারেণ্ড টিরকে অর্জুনকে বলেছিলেন, ‘এ হ’ল কমলা। আমার মেয়েই বলতে পারো। আমার ঘর-সংসার সব ও দ্যাখে।’

অর্জুন বুঝতে পেরেছে, কমলা রেভারেণ্ড টিরকের মেয়ে নয়। ‘মেয়েই বলতে পার’ বলতে সম্পর্কটা কী দাঁড়ায় সেটা সে ধরতে পারছিল না। তবে যার হাতে ঘর-সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

রেভারেণ্ড টিরকে এবার কমলার কাছে অর্জুনের পরিচয় দিয়ে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারটা অর্জুনের ভাল লাগেনি। তার আসার কারণটা জানাজানি হোক, এটা একেবারেই কাম্য নয়। যতটা সম্ভব গোপনে এসে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে যাবে, এটুকু হ’লেই সে খুশি। কিন্তু যে চার্চ ঘিরে অচ্ছুত আর খ্রিস্টানদের মেলা বসে থাকে, সেখানে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ছেলের নিয়মিত যাতায়াতের খবর রটে গেলে নমকপুরা টাউনে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে।

রেভারেণ্ড টিরকে অর্জুনের দিকে ফিরে বলেছিলেন, ‘একটু চা দিতে বলি?’

চমকে উঠেছিল অর্জুন। পরক্ষণে শশব্যস্তে বলেছে, ‘আমি তো চা খাই না।’

‘ও, তাহ’লে অন্য কিছু—’ বলে কমলার দিকে তাকিয়েছিলেন রেভারেণ্ড টিরকে, ‘কি রে, ঘরে প্যাঁড়া লাড্ডু কিছু আছে?’

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে এসেছিল অর্জুনের। রুদ্ধ গলায় সে বলেছে, 'আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি। এখন আর কিছু খাব না।'

'প্রথম দিন এলে। একটু মিঠাই-টিঠাই—' বলতে বলতে আচমকা থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ফের শুরু করেছিলেন, 'আমার একেবারে ভুল হয়ে গেছে। তোমরা তো ব্রাহ্মণ—'

রেভারেন্ড টিরকের চোখে-মুখে ক্ষোভ বা ব্যঙ্গের চিহ্নমাত্র ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যে খ্রিস্টান বা অন্য কোনো জাতের, এমন কি হিন্দু সমাজের একেবারে নিচু লেভেলে যারা আছে তাদেরও কারো ছোঁয়া খাবে না, এটাকে তিনি অভ্রান্ত এবং স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। কমলার দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'না রে, ওর জন্যে কিছু আনতে হবে না। যদি পারিস আমাকে একটু চা দিস।'

কমলা পলকহীন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ না সরিয়ে অন্যমনস্কর মতো সে বলেছে, 'আচ্ছা—'

'চা নিয়ে আয়। একটা দরকারী কথা বলব।'

কমলা অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে ভেতরে চলে গেছে। তার চোখে এমন কিছু ছিল যাতে ভেতরে ভেতরে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল অর্জুন। মেয়েটার কী জাত তখনও সে জানে না। ব্রাহ্মণ না হ'য়ে অন্তত কায়াথও যদি হতো, তার ছোঁয়া খেতে আপত্তি ছিল না। কমলার চেহারা, পোশাক এবং কথাবার্তার ধরন উঁচু ঘরের মেয়েদের মতো। তবু নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিল না অর্জুন। কেননা সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে, নমকপুরার চার্চে অচ্ছুত এবং খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ আসে না। কাজেই কমলার জাতপাত সম্পর্কে সংশয় থাকার কথা নয়।

কয়েক মিনিট বাদে চা নিয়ে ফিরে এসেছিল কমলা। তার চোখে সেই অদ্ভুত চাউনি। আগের মতোই সে অর্জুনকে লক্ষ করছিল। তার তাকানোর ভঙ্গিতে একই সঙ্গে ছিল বিস্ময়, ক্ষোভ এবং হয়তো বা একটুখানি সূক্ষ্ম অপমানবোধ। কোনো উচ্চবর্ণের মানুষ, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ যে চার্চে আসতে পারে, এটা ছিল তার

ধারণার বাইরে। বিস্ময়টা সেই কারণে। আর চিরকালের নিয়ম ভেঙে অর্জুন যখন তার জাত খানিকটা খুইয়েই ফেলেছে, দুটো মিঠাই খেলে ব্রাহ্মণত্ব আর কতখানিই বা নষ্ট হতো!

অর্জুনকে দেখতে দেখতে কমলা রেভারেণ্ড টিরকেকে বলেছে, 'কী বলবে, বল—'

রেভারেণ্ড টিরকে তার হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে বলেছেন, 'অর্জুন কেন এসেছে, তোকে বলেছি—'

'হ্যাঁ—' এবার মুখ ফিরিয়ে রেভারেণ্ড টিরকের দিকে তাকিয়েছে কমলা।

'আমার তো হাজার রকমের কাজ। তবু তার ভেতর সময় ক'রে ওকে শর্টহ্যাণ্ড আর ইংরেজিটা দেখিয়ে দেব। তুই কিন্তু টাইপ রাইটিংয়ের ব্যাপারে ওকে হেল্প করবি।'

সাত ফুট দূরত্বে বসে চমকে উঠেছিল অর্জুন। কমলার জাতপাত সম্পর্কে ততক্ষণে সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। তার ওপর সে একটি যুবতী। টাইপ রাইটিংয়ে তালিম দেবার যোগ্যতা তার আছে কিনা, সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণাই নেই অর্জুনের। তাছাড়া একটি অচ্ছুত বা খ্রিস্টান মেয়ের কাছে তাকে কিছু শিখতে হবে এবং সেই কারণে তাকে কমলার কাছে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে আর সেটা জানাজানি হয়ে গেলে বাড়িতে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে যাবে, এসব ভাবতেই ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল অর্জুন। সে হঠাৎ বলে উঠেছে, 'রেভারেণ্ড, আমার ইচ্ছা আপনিই আমাকে কষ্ট ক'রে টাইপ রাইটিংটাও শেখান।'

রেভারেণ্ড মানুষটি খুবই সাদাসিধে, কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ তাঁর মধ্যে নেই। অর্জুনের কেন যে কমলার কাছে শেখার অনিচ্ছা, তার একটি মাত্র সরল অর্থই তিনি নিজের মতো ক'রে, করে নিয়েছিলেন। ব্যস্তভাবে তিনি বলে উঠেছেন, 'তুমি জানো না অর্জুন, টাইপ রাইটিংটা ভালই শিখেছে কমলা। নিজের হাতে আমি ওকে শিখিয়েছি। থার্টি ফাইভের মতো ওর স্পীড।

নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কমলা তোমাকে যথেষ্ট হেল্প করতে পারবে।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'যদি কোনোরকম অসুবিধা হয়, আমি তো আছিই।'

অর্জুন আর কিছু বলেনি, তবে মনের ভেতর অস্বস্তি আর খুঁতখুঁতুনিটা চলছিলই।

এদিকে কমলার দুই চোখ আবার অর্জুনের দিকে ফিরে এসেছে। সে বলেছিল, 'ফাদার, তুমিই ওকে দেখিয়ে দিও।'

অর্জুন লক্ষ করেছিল, কমলা রেভারেণ্ড টিরকেকে ফাদার বলে।

রেভারেণ্ড টিরকে বলেছিলেন, 'না না, এই দায়িত্বটা তোকেই নিতে হবে। তুই জানিস তো আমার কত কাজ। তার ভেতর থেকে সময় বার ক'রে নেওয়াই মুশকিল।'

চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকে দেখিয়ে কমলা বলেছিল, 'কিন্তু এর তো মেয়েদের কাছে শেখার বিলকুল ইচ্ছে নেই।'

মেয়েটা কি মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারে! অর্জুনের অস্বস্তি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

এদিকে রেভারেণ্ড টিরকে বলছিলেন, 'অর্জুন তোকে বলেছে?'

'না। তবে—'

'কী?'

'আমার মনে হচ্ছে।'

'তা হ'লে তো মুশকিল। আমি এত সময় কোথায় পাই!' রেভারেণ্ড টিরকেকে খুবই চিন্তিত দেখিয়েছিল। তিনি আরো একবার অর্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কমলা যথেষ্ট যত্ন ক'রে শেখাবে, তার কোনো চিন্তার কারণ নেই, ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হয়েছিল অর্জুন। সে আড়ষ্ট গলায় বলেছে, 'আমার একটা আর্জি আছে রেভারেণ্ড—'

'বল।'

'আমি যে এখানে রোজ আসব, কেউ যেন জানতে না পারে।' বলেই নিজের অজান্তে কমলার দিকে তাকিয়েছিল অর্জুন। চোখে

পড়েছে মেয়েটার দৃষ্টি তার ওপর স্থির হয়ে আছে, কম্‌লার মুখে চাপা ধারাল একটু হাসি। হাসিটা কি বিদ্রূপের? ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছিল অর্জুন।

রেভারেণ্ড টিরকে বলে উঠেছিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের দিক থেকে তোমার ভয় নেই।' কম্‌লার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তাই না রে কম্‌লা?'

কম্‌লা উত্তর দেয়নি, অর্জুনের মুখ থেকে চোখও সরায়নি।

পরের দিন থেকেই তালিম নেওয়া শুরু হয়েছিল।

সন্ধ্যের পর নমকপুরা টাউনে অন্ধকার নামলে অর্জুন চার্চে চলে আসত। যে সব রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলে, লোকজন গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল বেশি, সেগুলো বাদ দিয়ে অনেকটা ঘুরে ফাঁকা মাঠ-ঘাট ভেঙে সে আসত। বাড়ি ফিরত বেশ রাত ক'রে। তখন নমকপুরা শহরের হৈচৈ প্রায় থেমে গেছে। রাস্তায় কুচিৎ দু'চারটি মানুষ কি এক-আধটা টাঙ্গা বা সাইকেল-রিকশা চোখে পড়ত।

চার্চে এসে সোজা সে চলে যেত রেভারেণ্ড টিরকের বাংলোয়। সেখানে অভ্রান্ত নিয়মে দেখা যেত, কম্‌লা তার জন্য টাইপ রাইটার, কাগজ, কার্বন ইত্যাদি সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। রেভারেণ্ড টিরকেকে বেশির ভাগ দিনই বাংলোয় পাওয়া যেত না। তিনি মূল চার্চ বা হাসপাতালের কাজ সেরে ফিরতেন বেশ দেরি করেই।

অর্জুন আসামাত্রই কোচিং শুরু হয়ে যেত। কম্‌লা মেয়েটা আশ্চর্য সাবলীল। তার মধ্যে কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। পাশাপাশি বসে টাইপ রাইটারের বোর্ডে ইংরেজি অক্ষরগুলো কিভাবে সাজানো আছে, জলের মতো বুঝিয়ে দিত।

কোন অনাত্মীয় যুবতী অর্জুনের এত কাছে আগে কখনও বসেনি। তার ওপর সারা বাংলোয় কাজের মেয়ে মঙ্গরা ছাড়া অন্য কেউ নেই। সে-ও থাকত ভেতর দিকে—রান্নাঘরে কিংবা কুয়োর

পাড়ে। চার্চের বিশাল কমপাউণ্ডের এক কোণে নিঝুম বাংলোয় তারা দু'জন ছাড়া বাইরের বড় ঘরটায় সন্ধ্যের পর অনেকটা সময় আর কেউ আসত না।

দেড় ফুট দূরত্বে বসার কারণে একেবারে কুঁকড়ে থাকত অর্জুন। কমলার মুখের দিকে তাকাতে পারত না সে। মেয়েটার শরীরের ঘ্রাণ, শাড়ি এবং চুলের গন্ধ নাকের ভেতর ঢুকে গিয়ে তার স্নায়ুমণ্ডলকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলত। টাইপ রাইটারের হরফগুলো তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বোধ্য ধাঁধার মতো মনে হতো।

এভাবে ঘণ্টাখানেক কাটার পর রেভারেণ্ড টিরকে বাংলোয় ফিরতেন। তখন খানিকটা আরাম বোধ করত অর্জুন।

ঘরে ঢুকেই রেভারেণ্ড টিরকে রোজই জিজ্ঞেস করতেন, 'কিরকম প্রোগ্রেস করছে তোর স্টুডেণ্ট?'

কমলা বলত, 'ভেরি আনমাইণ্ডফুল। কিছু মনে রাখতে পারে না।'

কিন্তু তারপরেই যখন রেভারেণ্ড টিরকে ইংরেজি ল্যাংগুয়েজ এবং শর্টহ্যাণ্ড নিয়ে বসতেন তখন একবারের বেশি দু'বার বলতে হতো না।

রেভারেণ্ড টিরকে বলতেন, 'আমার কাছে তো বেশ পারছে। তোর কাছে কি ঘাবড়ে যায়?'

কমলা ঠোঁট টিপে বলত, 'কি জানি। আমি শেরও না, ভাল্লুও না—'

'ওর ওপর নিশ্চয়ই কড়া স্কুল মিস্ট্রেসগিরি চালাচ্ছিস। একটু নরম ক'রে কথা বলবি। নইলে ভরসা পাবে কেন?' বলে হাসতেন।

দিনকয়েক এভাবেই কেটে যায়। এর মধ্যে কমলা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতে পারেনি অর্জুন, যদিও তার কৌতূহল ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছিল। কথায় কথায় রেভারেণ্ড টিরকে শুধু বলেছেন, কমলা ছাত্রী হিসেবে ব্রিলিয়াণ্ট। পরের বছর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক

পরীক্ষা দেবে এবং ভাল রেজাল্ট সে করবেই। মাত্র এটুকুই'।
কিন্তু সে কার মেয়ে, রেভারেন্ড টিরকের সঙ্গে তার যোগাযোগ কিভাবে হ'ল, সে ওই বাংলোতেই থাকে কিনা—এ সব অজানাই থেকে গেছে।

যাই হোক, আস্তে আস্তে অর্জুনের আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছিল। টাইপ রাইটারে হরফগুলো কোথায় কিভাবে সাজানো রয়েছে, মোটামুটি তার দখলে চলে এসেছিল। তবু মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেত।

মনে আছে, একদিন আঙুলগুলো অক্ষরের ওপর সঠিক জায়গায় বসাতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল অর্জুনের। হঠাৎ বসবার মোড়াটা আরো কাছাকাছি টেনে এনে, অর্জুন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার দু'হাত ধরে আঙুলগুলো জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছিল কমলা। চাপা গলায় বলেছিল, 'বুদ্ধু কাঁহিকা, কিছুই মনে থাকে না!' শুধু হাতই না, তার কাঁধ এবং মাংসল ঊরুর অনেকটা অর্জুনের শরীরের নানা অংশে চেপে বসে গিয়েছিল।

সেই প্রথম তার গায়ে অনাত্মীয় কোনো তরুণীর স্পর্শ। রক্তস্রোতে বিজলী চমকের মতো কিছু বয়ে গিয়েছিল অর্জুনের আর হৃৎপিণ্ডে হাজারটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছিল যেন।

একসময় আচ্ছন্নের মতো কমলার দিকে তাকিয়েছে অর্জুন। সেই তাকানোর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে মেয়েটার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গিয়েছিল। দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে ছুটে সোজা ভেতরের একটা ঘরে চলে গেছে সে। সেদিন আর তাকে দেখা যায়নি।

কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ রেভারেণ্ড টিরকের ডাকে চমকে উঠেছে অর্জুন।

'কী ব্যাপার, তুমি একা? কমলা কোথায়?'

আঙুল বাড়িয়ে বাংলোর ভেতর দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল অর্জুন।

রেভারেণ্ড টিরকে এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজকের মতো টাইপ রাইটিংয়ের লেসন নেওয়া হয়ে গেছে ?'

আবছা গলায় অর্জুন বলেছে, 'হ্যাঁ। মতলব—' তার কথা পরিষ্কার বোঝা যায়নি।

রেভারেণ্ড টিরকে তার চোখ-মুখ ভাল ক'রে লক্ষ করেননি। জুতো মোজা খুলতে খুলতে বলেছেন, 'তা হ'লে টেবল থেকে পিটম্যানের বইটা নিয়ে এসো, শর্টহ্যাণ্ড শুরু করা যাক। কাল যেন কোন পর্যন্ত হয়েছিল ? তারপর—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আচমকা উঠে দাঁড়িয়েছে অর্জুন।

রেভারেণ্ড টিরকে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী হলো ?'

'আমি আজ বাড়ি যাব।'

'এখনই ? কেন ?'

নিতান্ত আনাড়ির মতো মিথ্যে বলেছিল অর্জুন, 'জরুরি কিছু কাজ আছে।'

অন্য কেউ হ'লে ধরা পড়ে যেত সে। কিন্তু রেভারেণ্ড টিরকে এতই ভালমানুষ যে কাউকেই তিনি অবিশ্বাস করতে শেখেননি। বলেছেন, 'ঠিক আছে। যাও—' বলে ভেতর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর সামান্য তুলে বলেছিলেন, 'কমলা, তোর স্টুডেণ্ট চলে যাচ্ছে। এসে গুড নাইট বলে যা—'

ভেতর থেকে কোনো উত্তর এসেছিল কিনা এতকাল পরে মনে পড়ে না।

অর্জুন আর দাঁড়ায়নি, কোনো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন থেকে প্রায় মাসখানেক অর্জুন বা কমলা কেউ কারো দিকে ভাল ক'রে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। এমন কি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতও না। আগে কাছাকাছিই বসত কমলা। এখন থেকে

প্রায় পাঁচ ফুট দূরত্বে বসে 'এখানে আঙুল', 'ওখানে ওয়াই'— এইভাবে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব কাজ চালিয়ে যেত কম্‌লা। কেউ কারো দিকে সোজাসুজি না তাকালেও অর্জুন হঠাৎ মুখ ফেরালেই দেখতে পেত, চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে নিঃশব্দে হাসছে কম্‌লা এবং তার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠছে।

অর্জুন টের পেত, কম্‌লার ঠোঁটের হাসিটা কখন যেন তার ঠোঁটেও উঠে এসেছে।

একটা মাস এভাবে কাটার পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা অর্জুন যখন কম্‌লার কাছে টাইপ রাইটিং-এর লেসন নিচ্ছে, হঠাৎ রেভারেণ্ড টিরকে বাংলোয় চলে এলেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি চার্চ বা হাসপাতাল থেকে ফেরেন না। ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে তিনি বলেছিলেন, 'অর্জুন, কম্‌লা—এক্ষুণি বিশেষ একটা দরকারে আমাকে পাটনা যেতে হচ্ছে। এক উইক আমাকে ওখানে থকতে হবে। যে ক'দিন না ফিরি, অর্জুন তুমি একটা কাজ করবে, তোমার লেসন নেওয়া হয়ে গেলে কম্‌লাকে ওদের টোলা পর্যন্ত যদি এগিয়ে দাও ভাল হয়।'

অর্জুন চমকে উঠেছিল। সেদিন সে প্রথম জানতে পেরেছিল, কম্‌লা রাত্তিরে এখানে থাকে না। কাছাকাছি, নাকি অনেক দূরে ওদের টোলা বা মহল্লা?

অর্জুন উত্তর দেবার আগেই কম্‌লা বলে উঠেছে. 'না না, কাউকে কষ্ট করতে হবে না। আমি একাই চলে যেতে পারব।'

রেভারেণ্ড টিরকে বলেছিলেন, 'না না, ওদিকটা অন্ধকার। মিউনিসিপ্যালিটির বাতি নেই। তা ছাড়া একটা দিশী মদের দোকান রয়েছে। ওখানে যত মাতালের আড্ডা। রাত্তিরে মেয়েদের একা একা ওই সব রাস্তা দিয়ে যাওয়া ঠিক না।'

কম্‌লা আর কিছু বলেনি।

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওদের টোলাটা কোথায়?'

রেভারেণ্ড টিরকে যা জানিয়েছিলেন তা এইরকম। চার্চ থেকে আড়াই তিন ফার্লং উত্তরে যে অচ্ছুতটোলাটা রয়েছে তারই একধারে গাঙেগাতাদের মহল্লা। সেখানে কমলাদের ঘর।

আবছাভাবে অর্জুন আগেই টের পেয়েছিল, কমলা হয় অচ্ছুত, নতুবা খ্রিস্টান। এরা ছাড়া কেউ তো নমকপুরার গীর্জায় আসে না। কিন্তু এর পাশাপাশি কমলার কথাবার্তা শুনে, চালচলন এবং রাহান-সাহান দেখে তার মনে ক্ষীণ একটু আশা জেগেছিল, হয়তো মেয়েটা খ্রিস্টান বা অচ্ছুত না-ও হতে পারে। অনিবার্য কোনো কারণে তাকে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে অর্জুন জেনে যায় সে গাঙেগাতা, তৎক্ষণাৎ তার অস্তিত্বের নানা স্তরে জমে-থাকা ব্রাহ্মণত্বের আদিম সংস্কার রীতিমত ধাক্কা খায়। কমলা গাঙেগাতা না হ'লে পৃথিবীর কারো আদৌ কোনো ক্ষতি হতো না। বাতাস তেমনই বয়ে যেত, নদীর জলধারা থেমে থাকত না, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। কমলা অচ্ছুত হওয়াতে জগতে সামান্য যে ক্ষতিটুকু হয়েছে হয়তো তা একান্তভাবেই অর্জুনের। খুবই ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বিরাট বিরাট সমস্যার তুলনায় নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

রেভারেণ্ড টিরকে অর্জুনের মুখ-চোখ দেখে কিছু একটা আন্দাজ ক'রে বলেছিলেন, 'তোমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে না। অচ্ছুতটোলার মুখ পর্যন্ত সঙ্গে গেলেই ও চলে যেতে পারবে।' একটু থেমে ব্যস্তভাবে ফের শুরু করেছেন, 'না না, অচ্ছুতটোলার খুব কাছে যেও না। খানিকটা দূরে যে পীপল গাছটা রয়েছে সেই পর্যন্ত গেলেই চলবে। কেউ তোমায় দেখে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তোমার মা-বাবা কিংবা তোমাদের জাতের লোকজনের কাছে খবরটা পেঁছে দেবে। এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।'

অর্জুনের বুকের ভেতর একটা তোলপাড় চলছিল। দ্বিধান্বিতভাবে সে বলেছে, 'ঠিক আছে।'

এরপর কম্‌লাকে দিয়ে দ্রুত একটা স্যুটকেসে কিছু জামা-কাপড় সারপ্লিস ভরিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। অর্জুনরাও দেরি করেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেরিয়ে পড়েছে।

চার্চের কমপাউণ্ডের বাহিরে আসতেই চারিদিকে পাতলা অন্ধকার। নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটি শহরের এদিকটায় রাস্তাঘাটে ল্যাম্প পোস্ট বসানোটা জরুরি মনে করেনি। নেহাত আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ ছিল, গলানো রুপোর মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। তাই হাঁটতে তেমন একটা অসুবিধা হচ্ছিল না।

কোনো তরুণীর সঙ্গে আগে আর কখনও এভাবে পাশাপাশি হাঁটেনি অর্জুন। মায়াবী জ্যোৎস্নালোকে মনে হচ্ছিল, তারা যেন অপার্থিব এক স্বপ্নের ভেতর চলে এসেছে। কম্‌লা যে গাঙ্গোতা, অচ্ছুতদের চোখেও অচ্ছুত, তাকে ছুঁলেও যে ব্রাহ্মণদের দশ বার নাহানা ক'রে শুদ্ধ হ'তে হয়—এসব কথা আর অর্জুনের মনে পড়তে চাইছিল না।

গীর্জার পর থেকে উত্তর দিকটা অনেকখানি ফাঁকা। তারপর ছাড়াছাড়া ভাবে খৃস্টানদের পাড়া। অচ্ছুতদের ভেতর যারা ষাট সত্তর বছর আগে খৃস্টান হয়েছে এটা তাদের কলোনি। নমকপুরার আদি খৃস্টানদের বেশির ভাগই মরে ফৌত হয়ে গেছে। কিছু প্রাচীন বুড়োবুড়ি এবং পরের দুই জেনারেসানের মানুষেরা এখানে থাকে।

খৃস্টান হবার পরও এই অচ্ছুতদের হাল প্রায় কিছুই ফেরেনি। অন্য সব অচ্ছুত যারা হিন্দু সোসাইটির একেবারে নিচের স্তরে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে, এরা তাদের মতোই গরীব, হাভাতে। তবে গাঙ্গোতা, ধাঙড় বা দোসাদদের থেকে এক দিকে তারা খানিকটা এগিয়ে আছে। কয়েক বছর ধ'রে তাদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ দেখা দিয়েছে। তারা শুনেছে শিডিউল্ড কাস্ট, শিডিউল্ড ট্রাইব এবং মাইনোরিটিদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য চাকরি-বাকরির

'কোটা' ঠিক করা আছে। অচ্ছুত-থেকে-খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া এই সব মানুষের আশা, লেখাপড়া শিখে উচ্চ বর্ণের বামহন-কায়াথদের মতো তাদের ছেলেপুলেরাও একদিন দামী দামী নৌকরি ক'রে দারিদ্র্য হতাশা এবং আবহমান কালের অপমান কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

খ্রিস্টানদের পাড়ায় এখনও বিজলি আসেনি। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবে বা হেরিকেন জ্বলছিল। দূর থেকে তাদের কথাবার্তা এবং রান্নার ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছিল।

চুপচাপ দু'জনে খ্রিস্টানদের পাড়াটা পেরিয়ে গেছে। একদিক থেকে বাঁচোয়া, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, কোথাও লোকজন নেই।

চলতে চলতে বার বার মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে লক্ষ করছিল কমলা। হঠাৎ সে বলে উঠেছে, 'আপনার বহুত 'ঘিন' (ঘৃণা) লাগছে তো?'

চমকে সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়েছে অর্জুন। বলেছে, 'কেন?'

'আমার মতো একটা অচ্ছুতের মেয়েকে সঙ্গে ক'রে পৌঁছে দিতে হচ্ছে বলে?'

আড়ষ্ট, কাঁপা গলায় অর্জুন বলেছে, 'না না, ঘিন লাগবে কেন?'

কমলা জিজ্ঞেস করেছে, 'তা হ'লে কী এত ভাবছেন?'

'কই, কিছু না, কিছু না—'

'কিছু না তো, এতক্ষণ পাশাপাশি হাঁটছি, একটা কথাও কিন্তু বলেননি। গুংগার মতো, জাস্ট লাইক ডাম্ব, আমরা চলছি তো চলছিই। ফাদার আপনাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছেন।'

মনে আছে, কথা বলতে গেলে কমলার মুখ থেকে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ বেরিয়ে আসত। একটু আগে সে যা বলেছিল তাতে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ ছিল কি? অর্জুনের পৌরুষে হয়তো কোথাও একটু খোঁচা লেগেছিল। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে সে বলে উঠেছে, 'কোনো বিপদে ফেলেননি।'

'ট্রু ?'

'হ্যাঁ, ট্রু।'

খ্রিস্টান পাড়ার পর আবার অনেকটা জায়গা একেবারে নির্জন। দু'ধারে বাড়িঘর বা বসতি-টসতি বলতে কিছু নেই। শুধু উঁচু-নিচু পড়তি জমি, আগাছার ঝোপ, বুনো লতার ঝাড়। সেই রাত্তিরে আলোর ছুঁচ হয়ে অগুনতি জোনাকি আবছা অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে মাঠের ওপর ওড়াউড়ি করছিল।

জনশূন্য মাঠের পর দারুখানা অর্থাৎ দিশী মদ, তাড়ি, গাঁজা এবং ভাঙের দোকান। সেখানে হ্যাজাক জ্বলছিল, অনেক দূর থেকে তেজী আলোটা চোখে পড়েছে। আর ভেসে আসছিল শরাবীদের জড়ানো গলার হল্লা, চিৎকার এবং অকথ্য খিস্তি-খেউড়।

দারুখানাটা ডান দিকে, একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষে। অর্জুনরা বাঁ পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে, শ্বাসরুদ্ধের মতো এগিয়ে গেছে। দারুখানার মাতালেরা এমন চুর হয়ে ছিল এবং নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত যে কে কার সঙ্গে যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে আদৌ তাদের মাথাব্যথা নেই।

যেতে যেতে হঠাৎ অর্জুনের হৃৎপিণ্ডটা থমকে গেছে যেন। দারুখানার ভেতর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মান্ধাতা শর্মার ভাই চতুর্ভুজ শর্মাকে দেখা গেছে। নমকপুরা শহরের সে একজন প্রথম শ্রেণীর শরাবী এবং গাঁজাখোর। ক্ষয়াটে ভাঙাচোরা চেহারা তার, তোবড়ানো গাল, মাথায় হেজে যাওয়া সামান্য কিছু কাঁচাপাকা চুল, ঘোলাটে চোখ, সারা মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি।

চতুর্ভুজ তার শিকড়ে শিকড়ে রোগা হাতে মুঠি পাকিয়ে গলার নলি ফাটিয়ে চেরা চেরা, খ্যাসখেসে স্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। অন্য সব মাতালের হল্লা ছাপিয়ে তার গলা ক্রমাগত চড়ছিল।

অর্জুন জানতো, মদ ভাঙ গাঁজা-টাঁজা পেলে চতুর্ভুজ নরকের শেষ মাথা পর্যন্ত দৌড়ে যেতে পারে। কিন্তু নমকপুরা টাউনের ওই দারুখানায়, যেখানে অচ্ছুতেরা ছাড়া আর কেউ আসে না সেখানে

পবিত্র শর্মা বংশের একটি কুলাঙ্গারকে দেখা যাবে, এটা ভাবা যায়নি। নেশার কারণে নামতে নামতে কোথায় এসে ঠেকেছে সে! হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ে গিয়েছিল, নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা পাঁড় শরাবী চতুর্ভুজকে একরকম খারিজই ক'রে দিয়েছে। মান্ধাতা শর্মা কতদিন যে নেশায় চুর-চুর চতুর্ভুজকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেয় তার ঠিক নেই।

প্রথমটা ভীষণ অবাক হয়েছিল অর্জুন। পরক্ষণে মারাত্মক ভয়ে তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত ছুটতে থাকে। চতুর্ভুজের সঙ্গে লতায় পাতায় তাদের কিরকম যেন আত্মীয়তা রয়েছে। সে যদি আচমকা রাস্তার দিকে মুখ ফেরাত, দেখতে পেত, একটা যুবতীর সঙ্গে বিশুদ্ধ দ্বিবেদী বংশের এক জোয়ান 'ছৌরা' অচ্ছুতটোলার দিকে চলেছে। তারপর এক ঘণ্টার ভেতর নমকপুরার তাবৎ ব্রাহ্মণের কাছে এই অত্যন্ত উত্তেজক খবরটা চাউর হয়ে যেত।

তেত্রিশ কোটি স্বর্গবাসী দেবদেবীর অপার করুণা, চতুর্ভুজ একবারও রাস্তার দিকে তাকায়নি। অর্জুন নির্বিঘ্নেই কমলাকে সঙ্গে নিয়ে দারুখানা পেরিয়ে গেছে।

এরপর খানিকটা গেলেই ঝাঁকড়া-মাথা বিশাল পীপর গাছ। সেখানে এসে কমলা বলেছে, 'আর আসতে হবে না। এবার আপনি ফিরে যান।'

এখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে অচ্ছুতটোলার ঘরে ঘরে টিমটিমে কেরোসিনের বাতিগুলো দেখা যাচ্ছিল। অর্জুনের মনে পড়ে গেছে, এই পীপর গাছটা পর্যন্তই কমলাকে এগিয়ে দিতে বলেছিলেন রেভারেণ্ড টিরকে। সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কমলা বলেছিল, 'আপনার অনেক কষ্ট হলো।'

অর্জুন বলেছে, 'না, কিসের কষ্ট!'

কমলা একটু হেসে বলেছে, 'আচ্ছা যাই, কাল আবার দেখা হবে। আপনি আর দাঁড়াবেন না। অনেকটা দূর আপনাকে যেতে হবে।'

কম্‌লা অচ্ছুতটোলার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পাতলা অন্ধকারে তার বেতের মতো মেদশূন্য সতেজ শরীর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

ফেরার সময় আগের মতোই অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দারুখানাটা পেরিয়ে গেছে অর্জুন। যদিও এবার সঙ্গে একটি যুবতী নেই, তবু অচ্ছুতটোলার দিকে কোনো সদ্বংশের ব্রাহ্মণ যুবকের আসাটা রীতিমত গর্হিত কাজ। প্রশ্ন উঠতে পারে, চতুর্ভুজও তো এখানকার দারুখানায় হানা দিয়েছে। চতুর্ভুজের এই দুষ্কর্মটি এতই প্রাচীন যে কারো জানতে বাকি নই। এটা সবার প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু অর্জুনের অপরাধটা এত টাটকা এবং অভাবনীয় যে বারুদের স্তূপে মুহূর্তে আগুন ধরে যাবে।

এবারও রাস্তার দিকে তাকায়নি চতুর্ভুজ। আগের মতোই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, গলার স্বর এক জায়গায় রেখে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল সে।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে অর্জুনের মনে হয়েছে, চতুর্ভুজ এখানকার দারুখানায় নিশ্চয়ই নিয়মিত হাজিরা দেয়। কাজেই এদিকে আর আসা ঠিক হবে না। একদিন চতুর্ভুজের চোখ এড়ানো গেছে। কিন্তু রোজই যে সে উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে যাবে এবং ভুলেও রাস্তার দিকে তাকাবে না, এর কি কোনো গ্যারাণ্টি আছে?

কিন্তু পরের দিন কম্‌লাকে দেখার পর আগের রাতের সিদ্ধান্তটা আর মনে থাকেনি। টাইপ রাইটিং-এর লেসন নেওয়া হয়ে গেলে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। অচ্ছুতটোলার দিকে যেতে যেতে সেদিন আরো অনেক কথা হয়েছিল কম্‌লার সঙ্গে। তখনই সে প্রথম জানতে পেরেছে, কম্‌লার বাবার নাম জগলাল। তাদের সংসারে মা-বাবা ছাড়া রয়েছে বুড়ি দাদী এবং তারা পাঁচ ভাইবোন। ভাইবোনদের মধ্যে কম্‌লাই সবার বড়।

কম্‌লাদের এক ধুর জমিও নেই। তার বাপ জগলাল এবং মা নাথুনিকে উদয়াস্ত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মান্ধাতা শর্মার

খেত আর খামারে 'গতর চূরণ' খাটাখাটনি ক'রে এত বড় সংসারের পেটের দানা জোটাতে হয়। তারা গরীবের চাইতেও গরীব, কৃমিকীটের মতো জগতের এক কোণে পড়ে আছে।

কমলাদের সংসারের যা হাল তাতে তার লেখাপড়া ক'রে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। এ জাতীয় শৌখিনতা গরীব আনপড় গাঙ্গোতাদের জীবনে একেবারেই বেমানান। আবহমান কাল ধরে অচ্ছুতটোলার ছেলেমেয়েরা যা ক'রে এসেছে সে এবং তার ভাইবোনদের ঠিক তা-ই করতে হতো। মা-বাপের পিছু পিছু মান্ধাতা শর্মা কি বড় জমিমালিক রাজপুত ক্ষত্রিয় হেমরাজ সিংয়ের জমিতে লাঙল ঠেলতে বা কোদা (এক ধরনের আগাছা) বাছতে যেতে হতো। কিন্তু রেভারেণ্ড টিরকে এসে সব কিছু ওলটপালট ক'রে দিয়েছেন। গীর্জার কমপাউণ্ডে একটা প্রাইমারি স্কুল খুলে কয়েক বছর আগে ছাত্র-ছাত্রীর খোঁজে অচ্ছুতটোলায় এবং খ্রিস্টানদের পাড়ায় হানা দিয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের মহল্লায় তবু কিছু সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অচ্ছুতটোলার বাসিন্দারা লেখাপড়ার মতো একটা উটকো বিলাসিতাকে একেবারেই আমল দেয়নি। তাদের কাছে এটা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। এর চেয়ে খেতে গিয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে লাঙল চষলে দু-এক সের বেশ গেঁহু কি মকাই পাওয়া যাবে। একমাত্র গাঙ্গোতা জগলাল, বরখী দোসাদ এবং ভুদি চামার রেভারেণ্ড টিরকেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়নি। অচ্ছুতটোলার অন্য বাসিন্দাদের তুলনায় তারা অনেকখানিই দূরদর্শী। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে, লেখাপড়া শেখাটা খুবই জরুরি। এর মধ্যে বিরাট শক্তি ঠাসা রয়েছে।

রেভারেণ্ড টিরকে বুঝিয়েছিলেন, কোনোরকমে খানিকটা লেখাপড়া করতে পারলে তাদের হাল একেবারে পালটে যাবে। শিডিউল্ড কাস্ট আর শিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য চাকরি-বাকরির আলাদা কোটা রয়েছে।

বি. এ, এম. এ পাশ করলে তো কথাই নেই। যেমন তেমন ক'রে

ম্যাট্রিকটা পাশ করলেও চাকরি পাওয়া অবধারিত। শুধু ক'টা বছর একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, খানিকটা কষ্টও করতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবলে এই কষ্টটুকু কিছুই না।

প্রথম দিকে দশ বারোটি ছেলেমেয়ে নিয়ে স্কুল খুলেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। তাদের ভেতর কমলাও ছিল।

কমলাকে পড়াতে পড়াতে রেভারেন্ড টিরকের মনে হয়েছে, এমন ঝকঝকে ভাল ছাত্রী আগে আর কখনও পাননি। শুরু থেকেই তিনি তার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন। কমলাকে নিয়ে বুঝিবা তাঁর মনে একটা গোপন চ্যালেঞ্জ ছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, সমাজের একেবারে নিচু লেভেল থেকে তুলে এনে অনেক উঁচুতে তাকে পৌঁছে দেবেন। সেজন্যে কমলা ক্লাশ ফাইভে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার বাপকে ব'লে তাকে নিজের বাংলোতে নিয়ে আসেন। ভোরে অচ্ছুতটোলা থেকে এসে সারাদিন ওখানে থাকত কমলা। বাংলো থেকেই স্কুলে যেত, সন্ধ্যেবেলা রেভারেন্ড টিরকের কাছে পড়ে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরত। রেভারেন্ড টিরকে নিজে তাকে পৌঁছে দিয়ে যেতেন।

বাংলোতে থাকতে থাকতে ক'বছরে চিরকুমার রেভারেন্ডের সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব কমলার হাতে চলে এসেছিল। তার পছন্দ-অপছন্দ বা মতামতের বাইরে ওখানে কিছু হবার নয়।

এভাবে কমলার দায়িত্ব নেওয়ায় জগলাল গাঙ্গোতার সংসারে খানিকটা সুরাহা হয়েছে। অন্তত একটি মানুষের পেটের চিন্তা থেকে সে মুক্তি পেয়েছিল। সেটা গরীব হাভাতের সংসারে কম কথা নয়।

এধারে সব দিক থেকেই কমলাকে চৌকস ক'রে তুলেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। শুধু লেখাপড়াই না, টাইপরাইটিং, ইংরেজিতে করেসপনডেন্স এবং শর্টহ্যান্ডেও পাশাপাশি এমনভাবে তালিম দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে চাকরি-টাকরি পেতে এতটুকু অসুবিধা না হয়। দু-একটা সরকারী দপ্তরে তিনি কথাও বলে রেখেছেন। সে

সব জায়গায় শিডিউল্ড কাস্টদের জন্য ভ্যাকেন্সি রয়েছে। কমলা যে চাকরি পেয়ে যাবে তাতে এতটুকু সংশয় ছিল না।

কথায় কথায় অর্জুনরা দারুখানার কাছে চলে এসেছিল। সেদিন আর ঝুঁকি নেয়নি অর্জুন। রাস্তা দিয়ে সোজা না গিয়ে পাশের মাঠে নেমে অনেকটা ঘুরে কমলাকে সঙ্গে ক'রে আবার রাস্তায় উঠেছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ বছর তো তুমি ম্যাট্রিক দিচ্ছ। রেজাল্ট বেরুবার পর নিশ্চয়ই চাকরি নেবে?'

কমলা অন্যমনস্কর মতো বলেছে, 'সেই রকমই ইচ্ছে। তবে—' বলতে বলতে আচমকা দ্বিধান্বিতভাবে থেমে গিয়েছিল।

'তবে কী?'

'চাকরি নিলে সংসারের উপকার হয়। বাবা-মা আমাদের জন্যে খেটে খেটে লাইফ শেষ ক'রে ফেলল। কিন্তু আমার ইচ্ছে বি. এ-টা অন্তত পাশ করি। ম্যাট্রিকুলেশনের পর চাকরি নিলে বড় জোর টাইপিস্ট বা ক্লার্কের পোস্ট পাব। গ্র্যাজুয়েট হ'লে নিশ্চয়ই অফিসার গ্রেডে আমাকে নিয়ে নেবে। বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলি, যদি আর চারটে বছর কষ্ট ক'রে সংসার টানতে পারে। আমি চাকরিতে ঢুকলে ওদের কাজ করতে দেব না।'

চাকরির কথায় বিষাদ নেমে এসেছে অর্জুনের মুখে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর সে বলেছে, 'তোমাদের কতো সুবিধা, পাশ করার আগেই চাকরি ঠিক করা আছে। আর আমি যে কবে কাজকর্ম পাব, রামচন্দ্রজিই জানেন।'

মজার গলায় কমলা বলেছে, 'এতদিন আপনারাই তো সব পেয়েছেন। আমরা না হয় এখন দু-একটা পাই।' একটু থেমে গভীর গলায় আবার বলেছে, 'টাইপ রাইটিং যেভাবে শিখছেন তাতে আপনিও চাকরি পেয়ে যাবেন।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর একেবারে অন্য কথায় চলে গিয়েছিল কমলা। সে বলেছে, 'ফাদার কবে পাটনা গেছে বলুন তো—'

একটু অবাক হয়েই অর্জুন বলেছে, 'সে কি, কাল গেলেন না! একদিনের ভেতর সব ভুলে গেলে!'

'আমার কী মনে হয় জানেন—'

'কী?'

'কাল আর আজ না, অনেকদিন ধরে আপনি আমাকে এই রাস্তায় বাড়ি পেঁছে দিচ্ছেন।' কমলা যেন পাশে নেই, তার কণ্ঠস্বর বুঝিবা বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল।

অর্জুন উত্তর দেয়নি, দ্রুত মুখ ফিরিয়ে কমলার দিকে তাকিয়েছে শুধু।

চোখের পলকে সাতটা দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারপর পাটনা থেকে ফিরে এসেছিলেন রেভারেণ্ড টিরকে। তিনি যেদিন এলেন সেদিন রাত্তিরে শর্টহ্যাণ্ড এবং ইংরেজির লেসন নেবার পর হঠাৎ অর্জুন বলেছিল, 'রেভারেণ্ড, আমি কি আজ কমলাকে ওদের বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসব?'

সরল, অন্যমনস্ক রেভারেণ্ড ভালো ক'রে অর্জুনকে লক্ষ করেননি। করলে তার চোখে-মুখে অন্য কিছু দেখতে পেতেন। বুঝতে পারতেন, তাঁর সামনের যুবকটির গোপন আবেগ কোন খাত ধরে ছুটে চলেছে। তিনি বলেছিলেন, 'না না, তোমাকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না। আমি তো এসেই গেছি। ডিনারের পর ওকে পেঁছে দিয়ে আসব।'

'এতটা রাস্তা বাস জার্নি ক'রে এসেছেন। নিশ্চয়ই টায়ার্ড হয়ে আছেন। কাল থেকে আপনি কমলাকে—'

তার কথা শেষ হবার আগে দুই হাত এবং মাথা প্রবলবেগে নেড়ে রেভারেণ্ড টিরকে বলে উঠেছেন, 'আরে না না, এইটুকু জার্নিতে আমি টায়ার্ড হই না। আজকাল তো পাটনা যাওয়া অনেক কমে গেছে। তিন বছর আগেও ফি মাসে দু'বার যেতে হতো। রাত্তিরে ফিরে এসেই কমলাকে ওদের ঘরে পেঁছে দিয়ে আসতাম।' বলে কমলার দিকে তাকিয়েছেন, 'তাই না রে?'

কম্‌লা ঠোঁট টিপে পলকহীন অর্জুনকে লক্ষ করছিল। চমকে উঠে দ্রুত ঘাড় হেলিয়ে সে সায় দিয়েছে, 'হ্যাঁ।'

এরপর কম্‌লাকে অচ্ছুতটোলায় পৌঁছে দেবার মতো জোরালো কোনো অজুহাত খুঁজে পায়নি অর্জুন।

পরের দিন সন্ধ্যেয় টাইপ রাইটিংয়ের লেসন দিতে দিতে হঠাৎ খুব চাপা গলায় কম্‌লা বলেছিল, 'কাল রাত্তিরে আমাকে ঘরে দিয়ে আসার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন কেন?' বলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে অর্জুনের। একসময় গাঢ় গলায় সে বলেছিল, 'আমার ইচ্ছে—'

দেখতে দেখতে প্রায় তিনটে বছর কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে ফিফটি সেভেন পারসেন্ট মার্কস পেয়ে সেকেন্ড ডিভিসানে ম্যাট্রিক পাশ করেছে কম্‌লা। তারপর প্রাইভেটে আই. এ দিয়েছে। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট অবশ্য তখনও বেরোয়নি।

ম্যাট্রিকের পরই একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল কম্‌লা কিন্তু সেটা নেয়নি। মা-বাবাকে বলে আর কয়েকটা বছর সময় চেয়ে নিয়েছে সে। অন্তত গ্র্যাজুয়েট তাকে হ'তেই হবে। জগলাল আর নাথুনি জানিয়েছে, যতদিন তাদের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে, কম্‌লা লেখাপড়া চালিয়ে যাক। বামহন কায়াথদের 'বরাবর' হয়ে উঠতে হবে তাকে। দুনিয়ার চোখে ঘৃণ্য, ভুখ বুখার এবং অন্ধকারে-ঘেরা অচ্ছুতটোলায় সে-ই প্রথম রোশনি জ্বালিয়ে তুলুক। কম্‌লাকে নিয়ে তার মা-বাপের বিপুল আশা। এমন কি সে ম্যাট্রিক পাশ করার পর অচ্ছুতটোলার তাবত বাসিন্দা গৌরব বোধ করতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে সেই প্রথম একজন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কম্‌লাকে নিয়ে ওদের গর্বের শেষ ছিল না। তার ম্যাট্রিক পাশ করাটা অচ্ছুতটোলায় বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে রেভারেন্ড টিরকে এবং কম্‌লার কাছে শর্টহ্যান্ড টাইপ

রাইটিং এবং ইংলিশ ল্যাংগুয়েজটা মোটামুটি ভালই শিখে নিয়েছিল অর্জুন। টাইপ রাইটিংয়ে তার স্পীড উঠেছিল পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, শর্টহ্যাণ্ডে আশি। তা ছাড়া ইংলিশ করেসপনডেন্সটাও প্রায় নির্ভুল করতে পারত সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অফিসে ঘুরে ঘুরে গোড়ালি ক্ষইয়ে ফেলেছিল অর্জুন। গোটা তিনেক ইণ্টারভিউ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তার কোনোটাই নমকপুরায় নয়। একটা রাঁচীতে, একটা ঝরিয়ায়, একটা কাটিহারে। কিন্তু বাড়ির কারো ইচ্ছা ছিল না অর্জুন অতদূরে চাকরি করতে যায়। সবার অমতে ট্রেনের টিকেটও কেটে ফেলেছিল সে। শেষ পর্যন্ত মা এমনই মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিল যে টিকেট ক্যানসেল ক'রে কিছু গচ্চা দিয়ে টাকা ফেরত আনতে হয়েছে।

কমলা এবং রেভারেণ্ড টিরকে অবশ্য আই. এ-টা দিতে বলেছিলেন। খানিকটা পড়াশোনাও করেছিল অর্জুন কিন্তু সেবার ঠাকুমা মারা যাওয়ায় পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। মনে মনে সে ভেবে রেখেছিল, পরের বছর যেভাবে হোক পরীক্ষায় বসবে।

মনে আছে, তৃতীয় বছরের শেষাশেষি হঠাৎ টাইফয়েডে বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল অর্জুনকে। এমনিতে তার অটুট স্বাস্থ্য, খুব সহজে অসুখ-বিসুখ হয় না। কিন্তু সেবারের অসুখটায় এতই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে একটি মাস বাড়ি থেকে বেরুতে পারেনি।

প্রথম দিন সাতেক অর্জুনের প্রায় হুঁশ ছিল না। জ্ঞান ফেরার পর গোড়াতেই যাকে মনে পড়েছে সে বাবা মা ভাইবোন বা বন্ধু-বান্ধব কেউ না—সে কমলা। পৃথিবীতে অগুনতি চেনাজানা মানুষজন থাকতে অচ্ছুত গাঙ্গোতাদের মেয়েটাকে কেন যে মনে পড়ে গিয়েছিল, অর্জুন জানে না। তার অজান্তে কমলা কবে কিভাবে যে শ্বাসবায়ুর মতো অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল, মিশে গিয়েছিল অস্তিত্বের সঙ্গে, সে টের পায়নি।

বিছানার পাশে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসেছিল রামঅবতার। অর্জুন দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'বাবুজি, আমি ক'দিন বিছানায় পড়ে আছি ?'

রামঅবতার বলেছিল, 'সাত-আট রোজ। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিলি।'

'আমাকে কেউ দেখতে এসেছিল ?'

'অনেকে।'

দ্বিধান্বিতভাবে এবার অর্জুন জানতে চেয়েছে, 'কারা ?'

রামঅবতার যাদের নাম বলেছিল সেই তালিকায় কম্‌লা নেই। সাত-আট দিন শয্যাশায়ী হয়ে থেকেছে অর্জুন, অথচ তার কথা একবারও মনে পড়ল না কম্‌লার! বুকের অতল স্তরে চিনচিনে একটা কষ্ট অনুভব করেছিল সে। পরক্ষণেই ভেবেছিল, রামঅবতারের ভুলও তো হয়ে থাকতে পারে। সবার কথা হয়তো তার মনে নেই। অর্জুন বলেছে, 'আর কেউ ?'

'নেহী।'

এবার দ্বিধান্বিতভাবে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছে, 'রেভারেণ্ড টিরকেও খোঁজ নিতে আসেননি ?' কম্‌লার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তার সাহস হয়নি।

রামঅবতার বুঝতে না পেরে বলেছে, 'ও কৌন ?'

'গীর্জার খ্রিস্টান সাধু, যাঁর কাছে টাইপ শিখতে যাই।'

ব্যস্তভাবে রামঅবতার এবার বলে উঠেছে. 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওহী পাদ্রী আয়া থা।'

রেভারেণ্ড টিরকের সঙ্গে কি কম্‌লা এসেছিল? উৎসুক ভঙ্গিতে অর্জুন জানতে চেয়েছে, 'পাদ্রী কি একাই এসেছেন, না তার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল ?'

রামঅবতার বলেছে, 'একাই।'

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন, তার অসুখের খবরটা অন্তত পেয়ে গেছে কম্‌লা।

মাসখানেক বাদে শরীরটা অনেকটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠলে আবার চার্চে যাতায়াত শুরু করেছিল অর্জুন। প্রথম দিন রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয় এসে সে কম্‌লাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'এতদিন বিছানায় পড়ে রইলাম। একবার দেখতেও গেলে না!' ক্ষোভে তার গলা প্রায় বুজে এসেছিল।

কম্‌লা গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আমার পক্ষে তোমাদের বাড়ি যাওয়া সম্ভব?' তিন বছরে কবে কখন যে তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে কারো খেয়াল নেই।

অর্জুন চমকে উঠেছে। প্রথমত কম্‌লা যুবতী, তার ওপর অচ্ছুত। হঠাৎ সে তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারত, সেটা আগে ভেবে দেখেনি অর্জুন। সে শুধু নিজের দিকটা নিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ধীরে ধীরে গাঢ় বিষাদে তার মন ভরে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর ঝাপসা গলায় অর্জুন বলেছে, না গিয়ে ভালই করেছ। তবে—'

'কী?'

'একটা চিঠি লিখলেও তো পারতে।'

'অনেকবার তা-ও ভেবেছি। কিন্তু লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে, যদি তোমাদের বাড়ির অন্য কারো হাতে চিঠিটা পড়ে যায়—'

এদিকটা অর্জুনের মাথায় আসেনি। সে শুধু ক্ষোভ এবং অভিমান নিয়ে নিজের কথাই ভেবেছে। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলেছিল, 'না লিখে ভালই করেছ।'

কম্‌লা বলেছিল, 'একটা মাস তোমাকে দেখিনি, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল—'

'আমারও।'

'রোজ ভাবতাম যা হবার হোক, তোমাদের বাড়ি চলে যাই। একদিন চার্চ থেকে বেরিয়েও পড়েছিলাম। কিন্তু খানিকটা যাবার পর ফিরে এসেছি।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর অর্জুন বলেছিল, 'জানো, অসুখের সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে একটা কথা আমার সব সময় মনে হতো—'

'কী?' সোজা অর্জুনের চোখের দিকে তাকিয়েছে কমলা।

গলার স্বর অনেকটা নিচে নামিয়ে ফিসফিস ক'রে অর্জুন বলেছে, 'আমি যদি তোমাদের মতো গাঙ্গোতা হ'তাম, কি তুমি যদি ব্রাহ্মণ হ'তে—' কথাটা শেষ না করেই আচমকা থেমে গেছে সে। তার বুকের অতল থেকে হৃৎপিণ্ড ভেঙেচুরে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল।

অর্জুন কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে কমলা। তারপর আস্তে আস্তে কখন যেন উঠে এসে অর্জুনের কাঁধে একটি হাত রেখেছিল।

কমলার স্পর্শে এমন কিছু ছিল যাতে অর্জুনের বাইশ বছরের যৌবন তোলপাড় হয়ে গেছে। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে কখন তাকে বুকের ভেতর টেনে এনেছিল, সে জানে না। তারপর কখন, কিভাবে, কোন স্বয়ংক্রিয় নিয়মে তার মুখ কমলার ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, অর্জুনের খেয়াল নেই। কমলার হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভব করতে করতে অর্জুন তার ঠোঁট কপাল গাল এবং চিবুক থেকে মধুর উষ্ণতা যেন শুষে নিচ্ছিল।

এই অজস্র চুম্বন বিশুদ্ধ চতুর্বেদী বংশের একটি ছেলে এবং অচ্ছুত গাঙ্গোতাদের একটি মেয়ের মাঝখানের যাবতীয় উঁচু উঁচু দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল।

একমাস টাইফয়েডে ভোগার কারণে প্র্যাকটিস করতে পারেনি অর্জুন। ফলে তার শর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপিংয়ের স্পীড ভীষণ কমে গিয়েছিল। সেটা ফিরে পেতে এক নাগাড়ে ক'দিন বাড়তি দু-এক ঘণ্টা করে তাকে খাটতে হয়েছে। এই এক্সট্রা খাটুনিটুকু ছাড়া সব কিছুই পুরনো রুটিন অনুযায়ী চলছিল।

হঠাৎ একদিন কম্‌লা বলেছিল, 'একটা কথা ক'দিন ধরে ভাবছি—'

অর্জুন উৎসুক চোখে তাকিয়েছে, 'কী কথা ?'

'টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ডে তোমার স্পীড এখন যা উঠেছে তাতে নৌকরি পেতে অসুবিধা হবে না। হঠাৎ একটা কিছু পেয়ে যদি নমকপুরা থেকে দূরে কোথাও চলে যাও, তখন—'

'তখন কী ?'

দ্রুত এক পলক অর্জুনের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে কম্‌লা। গাঢ় গলায় বলেছে, 'আমার কথা ভেবে দেখেছ ?'

অর্জুনের সারা মুখ কোমল হাসিতে ভরে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'চিন্তা নেহী করনা ম্যাডাম। নৌকরি-টৌকরি আমার হবে না। হলেও বাইরে যাওয়া সম্ভব না। তোমাকে তো বলেছিই, এর আগে তিন বার বাইরে ইণ্টারভিউ পেয়েছিলাম, মা আর বাবুজি যেতে দেয়নি। নমকপুরার বাউণ্ডারি ছাপিয়ে কোথাও যাবার উপায় নেই আমার।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'কিন্তু আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে—'

'কিসের ভাবনা ?'

'তুমি যদি নৌকরি পেয়ে কোথাও চলে যাও।'

মুখ নামিয়ে চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকে দেখতে দেখতে কম্‌লা চাপা গলায় বলেছে, 'তখন তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। যাবে তো ?' বলে ঠোঁট টিপে হেসেছে।

তার হাসিটা অলৌকিক কোনো পদ্ধতিতে অর্জুনের ঠোঁটেও উঠে এসেছিল। সে ধীরে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে।

আঙুল তুলে কম্‌লা বলেছে, 'ঠিক আছে, তখন দেখা যাবে।'

অর্জুনের ভারী অসুখটার পর মাস পাঁচেক কেটে গেছে। পুরনো নিয়মের কোথাও এতটুকু হেরফের হয়নি। সমস্ত কিছুই আগের নিয়মে চলছিল।

একদিন বিকেলে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে পাটনা থেকে আসা একটা মফস্বল এডিশানের হিন্দি পত্রিকায় চাকরি-বাকরির পাতাটা খুঁটিয়ে দেখছিল অর্জুন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মনে মনে সে ভাবছিল, এবার যদি বাইরে ইন্টারভিউ পেয়ে যায়, নিশ্চয়ই যাবে। মা-বাবা বাধা দিলেও মানবে না। বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, এরপর কোথাও চাকরি মিলবে না।

হঠাৎ বাইরে মান্ধাতা শর্মার গমগমে গলা শোনা গিয়েছিল, 'রামঅওতার, রামঅওতার —'

মান্ধাতা শর্মারা অর্জুনদের পাড়াতেই থাকে। অর্জুনদের বাড়ি থেকে ফার্লংখানেক দূরে রাস্তার মোড়ে তাদের বিশাল তিনতলা হাভেলি। মান্ধাতার সঙ্গে তাদের লতায়-পাতায় আত্মীয়তার সম্পর্ক তো আছেই, তা ছাড়া সে অর্জুনদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রায়ই কারণে অকারণে সে ও তাদের বাড়ির লোকেরা অর্জুনদের বাড়ি আসে। অর্জুনরাও যায়। নানাভাবেই মান্ধাতা তাদের সাহায্য করে। কখনও টাকাপয়সা দিয়ে, কখনও বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে। এইসব কারণে তার প্রতি অর্জুনদের পরিবারের আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এদিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রামঅবতারের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, 'আরে মান্ধাতা ভাইয়া, আও, আও —

শুয়ে শুয়েই অর্জুন টের পেয়েছে, অত্যন্ত শশব্যস্তে রামঅবতার ওধারের একটা ঘরে মান্ধাতাকে নিয়ে বসিয়েছিল। ওদের ভেতর কী কথাবার্তা হচ্ছিল, এঘর থেকে শোনা যায়নি।

মিনিট দশেক বাদে আচমকা মায়ের ডাকে চমকে উঠেছে অর্জুন। ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই চোখে পড়েছিল, মা দরজার বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন বলেছিল, 'কী বলছ মা?'

'তুই একবার ওই ঘরে চল। তোর বাবুজি আর মান্ধাতা ভাইয়া ডাকছে।'

'কেন?'

'গেলেই বুঝতে পারবি।'

বেশ অবাকই হয়েছিল অর্জুন। মান্ধাতা নিয়মিত তাদের বাড়ি এলেও এভাবে কখনও আগে ডাকে নি। সে কিছুটা অস্বস্তি কিছুটা কৌতূহল নিয়েই উত্তর দিকের শেষ ঘরখানায় চলে এসেছিল।

দু'টো ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ারে মুখোমুখি বসেছিল মান্ধাতা আর রামঅবতার। একধারে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে তক্তাপোষে আধময়লা বিছানা পাতা। সেটা দেখিয়ে মান্ধাতা বলেছিল, 'বৈঠো উহাঁ।'

মান্ধাতা এবং রামঅবতারকে লক্ষ করতে করতে অর্জুন বুঝতে চেষ্টা করেছিল, তাকে ডাকিয়ে আনার পেছনে এদের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে মান্ধাতাদের দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে তক্তপোষের কাছে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে পড়েছিল। মা অবশ্য বসেনি, দরজার একটা পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মান্ধাতা বলেছিল, 'একটা বাঢ়িয়া খবর নিয়ে এসেছি অর্জুন। আখেরে তোমার ভালই হবে।'

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছে, 'কী খবর?'

নিজে উত্তরটা দেয়নি মান্ধাতা। রামঅবতারের দিকে ফিরে বলেছিল, 'বেটাকে তুমিই বলো।'

দুই হাত এবং মাথা নেড়ে রামঅবতার বলেছে, 'নেহী নেহী ভাইয়া, তুমি বল।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলেছে, 'আরে অর্জুনকা মাঈ, ভাইয়া এত বড় একটা খবর নিয়ে এসেছে. তাকে 'মুহ্‌মিঠা' করাবে না? চায় পানির ব্যওস্থা কর।'

অর্জুনের মা লজ্জা পেয়ে জিভ কেটেছে। বলেছে, 'কা শরমকা বাত! আমার বিলকুল খেয়াল ছিল না। আভ্‌ভী লাতী হুঁ। যতক্ষণ না আসছি, আপনি কিছু বলবেন না ভাইয়া।' অর্থাৎ যা বলার তার সামনেই যেন বলে মান্ধাতা।

মান্ধাতা হেসে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।'

অর্জুনের মা প্রায় দৌড়েই চলে গিয়েছিল এবং কয়েক মিনিটের ভেতর ঘরে-বানানো মুগের লাড্ডু এবং নমকিন নিয়ে ফিরে এসেছিল। তার পেছনে অর্জুনের ছোট বোন রাধা। রাধার হাতে চায়ের কাপ।

ক্ষিপ্র হাতে চা লাড্ডু ইত্যাদি মান্ধাতাকে দিতে দিতে অর্জুনের মা বলছে, 'আভি বলিয়ে--'

লাড্ডুতে একটা কামড় দিয়ে বার কয়েক চিবিয়ে এক ঢোক চা খেয়েছিল মান্ধাতা। তারপর যা বলেছিল সংক্ষেপে এইরকম।

নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটিতে ক্যাশিয়ারের পোস্টটি খালি আছে। আগে যে ক্যাশিয়ার ছিল দিন কয়েক আগে সে রিটায়ার করেছে। এক সপ্তাহের ভেতর নতুন লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেই হবে, কেননা ক্যাশিয়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জরুরি পোস্ট ফাঁকা রাখা যায় না। মান্ধাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ধৌলিদাস দুবের হাতে-পায়ে ধরে ওই নৌকরিটা অর্জুনকে দেবার জন্য রাজী করিয়েছে।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন। মান্ধাতার কাছে তারা সপরিবারে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

রামঅবতার আপ্লুত গলায় বলেছে, 'তোমার ঋণ আমরা সারা জীবনে শোধ করতে পারব না ভাইয়া—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মান্ধাতা বলেছে, 'কত সাল ধরে অর্জুন একটা নৌকরির জন্যে কী না করছে! যেই শুনলাম মিউনিসিপ্যালিটি ক্যাশিয়ার নেবে, অমনি ধৌলিদাসজির কোঠিতে ছুটলাম। আমার কথা কি শুনতে চায়! সাত রোজ সুবে-সাম ধরনা দেবার পর ঘাড় পাতল। লেকেন রামঅওতার—'

রামঅবতার তটস্থ ভঙ্গিতে বলেছে, 'কহো ভাইয়া—'

তিন আঙুলে বিচিত্র মুদ্রা ফুটিয়ে, পুরু ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে মান্ধাতা বলেছে, 'ছোটা এক শর্ত হ্যায়—'

'কী শর্ত ?'

'এমন কিছু না। ধোলিদাসজির এক লেড়কী আছে। উমর চোদ্দ পনের সাল হবে। হাইস্কুলে টেন ক্লাসে পড়ে, আগেলা সাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। ধোলিদাসজির ইচ্ছা, অর্জুনকে তার দামাদ করে নেয়। অত বড় আদমী, কমসে কম হাজার একর চাষের জমিন, সোনা চাঁদি জেবর যে কতো তার হিসেব নেই। সিরিফ দো লেড়কী ধোলিদাসজির। বড় লেড়কীর শাদি হয়ে গেছে। ইতনা জায়দাদের আধা হিস্‌সা পেয়ে যাবে অর্জুন। তা ছাড়া ধোলিদাসজির দামাদ হ'বার কিতনা সম্মান! তুমলোগ শুনা তো হ্যায়, আগেলা বিধানমণ্ডলকা চুনাওমে ধোলিদাসজি কনটেস্ট করেগা। জরুর উনহোনে এম. এল. এ বনেগা। ভগোয়ান রামচন্দ্রজির কৃপা পেলে জরুর মিনিস্টারও হয়ে যাবেন। মিনিস্টারকা দামাদ! ও হো, কিত্‌না বড়ে সৌভাগ!' বলতে বলতে প্রবল আবেগে এবং উচ্ছ্বাসে তার গলার স্বরে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

রামঅবতার এবং তার স্ত্রী ছেলের চাকরি এবং ধোলিদাস দুবের মতো একজন বিখ্যাত মূল্যবান বেয়াই পাওয়ার অভাবনীয় সৌভাগ্যে যুগপৎ এতই বিচলিত আর ডগমগ হয়ে উঠেছিল যে কী বলবে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিল না।

এদিকে শুনতে শুনতে অর্জুনের মাথার ভেতর আগুনের একখানা চাকা ঘুরে যাচ্ছিল যেন। শ্বাসকষ্টের মতো অসহনীয় এক যন্ত্রণা তার শিরাস্নায়ু ফাটিয়ে চুরমার করে দিয়েছে। মনে হচ্ছিল, জিভটা শুকিয়ে খরখরে বালির মতো কাঁটা কাঁটা হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে গলা চিরে যাচ্ছিল। চোখের সামনে দৃশ্যমান সমস্ত কিছু একাকার হ'য়ে একটি মুখ চারিদিকে কোনো অদৃশ্য সিনেমার পর্দায় ফুটে উঠছিল। সে মুখটি কমলার। আচমকা চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন, 'নেহ্ঁী, নেহ্ঁী—'

ঘরের সবাই হকচাকিয়ে গিয়েছিল। চকিত ভাবটা কাটলে মান্ধাতা বলেছে, 'কী হলো ?'

'আমি ওই শর্তে নৌকরিতে ঢুকব না।'

'আরে বাপু, শাদি তো একদিন করতেই হবে, না কি বলিস?'

'যদি কপালে থাকে, করব।'

'শাদিতে যখন আপত্তি নেই তখন ধৌলিদাসজির বেটীকে শাদি করলে ক্ষতিটা কী? কানা না, আন্ধা না, খোঁড়া না, গুংগা না— বিলকুল স্বাস্থ্যবতী খুবসুরত গোরী লেড়কী। তার ওপর টেন ক্লাসে পড়ে। বড়ে ঘর, বহুত জায়দাদ—নমকপুরায় এমন লেড়কী আর কোথায় পাবি!'

মুখ নামিয়ে ঘাড় গোঁজ করে থেকেছে অর্জুন। চাপা অথচ অবিচলিত স্বরে বলেছে, 'নেহ্‌ী।'

রামঅবতারের মতো শান্ত নিরীহ মানুষও হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে। উৎকৃষ্ট চাকরিসুদ্ধু এমন সৌভাগ্য গোঁয়ার একগুঁয়ে ছেলেটার হঠকারিতায় হাতছাড়া হ'তে দেখে মাথার ঠিক থাকেনি তার। গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মান্ধাতা ভাইয়া ধৌলিদাসজির মতো এত বড় আদমীর লেড়কীর সঙ্গে শাদির কথা বলতে এসেছে। তোর এত সাহস যে তার মুখের উপর ঠাঁই ঠাঁই 'না' বলে দিচ্ছিস। উল্লু, তোর কি মনে হয় কোনো রাজা মহারাজা মেয়ে দেবার জন্যে তোর পায়ে ধরে সাধতে আসবে! হারামজাদ, এ শাদি তোর ঘাড় করবে।'

অদম্য এক জেদ অর্জুনকে পেয়ে বসেছে যেন। সে বলেছে, 'আমার ওপর জবরদস্তি ক'রো না বাবুজি।'

'মতলব!'

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েছিল রামঅবতার। অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় তার হাত-পা মারাত্মক কাঁপছিল। শরীরের সব রক্ত উঠে এসেছিল দুই চোখে। হিংস্র দৃষ্টিতে ছেলেকে দেখতে দেখতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে। তার আগেই হাত তুলে মান্ধাতা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'শান্ত হো যাও রামঅওতার। এত গুস্‌সা হ'লে ব্লাড

প্রেসার চড়ে যাবে। শরীর খারাপ হবে। তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

গজ গজ করতে করতে আবার বসে পড়েছে রামঅবতার। আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অর্জুনের মা একবার ছেলেকে, একবার স্বামীকে, একবার মান্ধাতাকে দেখে যাচ্ছিল।

মান্ধাতার মাথা বরাবরই খুব ঠাণ্ডা। সামান্য কারণে সে উত্তেজিত হয় না, মেজাজটাকে সর্বক্ষণ নিজের কনট্রোলে রাখতে জানে। অবশ্য দরকারমতো অত্যন্ত বিপজ্জনকও হ'য়ে উঠতে পারে।

মান্ধাতা অর্জুনের কাঁধে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলেছিল, 'সাফ সাফ বল্ তো, কেন ধৌলিদাসজির লেড়কীকে শাদি করতে চাস না। কারণটা কী?'

'আমি—আমি—' বলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেছে অর্জুন।

'তুই কী?'

অর্জুন উত্তর দেয়নি, মাথা নিচু করে বসে থেকেছে।

মান্ধাতা আবার বলেছে, 'ডরনেকা কুছ নেহী। তুই বল্—'

প্রথমটা কিছুতেই বলবে না অর্জুন। কিন্তু মান্ধাতার অসীম ধৈর্য। উত্তেজনাশূন্য প্রশান্ত মুখে একই কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেছে সে। শেষ পর্যন্ত অর্জুন বলেছে, 'পরে বলব।' আসলে একটি অচ্ছুত গাঙ্গোতার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, এমন কথা মান্ধাতার মুখের ওপর বলতে সাহস হয়নি তার।

'ঠিক হ্যায়। কবে বলবি?'

'দু-একদিনের মধ্যে।'

মান্ধাতা আর বসেনি, চলে গিয়েছিল। অর্জুনও তক্ষুণি বেরিয়ে পড়েছে। সোজা সে চলে এসেছিল রেভারেণ্ড টিরকের বাংলোয়। অসময়ে তাকে দেখে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল কম্‌লা। বলেছে, 'কী ব্যাপার, এ সময়ে!' পরক্ষণেই তার মুখচোখের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছে, 'কী হয়েছে বল তো—'

কিছুক্ষণ আগে মান্ধাতা কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সে কী বলেছে, সব জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আমি কী করব বলে দাও—'

শুনতে শুনতে মুখটা গভীর বিষণ্ণতায় ভরে গিয়েছিল কমলার। ম্লান হেসে সে বলেছে, 'ধৌলিদাসজির লেড়কীকে শাদি করা তো সৌভাগ্যের কথা। কত কিছু পাবে, তার ওপর একটা নৌকরি। তুমি ওখানেই শাদি করে ফেল।'

অর্জুন বলেছে, 'আমি কাকে চাই, সে তো তুমি জানো।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি অচ্ছুত। আমাদের শাদি হ'লে নমকপুরা তোলপাড় হ'য়ে যাবে।'

'যা হ'বার হবে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না কমলা।'

গভীর আবেগে অর্জুনের একটা হাত বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিল কমলা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অর্জুন বলেছে, 'রেভারেন্ড কোথায়?'

'চার্চে।'

'আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।'

দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে কমলার মুখে। সে বলেছে, 'কেন? ফাদারকে আমাদের কথা বলবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের পেছনে না দাঁড়ালে শাদির ব্যাপারে এক কদমও বাড়ানো যাবে না।'

এরপর সোজা চার্চে চলে গিয়েছিল অর্জুন। রেভারেন্ড টিরকেকে সব কিছু জানিয়ে বলেছে, 'কমলা আর আমি শাদি করতে চাই। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন রেভারেন্ড টিরকে। তারপর বলেছেন, 'তোমার মা-বাবাকে শাদির কথা জানিয়েছ?'

'না।'

'তা হ'লে ?'

'ভাবছি, কমলাকে নিয়ে কোথাও চলে যাব। আপনি কী বলেন ?'

'নো, নেভার।' জোরে জোরে মাথা নেড়েছেন রেভারেণ্ড টিরকে। তারপর যা বলেছেন তা এইরকম। সামাজিক বিপ্লব যদি করতেই হয় এই নমকপুরায় থেকেই তা করতে হবে। পালিয়ে যাওয়া মানে এক ধরনের ডিফিট। তারা চুরি-রাহাজানি খুনখারাপি বা ঐ জাতীয় ঘৃণ্য কোনো অপরাধ করেনি। ব্যভিচারেও তারা লিপ্ত নয় যে চেনাজানা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। তারা যথেষ্টই প্রাপ্তবয়স্ক, নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। অর্জুনদের একমাত্র অপরাধ, এই সামাজিক সিস্টেমে তাদের একজন ব্রাহ্মণ, আরেক জন গাঙ্গোতা। আবহমান কালের নিয়ম ভেঙে তারা যখন বিয়েটা করতেই চাইছে তখন যত বাধা আর সমস্যাই আসুক, এই নমকপুরায় থেকেই সেগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াক। বহুকালের পুরনো সংস্কার যখন নিজেরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন জাতপাত ছুঁয়াছুতের প্রশ্নে জর্জরিত জঘন্য সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে ভাল ক'রেই যুদ্ধ ঘোষণা করুক।

অর্জুন বলেছে, 'আপনি জানেন না রেভারেণ্ড, আমার মা আর বাবুজি কতটা গোঁড়া। তা ছাড়া আমাদের জাতের লোকজন রয়েছে। তারা এ শাদি কিছুতেই মেনে নেবে না। সবাই ভীষণ গোলমাল করবে।'

'তবু মা-বাবুজিকে জানাতে হবে। কমলার মা-বাপকেও জানাবে।'

রেভারেণ্ড টিরকে যা বলেছেন তাতে যথেষ্ট সায় ছিল অর্জুনের। মনে মনে সেটা চেয়েছেও সে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভয়টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অর্জুনের মধ্যে একজন সাহসী যোদ্ধার স্পিরিটকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে।

অর্জুন অবশ্য সেদিনই মা-বাবাকে বিয়ের ব্যাপারটা জানায়নি। জানিয়েছে আরো দিন তিনেক পরে।

শোনামাত্র খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। আর রামঅবতার বাজ-পড়া মানুষের মতো অনেকক্ষণ থ হ'য়ে থেকেছে। তারপর মারাত্মক রাগে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিল। তার শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছিল। রক্তবর্ণ চোখ দুটো ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। আঙুল তুলে নাচাতে নাচাতে হিস্টিরিয়ার ঘোরে সে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'উল্লু ভুচ্চর, আমাদের শুদ্ধ বংশকে নরকে ডোবাতে চাস! বামহনকা ঘরমে কুত্তাকা জনম হুয়া। ঠার যা, টৌলিকা সব কোঈকো বুলাতা হ্যায়। মার মারকে তেরা জান খতম কর দুঙ্গা।'

স্ত্রী যে মূর্ছিত হ'য়ে মাটিতে পড়ে আছে, সেদিকে লক্ষ ছিল না রামঅবতারের। ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা এবং বংশের গৌরব রক্ষা করাটা তার কাছে অনেক বেশি জরুরি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এদিকে বাড়িতে হুলস্থুল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছোট ভাইবোনেরা একসঙ্গে তুমুল কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তাই শুনে পাশের ঝাঁদের বাড়ির লোকজন ছুটে এসেছে। তারা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করেছে, 'ক্যা হুয়া রে, ক্যা হুয়া?'

অর্জুন উত্তর দেয়নি। দিশেহারার মতো জল এনে সবে মায়ের মাথায় ঢালতে শুরু করেছে, সেই সময় বাইরের রাস্তায় প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা গিয়েছিল। চমকে খোলা দরজা দিয়ে সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে তিরিশ চল্লিশটা লোক দারুণ উত্তেজিত এবং হিংস্র ভঙ্গিতে হল্লা করতে করতে তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। সবার সামনে রয়েছে রামঅবতার মান্ধাতা নওলকিশোর ধনিকরাম

সুরযদেও ভানপ্রতাপ, এমনি আরো অনেকে। এরা নমকপুরার ব্রাহ্মণ সোসাইটির মাথা। এদের এতই দাপট এবং ক্ষমতা যে শুধু ব্রাহ্মণরাই না, গোটা নমকপুরাই তাদের ভয়ে তটস্থ হ'য়ে থাকে। এই ছোট্ট নগণ্য শহরে যে কোনো বিষয়ে এদের মতামতই চূড়ান্ত। এদের কথা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণীর মতোই অমোঘ। এদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাথা তোলার দুঃসাহস এখানকার একটি মানুষেরও নেই। বোঝা গেছে, মান্ধাতাদের ডেকে আনতেই ছুটে গিয়েছিল রামঅবতার।

প্রবল পরাক্রান্ত এতগুলো ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে আসতে দেখে বসে থাকতে সাহস হয়নি অর্জুনের। জলের লোটাটা মায়ের মাথার কাছে নামিয়ে রেখে পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গিয়েছিল সে। অর্জুন জানতো মান্ধাতারা ধরতে পারলে তাকে বরখা নদীর শুকনো বালির খাতে পুঁতে ফেলবে। তাদের কাছে জাতপাতের সওয়াল জগতের সব চাইতে মহার্ঘ বস্তু : ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা রক্ষা করা জীবনের সবচেয়ে পবিত্র কাজ।

অর্জুন সোজা চলে এসেছিল চার্চে। রেভারেণ্ড টিরকেকে সব জানাবার পরও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। শান্ত মুখে বলেছিলেন, 'এটাই আমি ভেবেছিলাম। যাক, তোমার ডিউটি তুমি পালন করেছ। এবার কমলাকে সঙ্গে ক'রে তার মা-বাপের কাছে যাও। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চার্চে চলে এসো।'

অচ্ছুতটোলার শেষ মাথায় কমলাদের ঘর। তারা গরীবের চাইতেও গরীব। তাদের ফুটোফাটা টিনের চালের ঘরটা অনেকখানি হেলে রয়েছে। ওটার আয়ু বেশিদিন নেই। আগামী বর্ষায় তেমন জোরে ঝড়বৃষ্টি হ'লে ঘরটা যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

কমলার বাপ আধবুড়ো ক্ষয়াটে চেহারার জগলাল গাঙেগাতা সব শুনে প্রথমটা আঁতকে ওঠে। তারপর হাতজোড় ক'রে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'নেহী নেহী

দেওতা, ইয়ে হো নেহী সাকতা। যেত্তে রোজ চান্দা-সুরয আসমানে রয়েছে তেত্তে রোজ বামহন আউর অচ্ছুতের শাদি হ'তে পারে না। ইয়ে পাপ দেওতা, এমনিতেই নরকে পড়ে আছি। আর আমাকে নিচে নামাবেন না।'

কম্‌লার মা নাথুনির চেহারাও রোগা, ভাঙাচোরা। সে-ও হাতজোড় ক'রে শবাসরুদ্ধের মতো বলেছিল, 'অ্যায়সা মাত কহো দেওতা। বরাম্ভন হোতা হ্যায় ভগোয়ানকা বরাবর। তার হাতে লেড়কী দিই কী ক'রে ? আপ এহী নরকসে চলা যাইয়ে।'

অর্জুন সেই প্রথম টের পেয়েছিল, অচ্ছুতেরাও এক ধরনের সংস্কারের শিকার। আবহমান কাল ধরে এরা জেনে এসেছে বিষ্ঠার পোকার চাইতেও তারা অধম, এই হীনমন্যতা কোনোভাবেই তাদের মাথা তুলতে দেয় না। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের ছেলে এদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে যায়। অর্থাৎ বামহন-কায়াথদের মতো তারাও ভাবে, এতকাল যা চলে আসছে তাই চলুক। ব্রাহ্মণরা সোসাইটির মাথায় চড়ে থাক, অচ্ছুতেরা থাক হিন্দু সমাজের একেবারে নিচের লেভেলে। দু পক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথা ভেঙে যায়, এটা কারোরই কাম্য নয়। সবারই ইচ্ছা সমান্তরাল ধারায় কাছাকাছি থেকেও তারা কোনোদিন যেন এক স্রোতে মিশে না যায়, দু পক্ষের মাঝখানে ভয় ঘৃণা হীনমন্যতা ইত্যাদি দিয়ে একটা চিরস্থায়ী বিভাজিকা রেখা যেন টানা থাকে।

অগত্যা অর্জুন আবার কম্‌লাকে নিয়ে চার্চে ফিরে রেভারেন্ড টিরকেকে জগলালদের ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল।

রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'এটাও আমার জানা ছিল। সংস্কার ভেঙে তোমাদের কারো মা-বাবাই বেরিয়ে আসতে সাহস পাবে না।'

বিমূঢ়ের মতো অর্জুন বলেছে, 'এখন আমরা কী করব রেভারেন্ড ?'

'আশা করি, বিয়েটা তোমরা করবে। কারো ভয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত পালটে যাবে না।'

'না। কিন্তু—'

'কী?'

'আমাদের বাড়ির এখন কী হাল আর আমাদের জাতের লোকজনেরা কীভাবে ক্ষেপে আছে, সব আপনাকে জানিয়েছি। ধরতে পারলে সবাই মিলে আমাকে শেষ করে ফেলবে। এখন আমি কোথায় থাকব?'

এক মুহূর্তও না ভেবে রেভারেণ্ড টিরকে বলেছেন, 'যতদিন কোনো ব্যবস্থা না হয় আমার কাছেই থাকো। পরে ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে।'

অর্জুন উত্তর দেয়নি। সৎ সাহসী এবং হৃদয়বান ওই খ্রিস্টান মিশনারি সম্পর্কে তার মন কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধায় ভরে গেছে।

চার্চে আশ্রয় পাবার পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি। পরের দিন সকালেই দলবদ্ধভাবে নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকজন গীর্জায় হানা দিয়েছিল। কীভাবে এখানকার খবর পেয়েছিল, তারাই জানে। এই চার্চ তৈরি হবার পর ষাট সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে বামহন-কায়াথরা কোনোদিন এখানে আসেনি। তাদের এই অভিযানের কারণটা আন্দাজ করেই রেভারেণ্ড টিরকে অর্জুনকে তাঁর বাংলো থেকে গীর্জায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, খ্রিস্টানদের মূল ধর্মস্থানে উঁচু জাতের লোকেরা ঢুকবে না।

অভিজ্ঞ বহুদর্শী মানুষটির ধারণা যে কতটা নির্ভুল, কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাওয়া গিয়েছিল। বামহন-কায়াথরা গীর্জা বাড়িতে না ঢুকে সোজা চলে গিয়েছিল রেভারেণ্ড টিরকের বাংলোতে। সেখানে তারা কী করেছিল, তাঁর সঙ্গে ওদের কী কথা হয়েছিল, সে সব কিছুই জানাননি রেভারেণ্ড। তবে পরে মঙ্গরা অর্জুনকে জানিয়েছে, ওরা গোটা বাংলো বাড়িটা আঁতিপাতি করে খুঁজে

দেখেছে অর্জুন ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা। অর্জুনকে না পেয়ে তারা চলে গিয়েছিল অচ্ছুতটোলার দিকে। ওদের মনে হয়েছিল, অর্জুন হয়তো সেখানেই পালিয়ে গেছে। নমকপুরার ইতিহাসে সেই প্রথম এতগুলো ব্রাহ্মণ এবং কায়াথ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধাঙড় দোসাদ গাঙ্গোতাদের পাড়ায় গিয়েছিল। অর্জুন শুনেছে, ওরা অচ্ছুতদের শাসিয়ে এসেছে, যদি তার সঙ্গে কম্‌লার বিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, পুরো অচ্ছুতটোলি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

যাই হোক, চার্চের কম্পাউণ্ড থেকে বামহন-কায়াথরা বেরিয়ে যাবার পর গীর্জা বাড়িতে চলে এসেছিলেন রেভারেণ্ড টিরকে। বলেছেন, 'তোমার জাতের লোকজন তোমাকে ছাড়বে না। আমার পক্ষেও কম্‌লাকে আর তোমাকে বেশিদিন প্রোটেকসান দেওয়া সম্ভব না। নমকপুরার আপার কাস্টের লোকেরা খুবই পাওয়ারফুল।'

মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল অর্জুন। সে বলেছে, 'তা হ'লে কি থানায় একটা ডায়েরি ক'রে রাখব?'

'কোনো লাভ হবে না অর্জুন। থানা ওদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলবে ব'লে মনে হয় না।'

'তবে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে রেভারেণ্ড টিরকে বলেছেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেসন যদি তোমাকে প্রোটেকসান দেয়, তা হ'লে বাঁচতে পারবে। নইলে ভীষণ বিপদ। পাওয়ারফুল ব্রাহ্মণ আর কায়াথ অ্যাক্সিস তোমার আর কম্‌লার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। এক কাজ কর—'

ভয়ার্ত চোখে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছে, 'কী?'

'তুমি এখানকার এস. ডি. ও চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা কর। শুনেছি মানুষটা খুব লিবারেল, জাতপাতের সওয়ালে কোনোরকম সম্‌স্কার নেই। উনি সাহায্য করলে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।'

অর্জুন খুব একটা ভরসা পায়নি। রেভারেন্ড টিরকে যদিও অকপটে প্রশংসা করেছেন, তবু একজন উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ কতটা লিবারেল হ'তে পারেন, সে সম্পর্কে তার যথেষ্ট সংশয় ছিল।

অবশ্য চন্দ্রকান্তর কাছে যাওয়া ছাড়া চারপাশে আর কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না। গাঢ় অন্ধকারে এটুকুই ছিল সেই মুহূর্তে তার কাছে একমাত্র রুপোলি রেখা।

অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই এস. ডি ও'র বাংলোয় গিয়েছিল অর্জুন এবং কমলা। কিন্তু মিনিট পনের কথাবার্তার পর সংশয় আর টেনশান অনেকটাই কেটে গিয়েছিল তাদের। সংস্কারমুক্ত উদার চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, 'ডোণ্ট ওরি। আমি তোমাদের দায়িত্ব নিলাম। কনগ্র্যাচুলেশন ফর দিস ভেরি বোল্ড স্টেপ। ন্যাশনাল ইণ্টিগ্রেসান, ন্যাশনাল ইণ্টিগ্রেসান বলে হল্লা করলেই তো হয় না। এই সব ইণ্টার-কাস্ট, ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল ম্যারেজ দিয়ে জাতীয় সংহতির পিলার বানাতে হয়! এসো আমার সঙ্গে—' তিনি অর্জুনদের সঙ্গে ক'রে বাংলোর ভেতরে গিয়ে স্ত্রীর হাতে তাদের সঁপে দিয়েছেন।

সরযূ উপাধ্যায়ও পরম স্নেহে এবং সমাদরে তাদের গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর সাতটা দিন ঝড়ের বেগে কেটে গেছে। এর মধ্যে একবার পাটনায় গেছেন চন্দ্রকান্ত। মিনিস্টার, এম. পি এবং স্থানীয় এম. এল. এ'র সঙ্গে দেখা ক'রে অর্জুন এবং কমলার বিয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন। এমন কি অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করলে আইন অনুযায়ী যে চাকরি এবং পাঁচ হাজার টাকা সরকারী ইনসেনটিভ পাওয়া যায়, তারও বন্দোবস্ত করেছেন। একবার গেছেন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে। সেখানে ডি. এম, এ. ডি. এম, এস. পি, ডি. এস. পি, সার্কেল ইন্সপেক্টর থেকে শুরু ক'রে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন।

সাত দিন পর বিয়েটা সুচারুভাবে সম্পন্ন ক'রে আজ অর্জুন এবং কমলাকে বাড়ি পাঠিয়েছেন চন্দ্রকান্ত আর সরযূ।

শিরদাঁড়ার মতো সোজা রাস্তাটা দিয়ে নমকপুরার শেষ মাথায় যখন রামঅবতারের বাড়ির সামনে বিশাল গাড়িটা এসে থামে তখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

পুরানা মহল্লার তাবত ব্রাহ্মণ এবং কায়াথ এই মুহূর্তে এখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু চতুর্বেদী বংশের ছেলে একটি গাঙ্গোতার মেয়ে বিয়ে ক'রে বাড়ি ফিরছে, সবাই এই অবিশ্বাস্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে চায়।

ভীত চোখে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় কমলা ডাকে, 'শুনো—'

জানালার বাইরে তাকিয়ে চারপাশের চাপ-বাঁধা ভিড়টা দেখতে দেখতে সেই সব মানুষের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেছিল অর্জুন। সেও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে স্ত্রীর রক্তশূন্য সন্ত্রস্ত মুখ দেখতে দেখতে সাহস দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'ডরো মাত—'

এদিকে ড্রাইভার নেমে পড়েছিল। লোকটা আসলে গাড়ি চালায় না। সে পুলিশের একজন ছোটোখাটো অফিসার। নাম লালধারী সিং। লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা তার, নাকের তলায় মোমে-মাজা জমকালো পাকানো গোঁফ।

লালধারী গমগমে গলায় হাঁকে, 'রামঅওতারজি কঁহা হ্যায়? কিরপা করকে ইধর আইয়ে।'

সদর দরজার ঠিক মুখে রামঅবতার ভীত উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। কেননা তার গা ঘেঁষেই রয়েছে মান্ধাতা সুরযদেও ভানপ্রতাপ নওলকিশোর এবং আরো অনেকে।

রামঅবতার দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়েই থাকে। এমনিতেই কমলার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েতে মান্ধাতাদের একেবারেই সায় ছিল

না। তারা ভয়ানক ক্ষেপে আছে। এর পর সে গাড়িটার কাছে গেলে ওদের রাগ আরো কতটা চড়ে যাবে, সঠিক আঁচ করা যাচ্ছে না! এর পাশাপাশি মিনিস্টার, এম. এল. এ, ডি. এম এবং এস ডি. ও'দের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। একদিকে নমকপুরায় দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্রাহ্মণেরা, আরেক দিকে তার চেয়েও পাওয়ারফুল মিনিস্টার, এস. পি, এস ডি. ও ইত্যাদি। মাঝখানে জাঁতাকলে পড়া ইঁদুরের মতো আটকে গিয়ে রামঅবতার একেবারে গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে। তারই ঔরসে জন্ম নিয়ে অর্জুন যে এত বড় একটা সর্বনাশ ক'রে বসবে, পবিত্র চতুর্বেদী বংশের মুখে চুনকালি লাগিয়ে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল?

পুলিশের লোককে উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষ ক'রে স্বয়ং এস. ডি. ও যখন তাকে পাঠিয়েছেন। চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত মান্ধাতাদের একবার দেখে প্রায় মরিয়া হ'য়েই লালধারীর কাছে চলে আসে।

লালধারী বলে, 'এস. ডি. ও সাহেব আপনার লেড়কা আউর পুতহুকে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিয়েছেন, এদের সঙ্গে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়। কোনোরকম ঝামেলা হ'লে এস ডি. ও সাহেব খুদ এখানে চলে আসবেন।' পুলিশী মেজাজে এই পর্যন্ত বলে গলার স্বরটা অনেকখানি নরম ক'রে আবার শুরু করে, 'উপহারের অনেক সামান নিয়ে এসেছি। কোথায় রাখব দেখিয়ে দিন। আউর হাঁ, তার আগে পুতহুকে 'স্বাগত' ক'রে ঘরে নিয়ে যান। 'স্বাগত'-এর ব্যওস্হা হয়েছে?'

লালধারীর কাছে এস. ডি. ও'র হুঁশিয়ারি শুনে বেজায় ঘাবড়ে গেছে রামঅবতার। ঢোক গিলে সে বলে, 'আমার পত্নীর ভারী বুখার। 'স্বাগত' কে করবে? এস. ডি ও সাহেব আমাকে যেন ক্ষমা করেন।'

জানালা দিয়ে রামঅবতারকে লক্ষ করছিল অর্জুন। বাবুজি যে মিথ্যে বলছে, তার মুখচোখের চেহারা দেখে টের পেয়ে যায় সে।

মা কোনোমতেই, হাজার জবরদস্তি করলেও অচ্ছুতের মেয়েকে 'স্বাগত' জানাবার জন্য রাস্তায় আসবে না। রামঅবতার তাদের বিয়ের সময় এস. ডি ও.'র বাংলোয় থেকে যাওয়ায় অর্জুনের ক্ষীণ একটু আশা হয়েছিল, হয়তো সমস্যাটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। মুখের কথা খসালেই তো সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। এখন দেখা যাচ্ছে, মিনিস্টার, ডি. এম, এস. ডি. ও'দের ভয়ে আর ছেলের নৌকরি এবং নগদ টাকার লোভে রামঅবতার বিয়ের সময় থেকে গিয়েছিল।

লালধারী সিং বলে, 'আপনার পত্নীর বুখার। লেড়কার চাচী-মাসি-ফুফী কি পড়োশীনরা নেই? তাদের আসতে বলুন—'

আক্রমণটা এইদিক থেকে আসবে, ভাবতে পারেনি রামঅবতার। সে হকচকিয়ে যায়, তবে কোনো উত্তর দেয় না।

লালধারী সিং কিছু একটা আন্দাজ ক'রে কমলার অভ্যর্থনার জন্য আর চাপ দেয় না। ক্যারিয়ার থেকে দামী দামী উপহারের বাক্স এবং প্যাকেটগুলি বের ক'রে নিচে নামাতে নামাতে বলে. 'পুতহুকে 'স্বাগত' না করেন, এগুলোকে জরুর করবেন—না কী বলেন?' তার গলায় কিঞ্চিৎ চাপা বিদ্রূপ মেশানো রয়েছে।

বিদ্রূপটা উপেক্ষাই ক'রে রামঅবতার। এদিক সেদিক তাকাতেই ভিড়ের ভেতর তার ছোট ছেলে বিনোদ এবং বাড়ির কাজের ছোকরা ধনিয়াকে দেখতে পায়। রামঅবতারের দুই ছেলের মধ্যে বড় অর্জুন, তারপর বিনোদ। হাতের ইশারায় বিনোদদের কাছে ডেকে উপহারের প্যাকেট-ট্যাকেটগুলো বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে বলে।

এদিকে বাক্সটাক্স নামাবার পর গাড়ির দরজা খুলে লালধারী কমলাকে বলে, 'শুনলে তো, তোমার সাসু বা আর কেউ তোমাকে 'স্বাগত' জানাতে আসবে না। বহুত দুখকা বাত। সব কুছ নসীব।' বলে কপাল দেখিয়ে দেয়। কমলার জন্য সে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত হয়েছে। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার

বলে, 'কী আর করবে, এজন্যে ভেঙে পড়ো না। মনমে তাকত রাখো। সব কুছ ঠিক হো যায়েগা। আও, উতার আও—'

কম্‌লা এবং অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

লালধারী অর্জুনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'কেউ যখন এল না, তুমিই ধরমপত্নীকে 'স্বাগত্‌' ক'রে নিয়ে যাও। আপনা পত্নীর সম্মান যাতে থাকে সেদিকে নজর রেখো। ভগোয়ান রামচন্দ্রজি তোমাদের কিরপা করুন।'

অর্জুন কৃতজ্ঞ চোখে লালধারীকে একবার দেখে, তারপর রামঅবতারের দিকে তাকায়, 'বাবুজি, আমরা—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।

নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন রামঅবতার বলে, 'আয়—'

রামঅবতারের পিছু পিছু অর্জুন এবং কম্‌লা বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। লালধারী সিং গাড়ির কাছে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

চলতে চলতে ভয়ে এবং প্রবল অনিশ্চয়তায় হাত-পা ভয়ানক কাঁপতে থাকে কম্‌লার। মনে হয়, কোমর থেকে নিচের অংশটা খসে যাবে। মুখ তুলে সে কারো দিকে তাকাতে পারছে না। তবু বুঝতে পারে চারপাশে কয়েক জোড়া হিংস্র ভয়ঙ্কর চোখ থেকে আগুনের হলকা ছুটছে। তার আঁচ সে অনুভব করতে পারছে। নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী, এস ডি. ও'দের চাপে তাদের বিয়ে ঠেকাতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু বোঝা যায়, খুব সহজে তারা এই অপমান মেনে নেবে না।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'দেখো দেখো অচ্ছুতিয়াকা দামাদ (জামাই) দেখো।'

'জানোয়ার আমাদের জাত মেরেছে। ওকে আমরা ছাড়ব না।'

চাপা গলায়, লালধারীর কান বাঁচিয়ে ইত্যাকার নানারকম মন্তব্য করতে থাকে আশেপাশের লোকজন।

অর্জুন একবার ভাবে, লালধারীর সঙ্গে এস. ডি. ও'র বাংলোয় ফিরে যাবে কিনা, পরমুহূর্তেই ভাবে, না, এতদূর এসে সে

কিছুতেই ফিরে যাবে না। একটা মারাত্মক উত্তেজক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে তারা, এর একটা প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

দরজা পেরিয়ে অর্জুন সবে বাড়ির ভেতরে একটা পা ফেলেছে, মান্ধাতা নিচু কর্কশ গলায় পাশ থেকে বলে, 'কাজটা ভাল করলি না অর্জুন। ভবিষ্যতে তোদের পস্তাতে হবে। মৌত পর্যন্ত কাঁদতে হবে।'

চমকে একবার মান্ধাতাকে দেখেই ঘাড় গুঁজে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায় অর্জুন। দু পা যেতে না যেতেই কোনো একটা ঘর থেকে মায়ের একটানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে।

রামঅবতার শোবার ঘরগুলোর দিকে যায় না, ঢালা উঠোন পেরিয়ে টিনের ফাঁকা চালাগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

অর্জুন ভয়ে ভয়ে ডাকে, 'বাবুজি—'

রামঅবতার থমকে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। রূঢ় গলায় বলে, 'ক্যা ?'

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?'

জ্বলন্ত চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রামঅবতার বলে, 'তোমার কি ইচ্ছে আমি তোমাদের ওখানে নিয়ে তুলব ?' বলে আঙুল বাড়িয়ে শোবার ঘরগুলো দেখিয়ে দেয়।

এক ফুঁয়ে বাতি নিভিয়ে দেবার মতো অর্জুনের শেষ শীর্ণ আশাটুকু বিলীন হয়ে যায়। এটা সে ভাবতে পারেনি।

এবার আর মুখে কিছু বলে না রামঅবতার। আঙুল দিয়ে টিনের চালাগুলোর দিকে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় চালাটার কাছে এসে খোলা দরজা দেখিয়ে বলে, 'যা। তোরা ওখানে থাকবি।' বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, উঠোনের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উলটো দিকের পাকা ঘরগুলোর দিকে চলে যায়।

এ বাড়িতে তাদের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কমলার সঙ্গে তার বিয়েটাকে মা এবং বাবুজি কীভাবে নিয়েছে, বুঝতে

এতটুকু অসুবিধা হয় না অর্জুনের। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। তারপর ঝাপসা গলায় কমলাকে বলে, 'এসো।' পা বাড়াতে গিয়ে তার চোখে পড়লো, মান্ধাতা ধনিকরাম সুরযদেও এবং আরো অনেকে সদর দরজার কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তারা চালার ভেতর ঢুকলে মান্ধাতারা চলে যায়। অর্জুনের মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ কিছু একটা ঘটে যায়। তার মনে হয়, বাবুজি তাদের শোবার ঘরে নিয়ে তোলে কিনা সেটা দেখার জন্য ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

চালাটার ভেতর নতুন বাল্ব জ্বলছে। ওদিকের কোনো একটা ঘর থেকে তাড়াহুড়ো ক'রে তার টেনে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একধারে তক্তাপোষে ধবধবে বিছানা পাতা। এবড়ো-খেবড়ো মেঝেতে তাদের নতুন দু'টি সুটকেস, বাস্কেট, কিছু বাসনকোসন, স্টোভ, প্লাস্টিকের ক্যানে কেরোসিন। ক'টা পলিথিনের ব্যাগে চাল ডাল আটা চিনি চা ইত্যাদি। একটা বেতের ঝুড়িতে আলু এবং অন্যান্য কাঁচা আনাজ। দুটো প্লাস্টিকের বালতি আর কাচের সোরাইও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ কমলা আর অর্জুনের জন্য একেবারে আলাদা বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে।

কমলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ক'টা দিন ধরে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তারপর আজ সকাল থেকে এই রাত পর্যন্ত একটানা উত্তেজনা ভয় এবং আতঙ্কের চাপে তার মাথার ভেতরটা যেন ফেটে চুরমার হয়ে যাবে। আচ্ছন্নের মতো বিছানায় সে নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দেয়, তারপর দু হাতে মুখ ঢাকে।

একসময় কমলা টের পায়, অর্জুন তার পাশে এসে বসেছে। মুখ থেকে হাত না সরিয়ে সে বলে, 'আমার জন্যে তোমাকে যে এত কষ্ট পেতে হবে, ভাবতে পারিনি।'

স্ত্রীর মাথায় একটি হাত রেখে গাঢ় আবেগে অর্জুন বলে, 'কষ্ট আর অপমান তো তোমারও কম হচ্ছে না কমলা।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমার জন্যে তোমার বাড়ির লোকেরা তোমাকে ত্যাগ করল। তা ছাড়া—'এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় কমলা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'তা ছাড়া কী ?'

'তোমার জাতের লোকেরাও তোমার ওপর ক্ষেপে আছে।'

কমলার 'স্বাগত'-এর বহর দেখে এবং মান্ধাতাদের মনোভাব আন্দাজ ক'রে ভেতরে ভেতরে ভীষণ দমে গেছে অর্জুন। তবু স্ত্রীকে ভরসা দেবার জন্যই হয়তো বলে, 'শুনেছি। এ রকম শাদি তো আমাদের টাউনে আগে কখনও হয়নি, তাই 'থোড়া কুছ'ঝঞ্ঝাট হচ্ছে। দু-চার দিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্বামীর এতটা আশ্বাসেও কমলার সংশয় আর উৎকণ্ঠা এতটুকু কমাতে পারে না। সে বলে, 'কিছুই ঠিক হবে না। আমার একটা কথা শুনবে ?'

'কী ?'

'আমাকে আমাদের বাড়ি দিয়ে এসো। আমার জন্যেই এত সব সমস্যা।'

অর্জুন চমকে ওঠে। অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে যেতে থাকে। বিষণ্ণ গলায় সে বলে, 'চার ঘণ্টাও পার হয়নি আমাদের বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যেই তুমি এমন একটা কথা বলতে পারলে !'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকায় কমলা। অর্জুনের কষ্টটা কোনো অভ্রান্ত নিয়মে তার মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে সে, পারে না, ঠোঁট দুটি শুধু থরথর করতে থাকে।

অর্জুন আবার বলে, 'দু'জনে মিলে এই যে এত দিন লড়াই করলাম, সে কি শাদির রাতেই তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছে রেখে আসার জন্যে ?'

অর্জুন আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রাধার গলা শোনা যায়, 'ভাইয়া—'

প্রথমটা হকচাকিয়ে যায় অর্জুন। তারপর দ্রুত দরজার কাছে চলে আসে। বাইরে রাধা দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স আঠার উনিশ। অঢেল স্বাস্থ্য, দেখতে মোটামুটি ভালই। রাধার হাতে বড় কাঠের পরাতে অনেকগুলো বাটিতে প্রচুর খাবার-দাবার।

রাধা বলে, 'বাবুজি এগুলো পাঠিয়ে দিলে। ঘরে চাল ডাল সবজি ঘি আটা—সব রয়েছে। দেখেছ তো?'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় অর্জুন, 'হ্যাঁ।'

'বাবুজি বলে দিয়েছে আজ আর তোমাদের রসুই করতে হবে না। কাল থেকে ক'রো।'

রাধা এবার যা বলে তা এইরকম। এই ঘরটার ডান পাশে যে ছোট অ্যাসবেস্টসের চালাটা রয়েছে সেখানে অর্জুনদের নাহানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা লোককে দিয়ে ওখানে জল তুলিয়ে রেখেছে রামঅবতার। কাল সকালে আবার জল দিয়ে যাবে সে। ওটার পাশের চালাটায় এককালে খাটা পায়খানা ছিল। সেটাকে সাফসুফ করিয়ে রাখা হয়েছে। ওটা অর্জুনরা ব্যবহার করবে। অর্থাৎ পুরোপুরি আলাদাভাবেই তাদের থাকতে হবে। তাদের জন্য রান্নার ভিন্ন ব্যবস্থা। স্নানের ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, কোথাও তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। এমন কি কুয়োটা ছোঁয়ার অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই।

এই সব খবর দেবার পর রাধা বলে, 'এই খানা রেখে গেলাম, খেয়ে নিও—' বলতে বলতে কাঠের পরাতটা অর্জুনের পায়ের কছে নামিয়ে রাখে।

রাধাকে চলে যেতে দেখে অর্জুন বলে, 'একটু দাঁড়া—'

রাধা থেমে যায়, 'কী বলছ?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অর্জুন। একসময় দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'মা কেমন আছে রে?' দিন সাতেক আগে মান্ধাতাদের ভয়ে

মাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে সেই যে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে মায়ের আর কোনো খবর পায়নি।

রাধার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'বহুত বুরা। সাত রোজ সমানে কাঁদছে।' বলতে বলতে তার চোখ জ্বলতে থাকে, গলার স্বর তীব্র শোনায়, 'সব কুছ তুমহারে লিয়ে।'

কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না অর্জুন। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, কিছুক্ষণ আগে বাড়িতে ঢোকার সময় মায়ের একটানা কান্নার আওয়াজ কানে ভেসে এসেছিল। এখন কান্নাটা থেমে গেছে।

রাধা আবার বলে, 'তোমাদের জন্যে মায়ের মৌত (মৃত্যু) হবে।'

হঠাৎ প্রবল অনুশোচনায় অর্জুনের বুকের ভেতরটা ভরে যায়। মনে হয়, এ বিয়েটা না করলেই হ'তো। গাঙ্গোতাদের মেয়েকে ঘরে আনলে এত দিকে এত রকম জটিলতা এবং সমস্যা দেখা দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল! পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দেয় অর্জুন। বিয়ের পর পুরো একটা দিনও কাটেনি। তার মধ্যে এসব কী ভাবছে? সে রাধাকে বলে, 'মা কি আমাদের ক্ষমা করবে না?'

অর্জুনের গলায় এমন তীব্র ব্যাকুলতা রয়েছে যাতে কিছুটা সহানুভূতিই বোধ করে রাধা। নরম গলায় এবার বলে, 'কি জানি।'

একটু চুপচাপ। তারপর অর্জুন বলে, 'বাবুজি মাসি ফুফী আর চাচাদের খবর দিয়েছে?'

'না। তবে—'

'কী?'

'ওরা খবর পেয়ে গেছে। সবাই জানিয়ে দিয়েছে—'

'কী জানিয়েছে?' অর্জুনের চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে।

'আজ থাক, পরে শুনো।'

'বল্ না—'

'আমার মুখে না-ই বা শুনলে।'

'বুরা কিছু ?'

রাধা উত্তর দেয় না।

উঠোনের ওপারের দালান থেকে রামঅবতারের ভারী গলা ভেসে আসে, 'কিরে রাধা, এত দেরি হচ্ছে কেন ?'

রাধা হকচকিয়ে যায়, 'যাই বাবুজি—'

সে আবার যখন ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, অর্জুন ফের তাকে থামিয়ে দেয়, 'রাধা—'

'কী বলছ ?'

নিচু গলায় অর্জুন বলে, 'এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী কম্‌লার 'পাট্টি পরায়' ক'রে দিয়েছেন। ওর চুলের ভেতর দুশো টাকা লুকানো রয়েছে। ওটা তো তোর পাওনা। নিবি না ?'

রাধার চোখ চকচক করতে থাকে। কম্‌লা যদি তাদের স্বজাতের ঘর থেকে আসত, এতক্ষণে তার খোঁপা খুলে কখন উপহারের টাকাগুলো বের ক'রে নিত রাধা। 'চল, নিচ্ছি—' বলতে গিয়েও থেমে যায়। টের পায়, অদৃশ্য কঠিন একটি হাত তার গলা টিপে ধরেছে। কোনোরকমে বলে, 'নেহ্‌ঁী ভাইয়া—'

'কেন রে ?'

'সবাই গুস্‌সা হবে। তা ছাড়া—'

'কী ?'

'অচ্ছুতের লেড়কীকে ছুঁলে এই রাত্তিরে আবার নাহানা করতে হবে।'

করুণ মুখে অর্জুন বলে, 'নাহানার তখলিফ ক'রে দরকার নেই। তুই যা—'

রাধা আর দাঁড়ায় না, উঠোন পেরিয়ে ওধারে চলে যায়। আস্তে আস্তে ক্লান্তভাবে ঘরের ভেতর চলে আসে অর্জুন। তক্তাপোষে চুপচাপ পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে কম্‌লা। হাত দুটি কোলের ওপর এলিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর খেয়ে-দেয়ে তারা শুয়ে পড়ে। এত অপমান বিরুদ্ধাচরণ এবং শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়ে যৌবনের উষ্ণ আবেগ তাদের দু'জনকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে। কম্‌লাকে বুকের ভেতর টেনে এনে তার ঠোঁট সবে কম্‌লার রক্তাভ উন্মুখ ঠোঁট দু'টিকে ছুঁতে যাবে, আর জগতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পুরুষটির প্রগাঢ় একটি স্পর্শের জন্য কম্‌লা যখন আধবোজা ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়ে ব্যগ্র হ'য়ে আছে, সেই সময় হঠাৎ ওধারের দালান থেকে মায়ের একটানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। নমকপুরার রাত এখন একেবারে নিঝুম হ'য়ে গেছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। এমন কি বাড়ির পেছন দিকের গাছপালার মাথায় পাখিদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও থেমে গেছে।

রাতের নৈঃশব্দ্য ছিঁড়ে খুঁড়ে মায়ের বিলাপ চলতেই থাকে।

এদিকে দু'টি মুখ পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে যায়। অর্জুনের যে হাত নিবিড়ভাবে কম্‌লাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে রেখেছিল, নিজের অজান্তে কখন যেন তা শিথিল হয়ে যায়।

স্বামীর মুখের দিকে বিষণ্ণ করুণ মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কম্‌লা। কখন যে তার চোখ জলে ভরে যায়, নিজেই জানে না।

বিয়ের প্রথম রাতটা এইভাবেই কেটে যায় তাদের।

॥ পাঁচ ॥

অন্য সব দিনের মতো আজও বেশ ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় কম্‌লার। এটা তার অনেক কালের অভ্যাস।

এধারে ওধারে তাকাতেই টিনের ফুটিফাটা চাল, ছোট চাপা জানালার বাইরে উঁচু উঁচু গাছপালা এবং বিছানায় তারই পাশে

ঘুমন্ত অর্জুনকে দেখতে পায় কমলা। প্রথমটা ভাবে, অলৌকিক কোনো স্বপ্নের ঘোরে সে এখানে এসে পড়েছে। পরক্ষণেই সব কিছু মনে পড়ে যায়।

একটু পর বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় কমলা। এখান থেকে বাড়ির ভেতর দিকের পুরোটা এবং পেছনের খানিকটা অংশ দেখা যায়।

এখনও রোদ ওঠেনি। চারিদিকে ঝাপসা অন্ধকার। ফাল্গুন শেষ হয়ে এল। তবু আজকাল রাতের দিকে মিহি সিল্কের মতো ফিনফিনে কুয়াশা পড়তে শুরু করে। আকাশের গায়ে এবং এ বাড়ির পেছন দিকের ঝুপসি গাছগাছালির মাথায় এই মুহূর্তে হিম জড়িয়ে আছে।

এ বাড়ির কেউ এখনও ওঠেনি। খুব সম্ভব গোটা নমকপুরা টাউনটাই ঘুমের আরকে ডুবে আছে। শুধু কমলার মতো পাখিদেরও ভোরে ঘুম ভাঙার অভ্যাস। শুধু তারাই পেছন দিকের গাছপালার মাথায় চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। এ ছাড়া সমস্ত চরাচর জুড়ে কোথাও আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

একসময় পূব আকাশে একটু একটু ক'রে আলো ফুটতে থাকে। দূরের 'পাক্কী' থেকে টাঙ্গা আর বয়েল গাড়ির চলাচলের আওয়াজ আসছে। লোকজনের গলাও পাওয়া যায়।

আচমকা উঠোনের ওধারের পাকা দালানে ক্যাঁচ করে দরজা খোলার শব্দ হয়। চমকে সেদিকে মুখ ফেরাতেই কমলা দেখতে পায়, রামঅবতার একটি মাঝবয়সী মহিলাকে ধরে ধরে একটা ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় নিয়ে আসছে। দেখা মাত্র বোঝা যায়, মহিলাটি ভীষণ অসুস্থ, অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই তাঁর। রুক্ষ খোলা চুল মুখের অর্ধেকটা ঢেকে লুটিয়ে আছে, চোখের নিচে গাঢ় কালির ছোপ। মনে হয়, এ মানুষটি বহুদিন ঘুমোয়নি।

আগে না দেখলেও কমলা বুঝতে পারে, মহিলাটি অর্জুনের

মা এবং আইনত তার শাশুড়ি। সে আর সোজাসুজি জানালার সামনে থাকে না, দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায় যাতে ওরা তাকে দেখতে না পায়, অথচ সে তাদের দেখতে পাবে।

এদিকে রামঅবতারেরা বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তারপর পুব দিকে তাকিয়ে সূর্য প্রণাম করে। প্রণাম হয়ে গেলে আবার ধরে ধরে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।

কমলাও আর দাঁড়িয়ে থাকে না। ভোরবেলায় স্নান করা তার বহুকালের অভ্যাস। পাশের নাহানা ঘরটার দিকে যেতে যেতে চোখে পড়ে, কাল রাতের এঁটো বাসনগুলো এক কোণে পড়ে আছে। যে বর্তনে অচ্ছুতের উচ্ছিষ্ট লেগে আছে, এ বাড়ির জল-চল কাজের লোকেরা তা আদৌ ছোঁবে কিনা সে সম্পর্কে একেবারেই নিশ্চিত নয় কমলা। থালা-ঘটি-বাটি তুলে নিয়ে সে নাহানা ঘরে চলে যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে বাসনকোসন মেজে, বাসি শাড়িটাড়ি কেচে এবং স্নান সেরে কমলা যখন ফিরে আসে, অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানায় বসে বসে কিছু ভাবছিল সে। স্ত্রীকে দেখে সামান্য হেসে সে বলে, 'এর মধ্যে নাহানা শেষ!'

'হ্যাঁ।' বাসনগুলো একধারে নামিয়ে রাখতে রাখতে কমলা বলে।

'এ কি, বর্তন মাজলে যে!'

কমলা শান্ত ভঙ্গিতে বলে, 'আমি না মাজলে কে মাজবে? অন্য কেউ তো এঁটো বর্তন ছুঁতো না।'

কমলার কথায় এমন একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যাতে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে থাকে অর্জুন।

কমলা আবার বলে, 'তুমি মুখ ধুয়ে এসো। আমি চা করি। চায়ের সঙ্গে কী খাবার করব?'

'তোমার যা ইচ্ছে।' বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে নাহানা ঘরের দিকে চলে যায় অর্জুন।

বিছানা গুছিয়ে, ভেজা চুলে বার কয়েক চিরুনি চালিয়ে আলগা একটা খোঁপা ক'রে নেয় কমলা। তারপর যখন সে স্টোভ ধরাতে যাবে সেই সময় দরজার বাইরে হঠাৎ রাধার গলা শোনা যায়।

'ভাইয়া—'

কমলা হকচকিয়ে যায়। অর্জুন নাহানা ঘরে। এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত, ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়েই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। একটা স্টিলের থালায় দু কাপ চা আর প্লেটে গরম পুরী তরকারি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাধা।

স্থির পলকহীন চোখে কমলাকে দেখতে থাকে রাধা। কাল রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টিমটিমে আলোয় উঠোন দিয়ে রামঅবতারের পেছনে পেছনে এই টিনের চালায় তাকে আসতে দেখেছিল। কমলার মুখ তখন ছিল মাটির দিকে নামানো। আলোর তেজ তখন এতই কম যে ভাল ক'রে খুঁটিয়ে তাকে দেখা যায়নি।

কমলা যে এত সুন্দর, এত ঝকঝকে, আগে ভাবতেই পারেনি রাধা। সকালে স্নান করার জন্য তাকে টাটকা ফুলের মতো দেখাচ্ছে। এমন রূপ বামহন কায়াথদের ঘরেও কদাচিৎ চোখে পড়ে। নিজের অজান্তেই তার দু চোখে মুগ্ধতা ফুটে ওঠে। অচ্ছুত হওয়ার কারণে কমলা সম্পর্কে তার মনে যে প্রচন্ড ঘৃণা এবং বিদ্বেষ রয়েছে তার তীব্রতা যেন কমে যেতে থাকে।

স্নিগ্ধ হেসে কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবে কমলা বলে, 'আও বহীন—'

কমলার কণ্ঠস্বর খুবই সুরেলা এবং মিষ্টি। তা ছাড়া রাধা শুনেছে, সে খুবই 'লিখিপড়ী লেড়কী'। কমলার সম্বন্ধে খানিকটা সম্ভ্রমই বোধ করতে থাকে সে। বলে, 'ভাইয়া কোথায়?'

'নাহানা ঘরে—'

'এই তোমাদের সবেরকা ভোজন' (সকালের খাবার) আর চায়পানি রইল। খেয়ে নিও—' বলতে বলতে কাল রাতের খাবার-

সন্ধে কাঠের বড় পরাতটা যেখানে নামিয়ে রেখেছিল, ঠিক সেইখানেই স্টিলের থালাটা রাখে রাধা। অর্থাৎ আজও সে ভেতরে আসবে না।

কালকের মতো আজ আর ততটা বিষাদ বোধ করে না কম্‌লা। রাধারা কোনোদিনই তার ঘরে আসবে না এবং এটাই যখন তাকে মেনে নিতে হবে তখন আর এ নিয়ে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? কম্‌লা স্টিলের থালাটা তুলে নিতে নিতে বলে, 'কাল তোমার ভাইয়াকে বলে গিয়েছিলে, আজ থেকে আমাদের রসুই ক'রে নিতে হবে। আমি তো স্টোভ ধরিয়ে চা বসাতে যাচ্ছিলাম। তুমি আবার—'

রাধা বলে, 'বাবুজি বলল, তুমি নতুন এসেছ। পুরা জীওন খাটুনি তো আছেই। একটা দিন জিরিয়ে নাও। আজও আমাদের রসুইঘর থেকে 'ভোজনে'র ব্যওস্হা হবে। কাল থেকে তুমি রসুই ক'রো।'

তার জন্য রামঅবতারের মনে তা হ'লে যত সামান্যই হোক, একটু সহানুভূতি অন্তত আছে। হয়তো আত্মীয়স্বজন এবং স্বজাতের মানুষজনের ভয়ে সেটা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছে না। তবু এটুকুতেই খুশিতে এবং কৃতজ্ঞতায় কম্‌লার বুকের ভেতরটা আপ্লুত হয়ে যায়। ইচ্ছা করে, ছুটে গিয়ে রামঅবতারকে একটা প্রণাম করে। ইচ্ছা করে, মা-জি কেমন আছে সে খবরটা একবার নেয়। পরক্ষণেই তার খেয়াল হয়, কোনোটাই সম্ভব নয়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে আস্তে আস্তে ঝুঁকে স্টিলের থালাটা তুলে নিয়ে কম্‌লা বলে, 'ভরোসা দিলে একটা কথা বলি—'

প্রায় সমবয়সী কম্‌লাকে দেখে, তার সঙ্গে কথা ব'লে আগেকার বিরূপতা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল রাধার। সে সহজভাবেই বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল না—'

'পট্টিপরায় ক'রে এসেছিলাম, খোঁপার ভেতর তোমার জন্যে টাকা ছিল। নেবে না বহীন?'

এই কথাটা অর্জুনও কাল বলেছিল। রাধা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে একবার উঠোনের ওধারে তাকায়। রামঅবতার বিনোদ বা ভরতকে আপাতত ওখানে দেখা যায় না। সে ফের কমলার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'নিতে তো চাই। লেকেন মা আর বাবুজি জানতে পারলে বহুত মুসিবত হয়ে যাবে।' একটু থেমে কী ভেবে বলে, 'দেখি, পরে কী করা যায়—'

কমলা বুঝতে পারে, পট্টি পরায়ের টাকাটা নিশ্চয়ই কোনো একসময় নিয়ে যাবে রাধা। বলে, 'ওটা না নিলে আমার বহুত দুখ হবে বহীন—'

কমলার চোখের দিকে তাকিয়ে রাধা জিজ্ঞেস করে, 'এক বাত পুছেঙ্গি ?'

'হ্যাঁ, জরুর।'

'তুমি সচমুচ অচ্ছুতের ঘর থেকে এসেছ ?'

'কেন, সন্দেহ আছে ?' কমলা হাসে।

'তোমার রাহান সাহান, হালচাল দেখে একেবারেই মনে হয় না।' রাধা ব'লে যায়।

কমলা হালকা গলায়, ঠোঁটের কোণে মজাদার একটা ভঙ্গি ক'রে বলে, 'কী মনে হয় আমাকে ?'

'খানদানী বড়ে ঘরকা লেড়কী।'

'যাক, একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল।'

'সার্টিফিকেট মতলব ?'

'পরে বুঝিয়ে দেব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাধা বলল, 'তোমার সম্বন্ধে আমি একটা কথা শুনেছি।'

কমলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

রাধা বলতে থাকে, 'তুমি বহোত 'লিখিপড়ী লেড়কী'। আমাকে থোড়া কুছ আংরেজি শিখিয়ে দেবে ?'

কমলা কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। সার্টিফিকেটের

অর্থ যখন রাধা ধরতে পারেনি তখনই বোঝা উচিত ছিল, বিশেষ লেখা-পড়া জানে না। কমলা একসময় জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী পড়ছ?'

'কিছুই না।'

'ম্যাট্রিকটা জরুর পাশ করেছ?'

'নেহ্‌ী -' বিষণ্ণভাবে তাকায় রাধা।

'সে কী!'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে রাধা।

যত শুনছে ততই হাঁ হয়ে যাচ্ছে কমলা। তার ধারণা ছিল, উচ্চবর্ণের বামহন কায়াথদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বি. এ., এম. এ পাশ ক'রে পৃথিবীর সব কিছু দখল ক'রে রেখেছে, এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। কিন্তু রাধা যা বলছে তাতে তার এতকালের ধ্যান-ধারণা মারাত্মক ধাক্কা খায়।

'সবেরেকা ভোজন' অর্থাৎ সকালের খাওয়া চুকিয়ে অর্জুন টিনের চালাতেই বসে থাকে। বাইরে গেলে টৌলির লোকেরা তাকে টিটকিরি দিয়ে, বিদ্রূপ ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। তাছাড়া ঘৃণা অসম্মান—এসব তো আছেই। উঠোন পেরিয়ে ওধারের পাকা দালানে যাবারও উপায় নেই। অচ্ছুতের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে মা এবং বাবুজির চোখে সেও এখন অস্পৃশ্য। অদৃশ্য এক বিভাজিকা রেখা টানা রয়েছে এ বাড়িতে। সেটা পেরিয়ে কোনোদিন ওধারে সে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কমলা অবশ্য চুপচাপ বসে নেই। চায়ের কাপ এবং পুরী হালুয়ার প্লেটগুলো ধুয়ে একধারে গুছিয়ে রাখতে থাকে সে। এরই মধ্যে হঠাৎ লালধারী সিংয়ের বাজখাঁই গলা শোনা যায়, 'ক'হা হ্যায় রামঅওতারজি—'

অর্জুন এবং কমলা চমকে ওঠে। পরক্ষণেই রামঅবতারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আইয়ে আইয়ে—'

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায়, প্রচুর খাতিরদারি ক'রে রামঅবতার সদরের কাছ থেকে লালধারী সিংকে ওধারের পাকা দালানের বারান্দায় এনে বসালো। একটু দূরে তটস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ভরত রাধা আর বিনোদ।

লালধারীর আসার খবর পেয়ে মান্ধাতা ধনিকরাম এবং পুরানা মহল্লার আরো অনেকে এ বাড়ির উঠোনে এসে ভিড় জমায়।

মান্ধাতার এমনই ব্যক্তিত্ব যে সে যেখানে হাজির থাকবে সেখানে আর কারুর মুখ খোলার বিশেষ সুযোগ থাকে না। সমস্ত পরিবেশটা সে মুহূর্তে দখল ক'রে নেয়।

মান্ধাতা বলে, 'কী খবর অফিসার সাহেব? কাল অর্জুনদের পৌঁছে দিয়ে আজ আবার এলেন?'

লালধারী বলে, 'ইনভেস্টিগেসনমে আয়া। এস. ডি. ও সাহেব পাঠিয়ে দিলেন।' বলে রামঅবতারের দিকে তাকায় সে, 'আপনার লেড়কা কঁহা? ওকে এখানে আসতে বলুন।'

ভীরু গলায় রামঅবতার বলে, 'ওকে কী দরকার? গড়বড় কুছ হুয়া?'

পকেট থেকে তামাক এবং চুন বের ক'রে হাতের তেলোয় ডলে ডলে খৈনি বানাতে বানাতে লালধারী বলে, 'ঘাবড়াইয়ে মাত। ইয়ে রুটিন ইনভেস্টিগেসন! দো-চার বাত পুছকে চলা যায়েগা। অর্জুনকো বুলাইয়ে—'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ লালধারীর দিকে তাকিয়ে থাকে রামঅবতার। তারপর আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে ডাকতে থাকে, 'অর্জুন—অর্জুন—'

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই অর্জুন লক্ষ করেছে। ডাকের জন্য মনে মনে সে তৈরি হয়েই ছিল। টিনের চালাটা থেকে বেরিয়ে বারান্দার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় অর্জুন। টের পায়, মান্ধাতা এবং রামঅবতার থেকে শুরু ক'রে সবাই তীক্ষ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

খৈনি বানানো হয়ে গিয়েছিল। নিচের ঠোঁট এবং দাঁতের পাটির ফাঁকে খানিকটা পুরে লালধারী আরামে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে। তারপর পিচিক করে খয়েরি রঙের থুতু উঠোনের একধারে ফেলে বলে, 'এস. ডি. ও সাহেব জানতে চেয়েছেন, সব কুছ ঠিক হ্যায় তো?'

অর্জুন বুঝতে পারে এতটুকু গোলমেলে উত্তর দিলে মান্ধাতারা তাকে এবং কমলাকে পরে একেবারে শেষ ক'রে ফেলবে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে ওরা নিঃশব্দে কোনো দানবীয় শক্তিতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। স্নায়ুর ওপর তাদের অদৃশ্য চাপ সরিয়ে স্বাধীনভাবে তার কিছু বলার ক্ষমতা নেই।

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

'সচমুচ?'

'হ্যাঁ।'

আবার কিছু বলতে গিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে লালধারী। বলে, 'এ কি, আপনি নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বারান্দায় আসুন।' মান্ধাতাদের দিকে ফিরে তাদেরও বারান্দায় উঠতে বলে।

'আমরা এখানেই থাকি।' বলে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে মান্ধাতারা।

অর্জুনও ওপরে ওঠে না। অদৃশ্য বিভাজিকা রেখাটা পেরিয়ে যাবার সাহস তার নেই। সে বলে, 'কী জানতে চান, বলুন না—'

লালধারী হয়তো বুঝতে পারে, অর্জুন বারান্দায় উঠবে না। এই নিয়ে সে আর জোরজার করে না। একটু ভেবে বলে, 'কাল আপনাদের 'স্বাগত্'-এর যে নমুনা দেখে গেছি, ফিরে গিয়ে সে কথা এস. ডি ও সাহেবকে জানিয়েছি। উনি বহুৎ চিন্তায় আছেন। কাল রাতেই আসতে চেয়েছিলেন। মেমসাহেব আর আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আসতে দিইনি। বলেছি, আজ সবেরে এসে আমি আগে সব খবর নিয়ে যাই। তারপর যদি মনে হয় আসার জরুরত আছে—আসবেন। কী, ঠিক বলিনি?'

অর্জুন উত্তর দেয় না।

লালধারী এবার বলে, 'কাল আমি চলে যাবার পর কোনো গোলমাল হয়নি তো ?'

অর্জুন বলে, 'না, গোলমাল হয়নি।'

মান্ধাতাদের দেখিয়ে লালধারী হাসতে হাসতে চতুর ডিপ্লোম্যাটদের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এরা কোনো ঝামেলা পাকায়নি তো ?'

চোখের কোণ দিয়ে এক পলক মান্ধাতাকে দেখে নেয় অর্জুন। মান্ধাতার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে বলে, 'নেহী নেহী—'

'ঠিক হ্যায়। অব ম্যাঁয় চলতা—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় লালধারী। 'এস. ডি. ও সাহেব ব'লে দিয়েছেন, যদি কিছু ঝঞ্ঝাট হয় তাঁকে খবর দিতে।'

অর্জুন চুপ ক'রে থাকে।

লালধারী কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে নিচে নেমে এসেছিল। সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, 'এস. ডি. ও সাহেবের ইচ্ছা, সময় ক'রে আপনি তাঁর সঙ্গে একবার যেন দেখা করেন।'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় অর্জুন, মুখে অবশ্য কিছু বলে না।

লালধারী বেরিয়ে যাবার পর গোটা বাড়িটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর মান্ধাতা তীব্র চাপা গলায় বলে, 'শালে ভূচচরকা ছৌয়া, বামহুনের জাত মেরে এখানে কী ক'রে টিকতে পারে, আমি একবার দেখব।'

মান্ধাতা এবার অর্জুনের দিকে ফিরে বলে, 'তোর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

ভীরু গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী ?'

মান্ধাতা কিছু বলতে গিয়ে চারপাশের ভিড়টার দিকে তাকায়, 'অ্যাই তোমরা সব এখন যাও—'

মান্ধাতার কথা অমান্য করার সাহস বা ক্ষমতা নমকপুরার বাসিন্দাদের কারো প্রায় নেই বললেও হয়। সবাই চুপচাপ চলে যায়।

বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেলে মান্ধাতা বলে, 'চল, ওপরে গিয়ে বসি।' বলে বারান্দা দেখিয়ে দেয়।

অর্জুন দ্বিধান্বিতের মতো বলে, 'আমি—আমি—'

তার মনোভাব আন্দাজ করে মান্ধাতা বলে, 'তুই এখনও রামহনের ছোঁয়াই আছিস। আয় আমার সঙ্গে—'

প্রবল উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি নিয়ে মান্ধাতার পেছন পেছন বারান্দায় এসে বসে অর্জুন। রামঅবতার আগে থেকেই ওখানে বসে ছিল।

অর্জুন ভয়ে ভয়ে বলে, 'কী বলবেন, বলুন—'

'তোর বাপু বলছিল, সরকার থেকে তোকে নৌকরি দিয়েছে—' বলতে বলতে থেমে যায় মান্ধাতা।

চাকরি সম্পর্কে লোকটা কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে সতর্ক ভঙ্গিতে অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

'কবে জয়েন করতে হবে?'

'সাত দিন পর।'

'তলব (মাইনে) কত দেবে?'

একটু চিন্তা করে অর্জুন বলে, 'লগভগ বার শ' রুপাইয়া—'

মান্ধাতার মুখটা চাপা ঈর্ষায় কালো হয়ে যায়। অচ্ছুতদের মেয়েকে বিয়ে করার যৌতুক হিসেবে এত টাকার একটা চাকরি পাওয়া যাবে, সে ভাবতে পারেনি। পাশাপাশি নিজের তিন ছেলের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের এক এক করে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ঢুকিয়েছে। কিন্তু কারো মাইনেই চার শ' টাকার বেশি নয়। মান্ধাতা একসময় বলে, 'নৌকরিটা বেশ ভাল। তবে—'

অর্জুনকে উদ্বিগ্ন দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'তবে কী?'

'নৌকরির চেয়ে জাত-পাতের সওয়াল অনেক বড়।'

মান্ধাতা কী ইঙ্গিত দিচ্ছে তা আঁচ ক'রে অর্জুনের বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়। উত্তর না দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে।

মান্ধাতা আবার বলে, 'এ নৌকরি তুই করিস না।'

রুদ্ধ গলায় অর্জুন বলে, ‘কেন ?’

‘নৌকরি-উকরি দিয়ে সরকার বামহনের জাত আর ধরম নষ্ট করতে চায়। এটা আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।’

‘লেকেন—’

‘কী ?’

‘নৌকরিটা না করলে এস. ডি. ও সাহেব, ডি. এম, মিনিস্টার—সবাই গুস্‌সা হবে। এটা ছাড়লে এমন নৌকরি সারা জীওনে আর পাব না।’

মান্ধাতা বুঝতে পারে, ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষার মতো মহৎ ব্যাপার এই মুহূর্তে অর্জুনের মাথায় ঢুকবে না। চরম প্রলোভনই একদিন ব্রাহ্মণত্বের সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। মান্ধাতা তা হ'তে দিতে পারে না। মনে মনে একটা চতুর চাল ঠিক করে রেখেছে সে। চাকরির ব্যাপারে অর্জুনের মোহ কাটিয়ে দিতে হবে। সেটা করতে পারলেই গাঙ্গোতাদের মেয়েটাকে ভাগানো অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু বেশি চাপ দিলেই ছোকরা বিগড়ে যেতে পারে।

প্রথমত, এত টাকার মাইনের একটা চাকরি ব্রাহ্মণত্বের মহিমা অটুট রাখার জন্য এক কথায় ছেড়ে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। তার ওপর গাঙ্গোতাদের ঐ মেয়েটা। মুখে না বললেও মান্ধাতা মনে মনে হাজার বার স্বীকার করে, এমন সুন্দরী নমকপুরায় দু-একটির বেশি নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে এমন মেয়ে জন্মালে সে ব'লেই ফেলত—চাঁদকা টুকরা। এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য যে সব রকম ঝুঁকি নিয়েছে, বলামাত্র সে কি হুট ক'রে তাকে ত্যাগ করবে ? তাছাড়া অর্জুনের পেছনে রয়েছেন স্বয়ং এস. ডি. ও অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট। এ বিয়েটার ব্যাপারে সুদূর পাটনা পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেছে। মান্ধাতা অতিরিক্ত জবরদস্তি করলে অর্জুন নিশ্চয়ই এস. ডি. ও'র কাছে ছুটে যাবে। তার মানে সরকারের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ। নিজের দাপট এবং ক্ষমতা সম্পর্কে মান্ধাতা

যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু খোদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামার আগে অনেক দিক ভেবে দেখা দরকার। তাকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কভাবে এগুতে হবে। ব্রাহ্মণেরা মর্যাদা, জাতপাতের সওয়াল —এত সবের মধ্যেও তার মাথায় কাঁটার মতো যা বিঁধে আছে তা হলো অর্জুনের বার শ' টাকার মাইনের চাকরি। এমন একটা মূল্যবান নৌকরি নতুন ক'রে তিনবার জন্ম নিলেও তার ছেলেরা যোগাড় করতে পারবে না।

মান্ধাতা বলে, 'ঠিক আছে, তুই এখন যা। পরে এ নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলব।'

॥ ছয় ॥

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে কমলা এক মুহূর্তের জন্য টিনের চালা থেকে বাইরে বেরোয়নি। ওখানেই তাকে নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। সে শুনেছে তার বাপ এবং মা'কে সঙ্গে ক'রে রেভারেণ্ড টিরকে তাকে দেখতে এসেছিলেন। রামঅবতার তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। মান্ধাতাদের ডাকিয়ে এনে সদরের ওপার থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে।

অর্জুন অবশ্য দিন দুই দুপুরের দিকে বেরিয়েছিল। একদিন সে গেছে এস. ডি. ও'র বাংলোয়, চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে। আরেক দিন চার্চে আর অচ্ছুতটুলিতে গিয়ে রেভারেণ্ড টিরকে এবং কমলার মা-বাবার কাছে রামঅবতারদের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে এসেছে। যাতায়াতের পথে পুরানা মহল্লার বামহন কায়াথরা তাকে প্রচুর টিটকিরি দিয়েছে, তার উদ্দেশে থুতু ছুঁড়েছে, যদিও তা তার গায়ে লাগেনি।

যে দু'দিন অর্জুন বেরিয়েছিল, চারিদিক ভাল ক'রে দেখে, পা টিপে টিপে, বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে কমলার কাছে এসেছে রাধা। 'পট্টি পরায়ে'র সেই টাকাটা তো নিয়েছেই, ইংরেজিটাও শিখতে শুরু করেছে। দু'জনের কথা হয়ে গেছে, অর্জুন চাকরিতে জয়েন করার পর যখন দুপুরে কেউ বাড়িতে থাকবে না, রাধা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে ইংরেজির তালিম নিয়ে যাবে।

এ ক'দিনে অর্জুনের মা ভোরে সূর্যপ্রণামের সময় একটি বার ছাড়া সারাদিনে আর ঘর থেকে বেরোয় নি। মাঝে মাঝে তার একটানা করুণ কান্নার শব্দ ছাড়া, তার যে কোনোরকম অস্তিত্ব আছে, বোঝা যায়নি।

লালধারী সিং বিয়ের পরের দিনটা ছাড়া আর আসেনি। অর্জুন চন্দ্রকান্তকে বার বার অনুরোধ করে এসেছে, বাড়িতে তার এবং কমলার খোঁজখবর নেবার জন্য যেন পুলিশ পাঠানো না হয়, তাতে জটিলতাই শুধু বাড়বে। তেমন কিছু বলার থাকলে সে নিজে গিয়ে চন্দ্রকান্তজিকে জানিয়ে আসবে।

এর মধ্যে পাটনা দ্বারভাঙ্গা মুঙ্গের এবং ভাগলপুর থেকে আত্মীয়স্বজনেরা কড়া কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে কমলাকে বাড়ির বার ক'রে দিতে হবে। সাহারসা এবং কাটিহার থেকে অর্জুনের দুই পিসি এবং চক্রধরপুর থেকে এক মেসো জানিয়ে দিয়ে গেছে, জাত নষ্ট করার কারণে অবতারদের সঙ্গে তারা আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। এমন কি যে চায়-পানি এবং মিঠাই দিয়ে তাদের অপ্যায়ন করার ব্যবস্থা হয়েছিল সেসব ছোঁয়নি পর্যন্ত। প্রচণ্ড ঘৃণায় এবং রাগে তারা মাটিতে থু থু করে থুতু ফেলে চলে গেছে। অপমানে ক্ষোভে রামঅবতার একেবারে গুম মেরে গেছে। তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর যে ঘটনাটি এই সাত দিনে ঘটেছে তা এইরকম। বিয়ের চার দিনের মাথায় পাটনার এক নামকরা দৈনিক

পত্রিকা থেকে একজন পত্রকার আর একজন ফোটোগ্রাফার এসে হাজির। তারা পাটনা সেক্রেটারিয়েটে অর্জুন এবং কমলার বিয়ের খবরটা শোনামাত্র লং ডিসট্যান্স রুটের বাস ধরে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম রামঅবতার তাদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে চায়নি। কিন্তু পত্রকার সুরেশ পাণ্ডে অতীব তুখোড় লোক, চোখেমুখে কথা বলে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, নানারকম কথার মারপ্যাঁচে তাকে নরম ক'রে ঢুকে পড়েছে।

এরকম একটা ঐতিহাসিক রেভোলিউসানারি বিয়ের জন্য প্রথমে অর্জুন এবং কমলাকে প্রচুর অভিনন্দন জানিয়েছে সুরেশ আর ফোটোগ্রাফার মনোহর সহায়। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুরেশ এ বিয়ের যাবতীয় হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড জেনে নিয়েছে এবং মনোহরকে দিয়ে দু'জনের অনেকগুলো রঙিন ছবিও তুলিয়েছে। তার ইচ্ছা ছিল, গোটা ফ্যামিলির মাঝখানে অর্জুন এবং কমলাকে বসিয়ে একটা গ্রুপ ফোটো তোলে। শুনে আঁতকে উঠেছে অর্জুন। ফোটো তোলার জন্য মা বাবুজি ভাইবোনদের ডাকতে গেলে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে সেটা জানাতেই দুঃখিতভাবে মাথা নেড়েছে সুরেশ। বলেছে, 'তাহলে থাক।' তার কাঁধে একটি হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বলেছে, 'নার্ভাস হবেন না। পৃথিবীর সব মানুষ আপনার বিরুদ্ধে যায়নি। আমাদের মতো অনেকেই আপনাদের সঙ্গে আছে।'

অর্জুন বলেছে, 'ধন্যবাদ। আপনাদের ভরসার কথা সারা জীওন আমার মনে থাকবে।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের ক'রে অর্জুনের হাতে দিতে দিতে সুরেশ এবার বলেছে, 'ভাইয়া, এতে আমার ঠিকানা রয়েছে। যদি কেউ কোনো ঝামেলা পাকায়, একটা চিঠি লিখে দেবেন কি টেলিগ্রাম করবেন। আমি চলে আসব।'

'আচ্ছা।'

এই ক'দিন তাদের দু'জনের সংসার ভাল ক'রে গুছিয়ে নিয়েছে কমলা। বিয়ের দিন রাতে এবং পরদিন সকালে রাধা খাবার-দাবার দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে রান্নাবান্না করছে কমলাই।

॥ সাত ॥

এক সপ্তাহ কেটে যাবার পর বেলা ন'টায় খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ে অর্জুন। তার ইচ্ছা ছিল, প্রথম দিন অফিসে যাবার আগে মা এবং বাবুজিকে প্রণাম করবে। রামঅবতার বারান্দায় বসেও ছিল। সে কাছে গিয়ে উঠোন থেকে যেই হাত বাড়িয়েছে, রামঅবতার এক ঝটকায় পা সরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলে, 'পাও মাত ছুঁনা—'

অর্জুন বারান্দায় একধারে মাথা ঠেকিয়ে বলে, 'আজ আমি আফিসে জয়েন করতে যাচ্ছি বাবুজি—'

রূঢ় গলায় রামঅবতার বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

অর্জুনের ইচ্ছা ছিল মাকেও প্রণাম ক'রে যায়। সেটা করতে গেলে তার ঘরে ঢুকতে হয়। কিন্তু মান্ধাতা তাকে বারান্দায় উঠতে দিলেও শোয়ার ঘরে ঢোকাটা অর্জুনের কাছে এখনও নিষিদ্ধ। মা'কে যে বাইরে আসতে বলবে, রামঅবতারের রুক্ষ মেজাজ দেখে তেমন সাহস হয় না।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে অর্জুন, তারপর আস্তে আস্তে উঠোন পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ অফিসটা নমকপুরা টাউনের ঠিক মাঝখানে। যে চওড়া রাস্তাটা এই শহরের শিরদাঁড়া হ'য়ে উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে, ঠিক তার ওপর।

মাঝারি মাপের দোতলা অফিস-বাড়িটায় অর্জুন যখন এসে

ঢোকে, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। ঠিক দশটায় অফিস। তার আসতে দেরি হয়ে গেছে।

এখনও লোকজন বেশি আসেনি। বেশির ভাগ চেয়ারই খালি। অফিসার-ইন-চার্জ, সেকসান অফিসার, দু'চারজন কেরানি, টাইপিস্ট এবং বেয়ারা এসে গেছে। আর জমি নিয়ে যারা ঝামেলায় পড়েছে তাদের অনেকেই অফিসের ভেতর এবং বাইরের রাস্তায় অপেক্ষা করছে।

একটা বেয়ারার কাছে জেনে নিয়ে দোতলায় অফিসার-ইন-চার্জ সুধাকর দুবের কামরায় এসে ঢোকে অর্জুন। রোগা উটের মতো চেহারা, পিঠটা বাঁকা, ফলে তাকে খানিকটা কুঁজো দেখায়। ভাঙাচোরা লম্বাটে মুখ, নাকের তলায় চৌকো গোঁফ, পরনে ঢোলা প্যাণ্ট-শার্ট, গলা থেকে বুকের ওপর লাল টকটকে টাই ঝুলছে।

সুধাকর দুবে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি সব কাগজপত্র দেখছিলেন। পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে বলেন, 'আপ ?'

হাতজোড় ক'রে ভয়ে ভয়ে অর্জুন বলে, 'নমস্তে স্যার। আমার নাম অর্জুন চতুর্বেদী। আজ আমার এখানে জয়েন করার কথা।'

সুধাকর প্রতি-নমস্কার জানান না। তাঁর ভুরু দু'টি সামান্য কুঁচকে যায়। বলেন, 'জানি, আমার কাছে ওপর থেকে আপনার ব্যাপারে ইনস্ট্রাকসান এসেছে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার কোথায় ?'

শশব্যস্তে একটা ব্রাউন রঙের খাম সুধাকরের দিকে বাড়িয়ে দেয় অর্জুন।

সুধাকর বলেন, 'খুলে দেখান।' অর্থাৎ তিনি খামটা ছোঁবেন না।

এবার দ্রুত খাম থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা বের ক'রে সুধাকরের সামনে ধরে অর্জুন। চোখ বুলোতে বুলোতে সুধাকর বলেন, 'মাথা খাটিয়ে ফন্দিটা ভালই বের করেছেন—'

অর্জুন চমকে ওঠে 'মতলব ?'

'কমপিটিটিভ পরীক্ষায় (পরীক্ষায়) বসতে হলো না,

এম. এল. এ কি এম. পি'দের বাড়ি ঘুরে ঘুরে পায়ের হাড্ডি ঢিলা করলেন না, স্রেফ এক অচ্ছুতিয়ার লেড়কীকে শাদি ক'রে নগদ নগদ পাঁচ হাজার রুপাইয়া দহেজ আর বার শ' রুপাইয়ার এক নৌকরি মিলে গেল ! কী খাতির ! পাটনা থেকে খুদ মিনিস্টার এসে আপনা হাতে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার তুলে দিলেন—' বলতে বলতে কী ভেবে থেমে যান সুধাকর।

সুধাকর যে তার এই চাকরিটা পাওয়ায় আদৌ সন্তুষ্ট হ'ননি তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। অথচ এই লোকটার কাছেই তাকে কাজ করতে হবে। ভবিষ্যতে সুধাকর তাকে কতটা বিপাকে ফেলবেন, কে জানে। সুধাকরের মনোভাব অফিস ছুটির পর চন্দ্রকান্তকে জানিয়ে দেবে কি ? এই সব যখন অর্জুন ভাবছে, সুধাকর বলেন, 'আপনি সেকসান অফিসার বিন্ধ্যাচলী মিশ্র'র কাছে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা নিয়ে যান। উনি আপনার কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবেন।'

আরেক বার 'নমস্তে' জানিয়ে সুধাকরের কামরা থেকে বেরিয়ে একে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে দক্ষিণ দিকে একটা বড় হল্-ঘরে চলে আসে অর্জুন।

এক প্রান্তে জানালার ধার ঘেঁষে একটা বড় টেবলের ওধারে বসে আছে থলথলে ভারী চেহারার একটি মানুষ, খাটো ঘাড়ের ওপর গোলাকার মুখ। কাঁচাপাকা চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। কপালে এবং কানের লতিতে চন্দনের ফোঁটা তার। নিখুঁত কামানো মুখে তৈলাক্ত মসৃণতা। মাথার পেছন দিকে এক গোছা মোটা টিকিতে ফুল বাঁধা। লোকটার পরনে ধুতি, ঢলঢলে হাতাওলা পাঞ্জাবি। ইনিই যে সেকসান অফিসার বিন্ধ্যাচলী মিশ্র, ব'লে দিতে হয় না।

বিন্ধ্যাচলীর দু'পাশ দিয়ে টেবল-চেয়ারের লাইন। সেগুলো দখল ক'রে দশ বারো জন বসে আছে। দেখলেই টের পাওয়া যায়, এরা সব ক্লার্ক এবং টাইপিস্ট।

হল্-ঘরে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বিন্ধ্যাচলীর টেবলের সামনে এসে দাঁড়ায় অর্জুন। 'নমস্তে' বলে নিজের নাম-টাম এবং এখানে আসর উদ্দেশ্য যখন বিস্তৃতভাবে জানাতে যাবে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় বিন্ধ্যাচলী, 'আমি সব জানি। আপনি অর্জুন চতুর্বেদী, আজ এই অফিসে জয়েন করতে এসেছেন। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার সঙ্গে এনেছেন নিশ্চয়ই।'

'জি। এই যে—'ব্রাউন রঙের সেই খামটা বের ক'রে টেবলে রাখে অর্জুন।

'অফিস খুলতে না খুলতেই মুসিবত—' বলে টেবলের ড্রয়ার থেকে একটা গঙ্গাজলের বোতল বের ক'রে কয়েক ফোঁটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটার ওপর ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেয় বিন্ধ্যাচলী। তারপর একজন বেয়ারাকে ডেকে সেটা ফাইলে রেখে দিতে ব'লে অর্জুনের দিকে ফেরে, 'বামহনের ছোঁয়া হয়ে নজরটা এত নিচে নামালে কেন?' গোড়ায় 'আপনি' দিয়ে শুরু করেছিল, এখন সরাসরি 'তুমি'তে নেমে আসে।

অর্জুন হকচকিয়ে যায়, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না—'

'বামহনের ঘরে লেড়কী ছিল না? কোয়ার মতো নালিয়ায় (নর্দমায়) মুখ ঢোকালে!' বিন্ধ্যাচলীর চোখ এবং কণ্ঠস্বর থেকে ঘৃণা চলকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

অর্জুন উত্তর দেয় না।

'ঠিক হ্যায়, গভর্নমেণ্ট যখন তোমাকে নৌকরি দিয়েই ফেলেছে তখন কী আর করা! সাবার সঙ্গে আগে আলাপ করিয়ে দিই—'

সেকসানের কর্তা হিসাবে এক এক ক'রে ক্লার্ক এবং টাইপিস্টদের সঙ্গে অর্জুনের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এদের পদবী শুনে টের পাওয়া যায় এই সেকসানে একটি হরিজনও নেই। এখানকার সবাই বামহন বা কায়াথ। পুরনো এমপ্লয়ীদের পরিচয় দেবার পর বিন্ধ্যাচলী অর্জুন সম্বন্ধে বলে, 'আর এ হলো

অর্জুন চতুর্বেদী। পবিত্র বামহন বংশের ছৌয়া হয়ে অচ্ছুতের দামাদ হয়েছে।'

অর্জুনের নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে বুঝতে পারে এই আবহাওয়ায় তার পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। এখানে সহকর্মীদের মধ্যে একজন সহৃদয় বন্ধুও সে খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। কিছু বলতে যাচ্ছিল অর্জুন, হঠাৎ ডান দিকের শেষ প্রান্তের একটা চেয়ার থেকে একজন যুবক, বিজয় দুবে উঠে দাঁড়ায়। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। নাক মুখ কাটা কাটা, দৃঢ় চোয়াল, চোখ দুটি উজ্জ্বল, পরনে ধুতি এবং ফুলসার্ট। সে বলে, 'মিশ্রজি, কে কাকে সাদি করবে সেটা তার পার্সোনাল ব্যাপার। এ নিয়ে অর্জুনজিকে কেন বিরক্ত করছেন? ইয়ে তংগ করনা আচ্ছা নেহ্‌ী। এটা সরকারী দপ্তর, এখানে জাতপাতের সওয়াল টেনে আনা ঠিক না।'

বিন্ধ্যাচলী স্থির চোখে বিজয়কে দেখতে দেখতে বলেন, 'তুমি তো আবার লিবারেল বামহন। হিন্দু ধরমের সমস্কার নিয়ে মাথা ঘামাও। লেকেন এক বাত—'

বিজয় বলে, 'কী?'

'ঘর বল, সমসার বল, কলেজ ইউনিভার্সিটি বল, পোলিটিকস্ বল, অ্যাসেম্বলি বল, পার্লামেণ্ট বল, আর এই সরকারী দপ্তরই বল—সোসাইটিকে বাদ দিয়ে কোনোটাই সম্ভব না। আর যেখানে সোসাইটি সেখানে জাতপাতের সওয়াল আসবেই। হিন্দু ধরমের বিনাশ আমরা হতে দিতে পারি না।'

'অচ্ছুতরাও কিন্তু হিন্দু—'

'জানি। লেকেন নিচা জাতের হিন্দু। ওরা যেখানে আছে সেখানে থাক, আমরা যেখানে আছি সেখানে থাকি। কোনো ঝামেলা নেই। লেকেন বামহনের জাত মেরে শাদিউদি চলবে না। তা হ'লে সোসাইটির সত্যনাশ হয়ে যাবে। এসব বরদাস্ত করা যায় না।'

তীব্র গলায় বিজয় বলে, 'সোসাইটির চিন্তা পরে করবেন। অর্জুনজি কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে? ওর বসার জায়গা ঠিক ক'রে দিন।'

'ঠিক হ্যায়—' আঙুল বাড়িয়ে ডান ধারের একেবারে শেষ চেয়ারটি দেখিয়ে বিন্ধ্যাচলী অর্জুনকে বলে, 'যাও, ওখানে গিয়ে বসো।' তারপর আবার বিজয়ের দিকে ফেরে, 'তুম তো সমাজকা পরিবর্তন চাহতা হো, আউর অর্জুন পরিবর্তন কর চুকা। দুই সমাজ বদল করনেবালাকে পাশাপাশি বসতে দিলাম।' বলতে বলতে পুরু ঠোঁট দুটো বিদ্রূপে বেঁকে যায় বিন্ধ্যাচলীর।

অর্জুন কাছে এলে বিজয় নিচু গলায় বলে, 'আমরা প্রায় সমান বয়সী। আপনি টাপনি করে বলতে পারব না। 'তুমি' বললে গুস্সা হবে?'

এই সাহসী হৃদয়বান যুবকটিকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া, বিশেষ ক'রে এরকম বিরুদ্ধ আবহাওয়ায়—খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। শশব্যস্তে অর্জুন বলে, 'নেহী নেহী, বিলকুল নেহী।'

'চিন্তা মাত করনা। আমি তোমার পাশে আছি। কাউকে তোমার চামড়ায় আঁচড় কাটতে দেব না। সরকারী কানুন ভেঙে যদি ওরা তোমার পেছনে লাগে, আমি অনেক দূর যাব।' বলে, একটু থেমে বিজয় ফের শুরু করে, 'এই সব আদমী দেশের সত্যনাশ ক'রে ছাড়বে।'

অফিস ছুটির পর অর্জুন যখন রাস্তায় বেরিয়ে আসে সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালে অলৌকিক ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও চারিদিকে প্রচুর রোদ, তবে তাতে ধার নেই। হলুদ রঙের নরম আলোয় ভরে আছে চরাচর। বরখা নদীর দিক থেকে উলটো-পালটা হাওয়া উঠে আসছে, নমকপুরা টাউনের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ছুটে যাচ্ছে দূরের ফাঁকা শস্যক্ষেত্রগুলোর দিকে।

বিজয়ও অর্জুনের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'কোন দিকে যাবে? বাড়ি?'

অর্জুন আগে ভাবেনি কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেলে, একবার চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দেখা করবে। আজ অফিসে জয়েন করার পর তার যা অভিজ্ঞতা হলো, তাতে রীতিমত ভয়ই হচ্ছে। বিজয়ের মতো একজনকে বন্ধু হিসেবে না পেলে কী হতো, চিন্তা করতে সাহস হয় না। এ সব কথা চন্দ্রকান্তকে জানিয়ে রাখা দরকার।

অর্জুন বলে, 'আমি এস. ডি ও'র বাংলোয় যাব।'

বিজয় বলে, 'ভালই হলো, আমিও ঐ দিকেই যাচ্ছি। অনেকটা রাস্তা একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো কথা হয়। অর্জুন বলে, 'আমার কথা তো সব শুনেছ। তোমার সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই জানা হয়নি।'

বিজয় জানায়, তাদের বাড়ি মণিহারিতে। বাবা মা ভাই বোন সবাই সেখানে থাকে। জমিজমা আছে প্রচুর। সে অবশ্য মণিহারিতে বেশিদিন থাকেনি। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর পাটনায় চলে গিয়েছিল। সেখানে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে বি. এ পাশ করেছে। তারপর ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়ে কয়েক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত মাস কয়েক হলো, নমকপুরায় এসেছে। এখানে শহরের পশ্চিম দিকে নতুন মহল্লায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। খায় হোটেলে।

অর্জুন বলে, 'শাদি করনি ?'

মাথাটা সামান্য কাত করে মজার গলায় বিজয় বলে, 'না। তোমার মতো এক রেভেলেউসান যেদিন ঘটাতে পারব সেদিন ঐ কাজটা করব।' বলে হাসে।

অর্জুনও হেসে ফেলে। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে সে বলে ওঠে, 'আচ্ছা বিজয়, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

বিজয় উৎসুক চোখে তাকায়। বলে, 'জরুর।'

'তখন বিন্ধ্যাচলীজি বলছিলেন, তুমি নাকি সোসাইটি বদলে দিতে চাও। ব্যাপারটা কী ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বিজয়। তারপর জানায়, সে একটি প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভ্য। নানারকম বৈষম্য, অনাচার, জাতপাতের সওয়াল এবং কুসংস্কার হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে—এ সব দূর ক'রে আমূল সংস্কার করতে না পারলে এ জাতের বিনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিজয়দের সমিতি আপাতত আর্যাবর্তের বিভিন্ন শহরে সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। যদিও এটা খুবই কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ তবু তাদের ইচ্ছা সারা ভারত জুড়েই হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে।

এস. ডি. ও'র বাংলোয় পেঁছতে পেঁছতে বেলা ফুরিয়ে আসে। সূর্যটাকে এখন পশ্চিম আকাশের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সূর্য ডুবে যাবার পর আবছামতো একটু আলো এখনও নমকপুরা শহরের বাড়িঘর, এধারের বরখা নদী এবং চারপাশের গাছপালার মাথায় জড়িয়ে আছে।

চন্দ্রকান্ত বাংলোর একতলায় কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অর্জুনকে দেখে তাদের দ্রুত বিদায় জানিয়ে বলেন, 'চল চল, ওপরে যাওয়া যাক। তোমার ভাবীজি আজ সকালে তোমার কথা খুব বলছিলেন। অবশ্য তোমার সঙ্গে আমারও জরুরি কাজ আছে। আজ না এলে লালধারী সিংকে পাঠাতে হতো।'

চন্দ্রকান্তর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে অর্জুন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছুটা উদ্বেগই বোধ করে। বলে, 'কেন, কিছু গোলমাল হয়েছে?'

'আগে ওপরে চল। সব বলছি।'

দোতলায় আসতেই চোখে পড়ে, ওধারের বড় লাউঞ্জে বসে কী একটা বই পড়ছেন সরযূ। পায়ের শব্দে মুখ তুলেই, বইটা নামিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন। অর্জুনকে দেখে খুশিতে তার মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, এসো এসো—'

বিয়ের আগে যে ঘরে কয়েকটা দিন অর্জুন কাটিয়ে গেছে সেখানে গিয়ে তিন জন বসেন। তারপর ভরতকে দিয়ে প্রচুর মিঠাই এবং চা আনানো হয়।

সরযূ বলেন, 'খাও। খেতে খেতে তোমার কথা বল।'

কমলাকে নিয়ে বাড়ি যাবার পর এ ক'দিনে যা যা ঘটেছে সব বলে যায় অর্জুন।

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'মোটামুটি এরকম ঘটবে, ভেবেছিলাম। লালধারীজিও এসে কিছু কিছু বলেছিল। অফিসে জয়েন করেছ?'

'হ্যাঁ, আজই করলাম।'

'ওখানকার রি-অ্যাকসন কী?'

অফিসে প্রথম দিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দেয় অর্জুন।

শুনতে শুনতে চন্দ্রকান্তের চোখেমুখে হতাশা ফুটে ওঠে। বলেন, 'টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি শেষ হয়ে এল। এখনও যদি বেশির ভাগ মানুষের অ্যাটিচুড এই হয়, আমরা এগুবো কী ক'রে?' একটু থেমে বলেন, 'অবশ্য সিলভার লাইনিং-এর মতো বিজয়ের মতো ছেলেও রয়েছে। ওকে সব সময় কাছে পাবে, এটুকুই যা ভরসা।'

অর্জুন চুপ ক'রে থাকে।

চন্দ্রকান্ত আবার বলেন, 'ছেলেটা খুবই আপরাইট। দু-একবার আমার কাছে এসেছিল। ভাল ক'রে আলাপ করতে হবে। ওকে আসতে বলো তো।'

'আচ্ছা—' অর্জুন বলে, তখন বলেছিলেন আজ আমি না এলে লালধারীকে আমার কাছে পাঠাবেন'—বলতে বলতে থেমে যায়।

অর্জুনের অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে একটা প্রশ্ন লুকনো রয়েছে। চন্দ্রকান্ত তা বুঝতে পারেন। বলেন, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে—'

উৎকণ্ঠিতের মতো তাকিয়ে থাকে অর্জুন।

চন্দ্রকান্ত আস্তে আস্তে বলেন, 'এখান থেকে নমকপুরার লোকজনের সিগনেচার কালেক্ট করে গভর্নমেণ্টের কাছে অ্যাপীল করা হয়েছে, তোমাদের শাদির ব্যবস্থা ক'রে আমি নাকি এখানকার সোস্যাল সেট-আপকে ডিসটার্ব করছি। ধর্ম আর সমস্কারকে আঘাত দিচ্ছি। আমাকে নমকপুরা থেকে ট্রান্সফার করা না হ'লে বিরাট মুভমেণ্ট করা হবে।'

অর্জুন হকচকিয়ে যায়। বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'খুদ মিনিস্টার, এম এল. এ, এম. পি, ডি. এম—এঁরা সব শাদির সময় ছিলেন। তা ছাড়া সরকার তো কানুনই ক'রে দিয়েছে উঁচা জাতের ছেলে বা মেয়ে অচ্ছুতদের ছেলে কি মেয়ে বিয়ে করলে তাকে সুবিধে দেওয়া হবে। সেজন্যে টাকা নৌকরি, সবই পেয়েছি। এখন কেউ গোলমাল করতে চাইলে সরকার জরুর বরদাস্ত করবে না।'

চন্দ্রকান্তকে বেশ চিন্তিত দেখায়। যে মানুষ প্রচণ্ড জেদ সাহস এবং আত্মবিশ্বাসে গোটা নমকপুরা টাউনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অর্জুনের বিয়ে দিয়েছেন, ইনি যেন সেই চন্দ্রকান্ত নন। তিনি বলেন, 'তুমি যা বলছ, সবই ঠিক। লেকেন—'

'কী?'

'শুকদেও ঝা তো একমাত্র মিনিস্টার নন, আরো অনেক মন্ত্রী আছেন। তাছাড়া কানুনের কথা বললে। কানুন বানিয়ে যেমন মানাও হয়, তেমনি কানুন ভাঙার নজিরও কম নেই অর্জুন।'

প্রচণ্ড এক উদ্বেগ বোধ করতে থাকে অর্জুন। সে কিছু বলে না।

নিজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে দূরমনস্কর মতো চন্দ্রকান্ত বলেন, 'খুব প্রবলেম হয়ে গেল!'

খাবারের প্লেট থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল অর্জুন। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কিসের প্রবলেম?'

'ওপরের একটা সেকসান থেকে ভীষণ প্রেসার আসছে আমার ওপর। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কী ধরনের প্রেসার?'

'আমি যেন এ ধরনের শাদির ব্যাপারে আর মাতামাতি না করি।'

'লেকেন সরকারী কানুন?'

বিষণ্ণ হাসেন চন্দ্রকান্ত, 'তোমাকে তো এখনই কানুনের কী হাল হয় সে কথা বললাম।'

অর্জুন কী বলবে, ভেবে পায় না।

চন্দ্রকান্ত এবার বলেন, 'আরো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে অর্জুন।'

অর্জুন কিছু না বলে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'খবর পেলাম, আমার বিরুদ্ধে পাটনায় একটা পাওয়ারফুল লবি কাজ ক'রে যাচ্ছে। তারা আমাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করিয়ে অন্য জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা করছে।'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায় অর্জুনের। সে বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমাদের কী হবে? ওরা কমলা আর আমাকে একেবারে খতম ক'রে ফেলবে।'

'জানি, আমি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে। তবে এত সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না। নরম্যাল কোর্সে আমার এখনও বছর তিনেক এখানে থাকার কথা।' চন্দ্রকান্ত একটানা বলে যান, 'দু-চারদিনের মধ্যে একবার পাটনা যাব। আমার বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত চলছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, জানতে চেষ্টা করব। তারপর দেখি কী করা যায়।'

॥ আট ॥

অর্জুন অফিসে জয়েন করার পর কয়েকটা দিন কেটে যায়। এর মধ্যে বাড়ির আবহাওয়ায় তেমন কোনো হেরফের ঘটেনি। উঠোনের ওপারে সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে সেই টিনের চালাতেই সে এবং কমলা আছে। মা সকালে সূর্যোদয়ের সময় মাত্র একবারই বাইরে আসে। পরে সারাদিন আর তাকে দেখা না গেলেও মাঝে মাঝে তার কাতর কান্নার শব্দ বাড়িটাকে বিষণ্ণ ক'রে রাখে।

অফিসে জয়েন করার পর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে অর্জুন। যে মান্ধাতা রোজ তাদের বাড়ি হানা দিত, হঠাৎ তাকে দেখা যাচ্ছে না। সে নাকি নমকপুরায় নেই। মান্ধাতা না এলেও পুরানা মহল্লার অন্য বাসিন্দারা নিয়মিত দুবেলা আসছে।

এদিকে অফিসে কেউ পারতপক্ষে অর্জুনের ধারেকাছে ঘেঁষে না। বিদ্রূপ, টিটকিরি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একমাত্র বিজয়ই এই সব আক্রমণ থেকে তাকে আগলে আগলে রাখছে। নইলে অনেক আগেই সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিতে হতো।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর চায়ের কাপ নিয়ে সবে বসেছে অর্জুন, রাধা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে 'বাবুজি তোমাকে ডাকছে।'

বিয়ের পর রামঅবতার কোনোদিন তাকে ডেকেছে বলে মনে করতে পারে না অর্জুন। সে রীতিমত অবাক হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মারাত্মক এক দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। এই সকালবেলা আচমকা তাকে ডেকে পাঠানোর পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কেন ডাকছে জানিস?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ে রাধা।

দ্রুত চায়ের কাপ নামিয়ে অর্জুন উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল—'

রাধা বলে, 'চা খেলে না?'

'পরে খাব।'

অর্জুন টিনের চালার বাইরে আসতেই দেখতে পায় ওধারের পাকা দালানের বারান্দায় বসে আছে রামঅবতার মান্ধাতা ভানুপ্রতাপ আর সুরযদেও। নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটির এতগুলো দোর্দণ্ডপ্রতাপ চাঁইকে একসঙ্গে তাদের কোঠিতে হানা দিতে দেখে অর্জুনের শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নামতে থাকে।

মান্ধাতা তাকে দেখতে পেয়েছিল। প্রায় সবাই হাত নেড়ে তাকে ডাকে, 'আয় অর্জুন—'

অর্জুন তাদের দিকে চোখ রেখে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ওঠে। রামঅবতারদের কাছাকাছি একটা বেতের মোড়া ফাঁকা পড়ে আছে। সে বুঝতে পারে ওটা তার জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। মান্ধাতা মোড়াটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ব'স।'

অর্জুন বসে পড়ে।

মান্ধাতা গলা খাঁকরে এবার বলে, 'অফিসে জয়েন করেছিস, শুনলাম।'

'হ্যাঁ।' ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে দেয় অর্জুন।

'কামকাজ সব ঠিকমতো চলছে?'

একটু চুপ ক'রে থাকে অর্জুন। তারপর দ্বিধান্বিত ভাবে বলে, 'হ্যাঁ।'

কী ভেবে নিয়ে মান্ধাতা এবার বলে, 'দ্যাখ বেটা, আজ আমরা একটা বহুত জরুরি কাজে তোর কাছে এসেছি।'

সেটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে অর্জুন। উত্তর না দিয়ে স্নায়ুগুলো টান টান ক'রে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

মান্ধাতা বলে, 'একটা কথা এবার বলব, তোকে সেটা মেনে নিতে হবে।'

কাঁপা গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'তোর একটা নৌকরির জরুরত ছিল। আমি তো জানি এর জন্যে তিন চার সাল কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছিস। আমি অবশ্য মিনসিপ্যালিটিতে ছোটামোটা নৌকরির ব্যওস্থা করেছিলাম,

লেকেন সরকারি যে নৌকরিটা পেয়েছিস তার কাছে সেটা কিছুই না।'

অর্জুন বলে, 'নৌকরির কথা থাক, আপনার কী কথা আছে, তাই বলুন।'

মান্ধাতা শান্ত মুখে বলে, 'তাই তো বলছি বেটা। চার সাল ঘুরে যা পারিস নি, অচ্ছুতের লেড়কীকে শাদি ক'রে সাত রোজের মধ্যে তা পেয়ে গেছিস। বহুত আচ্ছা।' বলে একটু থামে মান্ধাতা। পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'আমি বলি কি, যেখান থেকে যে সুযোগ পাওয়া যায় সেটা নেওয়া দরকার। কলিযুগে সেটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। যে কালের যে ধরম।'

অর্জুন কিসের যেন একটা সংকেত পায়। সে স্থির চোখে মান্ধাতাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

এদিকে ভানুপ্রতাপ সুরযদেও এবং রামঅবতার সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক বাত, ঠিক বাত।'

মান্ধাতা এবার যা বলে তা এইরকম। অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে ক'রে যখন একটা দামী সরকারি নোকরি বাগানোই হ'য়ে গেছে তখন আর এ বিয়েটা নিয়ে অর্জুন যেন আদৌ মাথা না ঘামায়। কম্‌লাকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, অচ্ছুতটোলায় তার মা-বাপের কাছে যেন পাঠিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখার জরুরত নেই।

অর্জুন শিউরে ওঠে, 'লেকেন—'

'কী বেটা?'

অর্জুন জানায়, মিনিস্টার, ডি. এম, এস. পি, এম. পি, এম. এল. এ এবং এস. ডি. ও'র মতো মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সামনে সইসাবুদ ক'রে তার শাদি হয়েছে। কম্‌লাকে এভাবে তাড়িয়ে দিলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। মিনিস্টাররা তাকে কোনো মতেই ছেড়ে দেবেন না।

মান্ধাতা বলে, 'ও সব নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। হামলোগ সামহালেঙ্গে। আজই ওকে তুই টাঙ্গা ডেকে তুলে দে। পবিত্র ব্রাহ্মণের কোঠিতে অচ্ছুত এনে বসানো ঠিক না অর্জুন।'

'লেকেন কম্‌লাকে এভাবে তাড়িয়ে দিলে আমার নৌকরি থাকবে না।'

'সরকারি নৌকরি এত সহজে যায় না অর্জুন।'

'রেজিস্ট্রি ক'রে আমাদের শাদি হয়েছে। মুখের কথায় ডিভোর্স হবে না। দু তরফ আর্জি করলে কোর্ট সব শুনে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করতে পারে। কম্‌লারা আর্জি না করলে মুশকিল হবে।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি মান্ধাতা। সে থতিয়ে যায়। তারপর চিন্তা ক'রে বলে, 'জগলাল গাঙ্গোতার বিটিয়া যাতে আর্জি করে তার ব্যওস্থা করব।'

'জবরদস্তি করে?'

'আরে নেহী নেহী, বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'

'আরো একটা সমস্যা যে থেকে যাচ্ছে।'

'কী?'

'আমার কী হবে?'

অর্জুনের প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে মান্ধাতা জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

অর্জুন বলে, 'অচ্ছুতের মেয়ে শাদি ক'রে আমার জাত তো নষ্ট হয়ে গেছে।'

দুই হাত এবং মাথা প্রবল বেগে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মান্ধাতা বলে, 'আরে নেহী, নেহী। বামহনের ছৌরা মৌত পর্যন্ত বামহনের ছৌরাই থেকে যাবে। স্রেফ—'

'কী?'

'নামকা ওয়াস্তে একটা প্রায়শ্চিৎ করিয়ে নেব।' বলে ভানপ্রতাপের দিকে তাকায় মান্ধাতা। বলে, 'কি, তুমি তো

অনেকের কুলগুরু, প্রায়শ্চিৎ করিয়ে নিলে সব পাপ খণ্ডন হয়ে যাবে না ?'

'জরুর। লেকেন অর্জুন যা করেছে তা পাপ না, জওয়ানিকা ধরম, ছোটিসি পদস্খলন। শ'ও দো শো রুপাইয়া কা মামলা। এক যজ্ঞ, দশ বামহন ভোজন, থোড়েসে দান—ব্যস, গায়ে যে ময়লা লেগেছে সব সাফ।'

মাথা থেকে যেন বিরাট দুশ্চিন্তা নেমে গেছে। মান্ধাতা বেশ হালকা বোধ করে। বলে, 'তা হ'লে আজই গাঙ্গোতার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস—'

মুখের ওপর হঠাৎ অদ্ভুত কাঠিন্য নেমে আসে অর্জুনের। সে সে বলে, 'নেহ্‌ঁী—'

'মতলব ?'

'আমি কম্‌লাকে ছাড়ব না।'

মান্ধাতা তার কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রেখে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'আরে বাবা, প্রায়শ্চিৎ হয়ে যাবার পর শুধ্‌ বামহনের ঘরের লিখিপড়ি খুবসুরত লেড়কীর সঙ্গে আবার তোর শাদি দেব। চুন চুনকে তোর জন্যে দুলহিন নিয়ে আসব।'

দৃঢ় গলায় অর্জুন জানায়, কোনোরকম চাপ বা অনুরোধের কাছে সে মাথা নোয়াবে না, রাজকন্যার সঙ্গে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও দ্বিতীয় বার শাদি করবে না। কম্‌লাকে ত্যাগ করার প্রশ্নই নেই।'

মান্ধাতা তবু শেষ চেষ্টা করে, 'তোর দিমাগ কি খারাপ হয়ে গেল অর্জুন !'

'দিমাগ ঠিকই আছে।'

'তোর রিস্তেদাররা তোদের কোঠিতে আসে না, তাদের সঙ্গে সব নাতেদারি নষ্ট হয়ে গেছে। তোর মায়ের এই হাল। যে কোনোদিন তার মৌত হয়ে যাবে। মহল্লার লোকজন তোর ওপর খেপে আছে। নেহাত আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। না হ'লে এতদিনে

তোকে আর ঐ অচ্ছুত ছোরীটাকে ছিঁড়ে ফেলত। এবার একটা কথা ভেবে দ্যাখ—'

'কী?'

'একটা মেয়ের জন্যে তোর মায়ের মৌত হোক, তোদের সমসার বিলকুল নষ্ট হয়ে যাক, এটা তুই চাস?'

একটু চুপ ক'রে থাকে অর্জুন। মায়ের ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত চেহারাটা তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একসময় আস্তে আস্তে সে বলে, 'মা অকারণে কষ্ট পাচ্ছে। কমলার অপরাধটা কী? বামহনের লেড়কীর সঙ্গে তার তফাতটা কোথায়?'

'তফাতটা হলো ও বামহনের লেড়কী নয়। ওর জন্যে আমাদের হাজারো সালের সমস্কার ভাঙতে পারি না।'

আচমকা উঠে দাঁড়ায় অর্জুন। বলে, 'আমি এখন যাই।'

অবাক হয়ে মান্ধাতা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়?'

'বাজারে যেতে হবে। ফিরে আসার পর রসুই চড়বে। তারপর খেয়ে অফিস যাব। এখন আর বসার সময় নেই।'

'তা হ'লে শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলি?'

'নতুন ক'রে ঠিক করার আর কিছু নেই। আমার যা বলার তা একটু আগেই বলে দিয়েছি।'

'অচ্ছুতের বিটিয়াকে তুই ছাড়বি না?'

'নেহী।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মান্ধাতা। হঠাৎ প্রবল রক্তচাপে মুখ লাল হয়ে ওঠে তার। কপালের দু'পাশের রগদুটো খ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফাতে থাকে। অসহ্য রাগে তার চোখের তারা দুটো যেন ফেটে যাবে। সে চিৎকার ক'রে বলে, 'হুঁশিয়ার অর্জুন। পুরা চৌবিশ ঘণ্টা টাইম তোকে দিলাম, এর ভেতর অচ্ছুতের বিটিয়াকে তার বাপের ঘরে পাঠিয়ে দিবি। যা—' বলে উঠোনে নামার সিঁড়ি দেখিয়ে দেয়।

হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে ভয়ের শিহরণ ঢেউয়ের মতো উঠে

আসে অর্জুনের। হাত-পা যেন অসাড় হয়ে যায়। মান্ধাতার এই ভয়ঙ্কর চেহারাটা তার প্রায় অচেনা ছিল। মান্ধাতার চোখ মুখ এবং চিৎকার বুঝিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে কতটা নিষ্ঠুরতা ঠাসা রয়েছে।

অর্জুন ঘাড় নিচু ক'রে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে যায়।

বিকেলে অফিস ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায় অর্জুন।

বড় সড়ক ধরে শহরের দক্ষিণ দিক থেকে একটা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে আসছে।

'সামাজিক স্থিতি—'

'রক্ষা করো, রক্ষা করো।'

'ব্রাহ্মণকা বিনাশনা—'

'বন্ধ করো, বন্ধ করো—'

'সমাজকা নয়া সুধার—'

'নেহী চাহিয়ে, নেহী চাহিয়ে।'

'সরকার—'

'হোঁশিয়ার, হোঁশিয়ার।'

অর্থাৎ যারা নতুন আইন কানুন চালু ক'রে সামাজিক সুস্থিতিতে বিপর্যয় নিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে এই মিছিল। তাদের মতে এর ফলে ব্রাহ্মণরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে সরকার সমাজের পরিবর্তন চাইছে তাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলা হচ্ছে, কোনোরকম সংস্কারের বা সংশোধনের প্রয়োজন নেই। আবহমান কাল ধরে যা চলছে তা-ই চলুক।

এরা আরো যা স্লোগান দিচ্ছে তা এইরকম। যদি জবরদস্তি ক'রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অচ্ছুতের বিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা নষ্ট করা হয় এবং স্থানীয় এম. এল. এ বা এম. পি যদি এর প্রতিবাদ না করেন, আগামী নির্বাচনে তাদের একটি ভোটও দেওয়া হবে

না। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উঁচা জাতের স্বার্থ আর মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাবে।

সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এরা রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে। অর্জুন মিছিলের স্লোগানগুলো শুনতে শুনতে বুঝতে পারে, এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। ভোট না পাবার ভয় থাকলে বা আগামী চুনাওতে নতুন উমীদবার দাঁড়িয়ে গেলে এখানকার এম. এল. এ বা এম. পি'রা কতটা প্রগতিবাদী থাকবে, বলা মুশকিল।

অন্য দিনের মতো আজও বিজয় অর্জুনের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিল। মিছিলটা দেখতে দেখতে বলে, 'একটা শাদি করেছিলে বটে! তার জন্যে নমকপুরায় পুরা ব্রাহ্মণ কমিউনিটি মিছিল বার ক'রে ফেলেছে।' বলতে বলতে তার গলার স্বর তীব্র হয়ে ওঠে, 'এরা হিন্দু সোসাইটিকে বিলকুল খতম ক'রে দেবে।'

অর্জুন উত্তর দেয় না।

এদিকে মিছিলটা তাদের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। সবার আগে আগে চলেছে মান্ধাতা সুরযদেও ধনিকরাম ভানুপ্রতাপ এমনি অনেক।

মান্ধাতারা অর্জুনকে লক্ষ্য করেনি, করলে কী হতো বলা যায় না। মিছিলটা বেরিয়ে যাবার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'এরা যাচ্ছে কোথায়?'

'কী জানি।' বিজয় বলে, 'তুমি একটু দাঁড়াও। আমি দেখে আসছি।' বিজয় দাঁড়ায় না, মিছিলের পেছন পেছন চলতে থাকে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে ফিরে আসে বিজয়। তাকে রীতিমত উত্তেজিত দেখায়।

অর্জুন ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো? ওরা কোথায় গেছে?'

'এস. ডি. ও'র বাংলোয়।' বিজয় বলে, 'গেটের সামনে দাঁড়িয়ে

ওরা স্লোগান দিচ্ছে। বলছে, এস. ডি. ও'কে এখান থেকে চলে যেতে হবে। না হ'লে তাঁর বাংলো লাগাতার ঘেরাও ক'রে রাখা হবে।'

চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর জন্য প্রচণ্ড উদ্বেগ বোধ করে অর্জুন। বলে, 'ওরা বাংলোয় ঢুকে ঝামেলা করবে না তো?'

'তা পারবে না। গেট ভেতর থেকে বন্ধ। তা ছাড়া আর্মড গার্ড রয়েছে অনেক।'

অর্জুনের মনে পড়ে, অফিসে জয়েন করার পর যখন সে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁকে নমকপুরা থেকে ট্রান্সফার করার চক্রান্ত চলছে পাটনায়। এখান থেকে তাঁর বিপক্ষে প্রচুর সিগনেচার যোগাড় ক'রে অসংখ্য এম এল এ, হোম সেক্রেটারি, চীফ সেক্রেটারি থেকে শুরু ক'রে কয়েকজন মন্ত্রী, এমন কি চীফ মিনিস্টারকেও পাঠানো হয়েছে। সে বলে, 'চন্দ্রকান্তজিকে কি এখান থেকে ট্রান্সফার ক'রে দেবে?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না। শুনলাম, ক'জন মন্ত্রী আর লোকাল এম. এল. এ. আর এম. পি এসে এখানে মীটিং করবে। এখানকার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি তার ব্যবস্থা করছে।'

'ব্রাহ্মণরা যখন মীটিং ডেকেছে তখন জরুর চন্দ্রকান্তজির শ্রাধ্ (শ্রাদ্ধ) ক'রে ছাড়বেন। আমাদের শাদির ব্যাপারেও গোলমাল পাকাবে।'

বিজয়কে চিন্তিত দেখায়। বলে, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কোথায় যাবে?'

অর্জুন বলে, 'চন্দ্রকান্তজির সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। লেকেন—'

'না। আজ ওখানে যাওয়া একেবারে ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ।'

'আজ বাড়িই চলে যাও।'

বিজয় যদিও উলটো দিকে যাবে, তবু অর্জুনের সঙ্গে পুরানা মহল্লার দিকে হাঁটতে লাগল।

খানিকটা যাবার পর অর্জুন বলে, 'জানো, আজ সকালে মান্ধাতা চাচা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে। সেই থেকে ভয়ে ভয়ে আছি।'

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় বিজয়। বলে 'কী বলেছে মান্ধাতা শর্মা ?'

মান্ধাতার সঙ্গে সকালে যা যা কথা হয়েছে, সব জানিয়ে দেয় অর্জুন।

বিজয় চমকে ওঠে, 'সিরফ চৌবিশ ঘণ্টা টাইম দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী করতে চায় ?'

'জানি না। কিছু বলেনি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে সূর্য ডুবে গিয়েছিল। নমকপুরার বাড়িঘর, গাছপালা এবং দূরে বরখা নদীর ওপর অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। অর্জুনদের পাশ দিয়ে স্রোতের মতো টাঙ্গা, সাইকেল রিকশা, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, ট্রাক, ঠেলা বা অটো ছুটে চলেছে।

একসময় অর্জুন বলে, 'চন্দ্রকান্তজির পেছনে ওরা যেভাবে লেগেছে, মনে হয়, ওঁকে ট্রান্সফার করিয়ে ছাড়বেন। উনি এখান থেকে চলে গেলে মান্ধাতা শর্মারা আমাকে আর কম্‌লাকে টুকরা টুকরা ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে।'

বিজয় উত্তর দেয় না। প্রচণ্ড সাহসী একগুঁয়ে এবং হিন্দু সোসাইটির সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী এই যুবকটিকে হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। হিন্দু সমাজের সংস্কার সুধার এবং পরিবর্তনের বিপক্ষে যারা একজোট হয়েছে তারা এই ছোট্ট নগণ্য শহরে প্রবল শক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধে এককভাবে অর্জুন কতটা কী করতে পারবে, ভেবে সে যেন হতাশ হয়ে পড়ে।

নমকপুরার মাঝামাঝি বাজার মহল্লায় এসে পড়েছিল অর্জুনরা।

বিজয় বলে, 'ক'টা জিনিস কিনে আমি এখান থেকে ফিরে যাব। তুমি বাড়ি চলে যাও। যদি ওরা বেশি ঝামেলা পাকায় তোমরা দু'জন সিধা এস. ডি. ও'র বাংলোয় চলে যাবে। যে যতই শাসক, চন্দ্রকান্তজি যতদিন আছেন, তোমদের ভয় নেই। কেউ তোমাদের গায়ে হাত ঠেকাতে সাহস করবে না।'

অর্জুন চুপ ক'রে থাকে।

বিজয় আবার বলে, 'কী হলো না হলো, কাল অফিসে এসে আমাকে জানাবে।'

'জরুর।'

বিজয় ডান পাশে একটা বড় স্টেশনারি দোকানে ঢুকে যায়। আর তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে পুরানা মহল্লার দিকে হাঁটতে থাকে অর্জুন।

॥ নয় ॥

বাড়ির সামনে এসে চমকে ওঠে অর্জুন। তাদের মহল্লার প্রচুর লোকজন সদর দরজার কাছে ভিড় জমিয়েছে। আর ভেতর থেকে হৈচৈ এবং কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

প্রথমেই যে আশঙ্কাটা অর্জুনের চিন্তাশক্তিকে মুহূর্তের জন্য অসাড় ক'রে দেয় তা হলো তার মা সম্পর্কে। মায়ের কি হঠাৎ খারাপ কিছু হয়ে গেল?

একসময় অর্জুন টের পায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে দৌড়ুচ্ছে। তাকে দেখে চাপ-বাঁধা ভিড়টা সরে সরে পথ করে দেয়।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই যে দৃশ্য অর্জুনের চোখে পড়ে, এক মিনিট আগেও এমন একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি। বাজ-পড়া মানুষের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

তাদের উঠোনেও মহল্লার বেশ কিছু লোকজন। মাঝখানে দু হাতে মুখ ঢেকে সমানে কেঁদে চলেছে কমলা। ওদিকে রামঅবতার এবং তার ভাই বিনোদ তাদের সেই ভাঙাচোরা টিনের চালটা থেকে থালা বাসন সুটকেশ জামাকাপড় বিছানা-বালিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলছে।

অর্জুনের চোখে পড়ে মায়ের কিছুই হয়নি। পাকা কোঠির বারান্দায় বসে সে সমানে কপাল চাপড়াচ্ছে আর গলার শিরা ছিঁড়ে ক্ষীণ আওয়াজ ক'রে একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে। তার পাশে বসে কাঁদছে রাধা।

অর্জুনের মস্তিষ্কের ভেতর অগুনতি চাকা একসঙ্গে ঘুরতে থাকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সে বাড়ি ছিল না, এর মধ্যে হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে যাতে কমলাকে ঘর থেকে বার করে রামঅবতার তার ছোট ছেলেকে নিয়ে তাদের মালপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে বা মা আর রাধা ওভাবে মড়া-কান্না জুড়ে দিয়েছে?

ভয়ে উদ্বেগে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে অর্জুনের। কাঁপা ঝাপসা গলায় সে বলে, 'কী হয়েছে বাবুজি?'

টিনের চালা থেকে একটা টিনের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে আসছিল রামঅবতার। সেটা উঠোনে আছড়ে ফেলে দৌড়ে অর্জুনের কাছে চলে আসে সে। মুখচোখ দেখে মনে হয়, এই মুহূর্তে তার মাথায় খুন চেপে গেছে। হাত পা এবং মাথা নেড়ে, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে উন্মাদের মতো চেঁচাতে থাকে, 'নিকাল যা, নিকাল যা, আভ্‌ভি হামারা কোঠিসে তু দোনো নিকাল যা—'বলে বিনোদের দিকে তাকায়, 'যা, তুরন্ত একটা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে আয়।'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গিয়েছিল অর্জুনের। সে কাঁপা গলায় বলে, 'কী অন্যায় হয়েছে বলবে তো?'

'তোর সঙ্গে একটা কথাও না। তোদের মুখে থুক—' বলে প্রচণ্ড ঘৃণায় মাটিতে তিন চার বার থুতু ছিটিয়ে দুমদাম পা ফেলে আবার টিনের চালার দিকে যায় রামঅবতার।

পেছন থেকে অর্জুন ডাকে 'বাবুজি--'

ঘাড় ফিরিয়ে কর্কশ গলায় রামঅবতার চেঁচায়, 'কী, কী বলছিস ভুচ্চর ?'

'একটা কথা ভেবে দেখ—'

চোখমুখ আরো উগ্র হয়ে ওঠে রামঅবতারের, 'কী, কী ভাবব ?'

অর্জুন করুণ মুখে বলে, 'এই রাত্রিবেলা তুমি আমাদের বার করে দিচ্ছ। আমরা কোথায় গিয়ে উঠব ?'

'যে নরকে ইচ্ছা—' হিংস্র ক্রুদ্ধ কুকুরের দাঁতের মতো রামঅবতারের আধভাঙা ক্ষয়া-ক্ষয়া কালচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। সে চিৎকার করতে থাকে, 'লেকেন আমার কোঠিতে আর এক মিনিটও না। তোদের মুহ্ আর দেখতে চাই না।' বলেই টিনের চালায় ঢুকে বাকি মালপত্র টেনে এনে উঠোনে ছুঁড়তে থাকে।

এই কাজটি যখন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়ে এসেছে সেই সময় বিনোদ এসে খবর দেয় টাঙ্গা এসে গেছে।

রামঅবতার বলে, 'যা, এই সামানগুলো টাঙ্গায় তুলে দে।' বলে আবার টিনের চালায় ঢুকে পড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এবার বিমূঢ়ের মতো চারপাশের ভিড়টার দিকে তাকায় অর্জুন। সে জানে এই সব লোকজন তার বা কম্‌লার জন্য একটি আঙুলও তুলবে না। এদের কারো কাছ থেকে এক ফোঁটা সহানুভূতি পাওয়ার আশা নেই। বরং দরকার হ'লে তাদের দু'জনকে একেবারে চুরমার ক'রে দেবার জন্য তারা রামঅবতারের সঙ্গে হাত মেলাবে।

নিজের অজান্তেই অর্জুন পাকা কোঠির বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। মায়ের উদ্দেশে বলে, 'বাবুজিকে বল মা, এভাবে আমাদের যেন তাড়িয়ে না দেয়—' বিয়ের পর বাড়িতে এসে এই প্রথম মায়ের সঙ্গে কথা বলল সে।

অর্জুনের মা উত্তর দেয় না, একটানা কেঁদেই যায়। তার দু চোখ থেকে স্রোতের মতো জল গড়াতে থাকে।

উঠোনের ওধার থেকে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে রামঅবতার। বলে, 'এ বাড়ির কারো সঙ্গে কোনো কথা না। নিকাল যা—'

অর্জুন বিষণ্ন চোখে মা'কে একবার দেখে বারান্দার পাশ থেকে উঠোনের মাঝখানে কম্‌লার কাছে চলে আসে। বলে, 'চল—'

কম্‌লা মুখ থেকে হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ায়।

এদিকে বিনোদ একাই না, রামঅবতার এবং ধনিয়া ছোটাছুটি করে অর্জুনদের যাবতীয় মালপত্র টাঙ্গায় তুলে দেয়।

অগত্যা নিঃশব্দে পৃথিবীর সব অসম্মান ঘৃণা এবং ধিক্কার মাথায় নিয়ে কম্‌লাকে সঙ্গে ক'রে অর্জুন টাঙ্গায় ওঠে।

টাঙ্গাওলা জিজ্ঞেস করে, 'কহাঁ যায়েগা?'

এই শহরের মাত্র তিনজন মানুষই রয়েছেন যাঁরা তাদের আশ্রয় দিতে পারেন। অর্জুন অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে থেকে বলে ওঠে, 'এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোয় চল—'

টাঙ্গাওলা আধমরা ক্ষয়াটে চেহারার ঘোড়াটার পিঠে চাবুক হাঁকায়। তৎক্ষণাৎ কাতর আওয়াজ করে সেটা ছুটতে শুরু করে।

পেছন থেকে রামঅবতারের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে আসে, 'এ কোঠিতে আর কোনোদিন যেন তোদের মুহ্‌ না দেখি। পাপী, কুলাঙ্গার কাঁহিকা!'

একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় অর্জুন। রামঅবতারের পাশে দাঁড়িয়ে পুরানা মহল্লার মানুষগুলো তার এই চলে যাওয়া লক্ষ্য করছে। নিশ্চয়ই তারা খুব খুশি।

বাবা মা ভাইবোন এবং আজন্ম পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক চিরকালের মতো ছিন্ন হয়ে যায়।

অনেকটা রাস্তা পেরুবার পর অর্জুন আস্তে ক'রে স্ত্রীকে ডাকে, 'কম্‌লা—'

কম্‌লা নীরবে কেঁদেই যাচ্ছে। তার দু' চোখ ফোলা ফোলা,

আরক্ত। গাল বেয়ে জল ঝরেই যাচ্ছে। উত্তর না দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

কমলার কান্নাটা কোনো অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অর্জুনের মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ঝাপসা ভাঙা গলায় সে বলে, 'কেঁদো না কমলা, কেঁদো না।'

কান্না থামে না কমলার, বরং আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। স্ত্রীর একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে অর্জুন। তারপর বলে, 'আচানক কী এমন হলো যাতে বাবুজি আমাদের এভাবে তাড়িয়ে দিল! তুমি কি কিছু জানো?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় কমলা।

'কী হয়েছে?'

'আজ বিকেলে পূর্ণিয়া থেকে একটা চিঠি এসেছিল। সেটা পড়েই তোমার বাবুজি একেবারে খেপে ওঠে।'

'পূর্ণিয়া থেকে কে চিঠি দিল? ওখানে তো আমাদের কোনো রিস্তেদার নেই।'

'ওখানে রাধার যে বাড়িতে শাদি ঠিক হয়েছে তারা লিখেছে।'

চমকে ওঠে অর্জুন, জিজ্ঞেস করে, 'কী লিখেছে ওরা?'

কমলা জানায়, রাধার ভাবী সসুরালের লোকেরা কীভাবে যেন জেনে গেছে দুলহনের ভাই অর্থাৎ অর্জুন গাঙ্গোতাদের মেয়ে বিয়ে করে বসেছে। যে বাড়ির পুতহু অচ্ছুত সে বাড়ির মেয়ে তারা নেবে না। চিঠি লিখে আজ তারা বিয়ে ভেঙে দিয়েছে।

চিঠিটা পড়ার পর মাথায় খুন চেপে যায় রামঅবতারের। মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে কিছুক্ষণ বাড়িময় দাপিয়ে বেড়ায় সে। তারপর কমলা এবং অর্জুনের উদ্দেশে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে টিনের চালায় ঢুকে কমলাকে উঠোনে বার ক'রে দিয়ে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। তার চিৎকারে পুরানা মহল্লার লোকজনেরা দৌড়ে আসে।

এদিকে বিয়ে ভাঙার খবর পেয়ে অর্জুনের মা এবং রাধা পাকা কোঠির বারান্দায় বসে বুক-ফাটা কান্না জুড়ে দেয়। তারপর যা যা ঘটেছে সবই অর্জুনের জানা।

এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে এসে একসময় টাঙ্গা থেমে যায়। টাঙ্গাওলা বলে, 'আ গিয়া মালিক—'

গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন টাঙ্গাওলাকে বলে, 'একটু দাঁড়াও। আমি ভেতর থেকে আসছি।'

'জি—'

কমলাকেও একই কথা বলে লোহার ভারী গেটের দিকে এগিয়ে যায় অর্জুন। তার ভয় ছিল, হয়তো এখানে এসে দেখবে মান্ধাতা শর্মারা গেটের কাছে মিছিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অর্জুন। মান্ধাতারা এখন নেই। খুব সম্ভব উত্তেজক স্লোগান দিয়ে এবং এস. ডি. ও'কে শাসিয়ে তারা চলে গেছে।

মিছিল চলে গেলেও গেটটা বন্ধই রয়েছে। কমপাউণ্ডের ভেতর বিশ পঁচিশ জন আর্মড গার্ড দেখা যাচ্ছে। এত সশস্ত্র পাহারাদার অন্য সময় এখানে থাকে না। নিশ্চয়ই নিরাপত্তার কারণে তাদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছে।

পাহারাদারদের অনেকেই অর্জুনকে চেনে। তারা গেট খুলে দেয়।

অর্জুন ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে যায়। চন্দ্রকান্ত এবং সরযূ বাংলোতেই ছিলেন। তাঁদের কাছে আজকের সব ঘটনা জানিয়ে বলে, 'বাবুজি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কমলাকে টাঙ্গায় বসিয়ে এসেছি। এখন আমরা কী করব?'

চন্দ্রকান্তকে অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিপর্যস্ত দেখায়। তিনি বলেন, 'মরালি তোমাদের শেলটার দেওয়া আমার উচিত। কিন্তু তুমি কি জানো আজ নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি আমার বিরুদ্ধে বিরাট প্রসেশান বার ক'রে এখানে এসেছিল?'

'জানি। আমি মিছিলটাকে এদিকে আসতে দেখেছি।'

'তারা বলে গেছে, আমি নাকি ব্রাহ্মণদের পবিত্রতা নষ্ট ক'রে দিচ্ছি। কয়েক দিনের ভেতর এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোথাও যদি আমি চলে না যাই, ওরা তুমুল মুভমেণ্ট শুরু করবে।'

'আমি এই রকমই ভেবেছিলাম।'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'বুঝতেই পারছ, এই অবস্থায় তোমাদের যদি আমরা এখানে থাকতে দিই ওরা তুলকালাম বাধিয়ে দেবে। কয়েকটা দিন তোমরা অন্য কোথাও থাকো। উত্তেজনাটা একটু কমে আসুক, তারপর তোমাদের এখানে নিয়ে আসব।'

বোঝাই যায়, চন্দ্রকান্ত বেশ ভয় পেয়েছেন। অর্জুনের বিয়ের সময় আবহাওয়া যা ছিল তা এখন বদলে গেছে। রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং সামাজিক, সব দিক থেকেই তাঁর ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে। তিনটি ফ্রণ্টে এককভাবে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ চালানো খুবই অসুবিধাজনক। তাই রণকৌশল হিসেবে আপাতত অর্জুনদের দূরে রাখতে চাইছেন।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছিল অর্জুন। ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ দমে যায়। কাঁপা গলায় বলে, 'আমরা কোথায় থাকব? কেউ তো আমাদের জায়গা দেবে না।'

একটু চিন্তা করে চন্দ্রকান্ত বলেন, 'তোমরা চার্চে চলে যাও। রেভারেণ্ড টিরকে নিশ্চয়ই তোমাদের আশ্রয় দেবেন। হী ইজ এ গ্রেট সোল।'

চার্চে এসে অর্জুনরা যখন পেঁছিয়, অনেকটা রাত হয়ে গেছে।

সব শুনে কিছুক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকেন রেভারেণ্ড টিরকে। তারপর বলেন, 'এই রকম কিছু ঘটবে, আগেই ভেবেছিলাম। এতদিন কেন ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য। ঠিক আছে, এসে যখন পড়েছ, টাঙা থেকে মালপত্র নামিয়ে আনো।'

সেই সন্ধ্যে থেকে অর্জুনদের ওপর দিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু একটা ঘটে গেছে। প্রচণ্ড ধিক্কার এবং অসম্মানের পর

চার্চে এসে এই প্রথম অনিশ্চয়তা খানিকটা কাটে। উৎকণ্ঠাও কমে যায়। একটা আশ্রয় অন্তত পাওয়া গেছে।

কিন্তু রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর উদ্বেগটা অনেক বেড়ে যায়।

রেভারেণ্ড টিরকে বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে অর্জুন। বলে, 'কী কথা ?'

'আমি যদি অন্য কোথাও থাকতাম, যতদিন ইচ্ছা তোমরা আমার কাছে থেকে যেতে। কিন্তু এই চার্চে তোমাদের থাকার ফলে ভয়ানক প্রবলেম দেখা দেবে।'

'কেন ?'

'তোমাদের ব্যাপারটা এখন আর সামাজিক লেভেলে নেই, পলিটিক্যাল লেভেলে পেঁছে গেছে। শুনেছি, এখানকার ব্রাহ্মণ কমিউনিটির লীডাররা মন্ত্রী-টন্ত্রীদের এনে মীটিং করবে, যাতে ইণ্টার-কাস্ট ম্যারেজ আর না ঘটতে পারে তার চেষ্টা করবে। এরা যদি জানতে পারে এখানে তোমরা আশ্রয় পেয়েছ, নিশ্চয়ই হৈচৈ বাধিয়ে দেবে। বলবে চার্চ ব্রাহ্মণদের পেছনে লেগেছে।'

অর্জুন চুপ ক'রে থাকে। তার চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। অর্জুনের ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল, যতদিন অন্য কোনো ব্যবস্থা না হয় রেভারেণ্ড টিরকের কাছে থাকতে পারবে। কিন্তু তিনি যা বললেন, এরপর কাল থেকেই নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য অচ্ছুতটোলায় কমলার মা-বাপের কাছে গিয়ে থাকা যায় কিন্তু তাতে তাদের বিপন্ন করা হবে। তা ছাড়া, তার ভেতরকার সব সংস্কার এখনও একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি। গাঙ্গোতাদের শিক্ষিত সুন্দরী রুচিশীলা মেয়েকে বিয়ে করা এক কথা, আর অচ্ছুতটোলার নোংরা কুৎসিত পরিবেশে গিয়ে থাকা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

রেভারেণ্ড টিরকে বলেন, 'মানুষের সেবার জন্য এই গীর্জা। আমাদের আদর্শ হলো, সারভিস টু দা সাফারিং হিউম্যানিটি।

আমি এর সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে চাই না। তোমরা এখানে দু-চারদিন থেকে বাড়ি খুঁজে নাও। তোমাদের অন্য যে সাহায্য দরকার, সব পাবে। অনেক রাত হয়েছে, যাও, এবার শুয়ে পড়।'

কমলা এবং অর্জুন ভেতরের একটা ঘরে গিয়ে শোয় বটে, বাকি রাতটুকু এক মুহূর্তের জন্য ঘুমোতে পারে না।

চার্চে থাকলে রেভারেণ্ড টিরকেকে বিব্রত এবং বিপন্ন করা হবে, কাজেই কাল থেকে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু এই ছোট শহরে তাদের বিয়ের ব্যাপারটা এত বেশি জানাজানি হয়ে গেছে যে কেউ বাড়ি ভাড়া দেবে না। তা হ'লে কমলাকে নিয়ে কোথায় যাবে সে? ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে হঠাৎ বিজয়ের কথা মনে পড়ে যায়। একমাত্র বিজয়ই তাদের জন্য হয়ত কিছু করতে পারে।

পরদিন, তখনও ভাল ক'রে ভোর হয়নি, আকাশের গায়ে আবছা অন্ধকার লেগে আছে—অর্জুন উঠে জামা কাপড় পালটাতে থাকে।

কমলা জেগেই ছিল। সে একটু অবাক হয়েই বলে, 'তুমি কি বেরুচ্ছ?'

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

কোথায় যাবে?'

'ফিরে এসে বলব।'

কমলা আর কোনো প্রশ্ন করে না।

চার্চ থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতেই অর্জুন দেখতে পায়, নমকপুরা টাউন গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। কবচিৎ দু-একটা বয়েল কি ভৈসা গাড়ি নিচে লণ্ঠন ঝুলিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। মনে হয় না তাদের বিন্দুমাত্র তাড়া আছে। পৃথিবীর সবটুকু ঘুম এখনও যেন গাড়িগুলোর ওপর ভর করে রয়েছে।

বিজয়ের বাড়িতে আগে আর কখনও যায়নি অর্জুন। তবে

ঠিকানাটা জানা আছে। নমকপুরা টাউনের পশ্চিম দিকে নয়া মহল্লায় বিজয় থাকে।

অর্জুন যখন সেখানে এসে পৌঁছয়, বিজয় ঘুমোচ্ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর তার সাড়া মেলে, 'কৌন ?'

অর্জুন বলে, 'আমি অর্জুন—'

একটু পর দরজা খুলে বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিজয়। তারপর ঘুমজড়ানো গলায় বলে, 'তুমি—তুমি এত ভোরে !'

'আমার খুব বিপদ বিজয়। তোমার সাহায্য না পেলে কমলা আর আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব।'

অর্জুনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে বিজয়। ঘুমের রেশটুকু মুহূর্তে ছুটে যায়। শশব্যস্তে অর্জুনকে ভেতরে নিয়ে বসায় সে। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ?'

কাল বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে সব জানিয়ে অর্জুন বলে, 'এখন আমি কী করব ?'

এক মুহূর্তও ভাবে না বিজয়, দ্বিধাহীন গলায় বলে, 'কী আবার করবে। এক্ষুণি চার্চে গিয়ে কমলাকে নিয়ে এসো। মালপত্র বেশি এনো না। দু-চারটে জামাকাপড়, মতলব, যা না হ'লেই নয়, সেটুকুই শুধু আনবে।'

'লেকেন—'

'কী ?'

'তোমার এখানে তো একটা মোটে ঘর। তিন জন থাকব কী করে ?'

বিজয় জানায়, দিনের বেলা কোনো সমস্যা নেই, রাত্তিরে অর্জুন এবং কমলা এই ঘরে থাকবে। আর পেছনের ঢাকা বারান্দায় বিজয় শোবে।

অর্জুন বিব্রত মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বিজয় বলে, 'কোনো কথা নয়। তবে একটা ব্যাপারে হোঁশিয়ার থাকতে হবে।'

'কী ব্যাপার ?'

'আমার বাড়ির মালিক কায়াথ। জাতপাতের সওয়ালে ভীষণ অর্থোডক্স। সে যদি জানতে পারে তোমরা এখানে এসে আছ, বহুত ঝামেলা বাধিয়ে দেবে।'

'তা হ'লে ?' হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে যায় অর্জুনের। যা-ও একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে, সেখানেও স্বাভাবিকভাবে নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না।

তার কাঁধে একটা হাত রেখে বিজয় বলে, 'আমার এখানে না এসে অন্য কোথাও যদি যাও একই অবস্থা হবে। আমাদের এই ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট সোসাইটি সব সংস্কার কাটিয়ে খুব সহজে তো তোমাদের মেনে নেবে না। তার জন্যে ধৈর্য আর সাহস চাই। চাই ফাইটিং স্পিরিট। যাও, তুরন্ত চার্চ থেকে কম্‌লাকে নিয়ে এসো। এ বাড়ির কেউ জেগে ওঠার আগেই ফিরে আসবে।'

'লেকেন আরেকটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে।'

'কী ?'

'আমরা তো সব সময় ঘরে বসে থাকব না। অফিসে বেরুতে হবে। তখন কম্‌লার কী হবে ?'

'একদিক থেকে বাঁচোয়া, আমার ঘর বাইরের দিকে। ভেতরের লোকজন তেমন কেউ এখানে আসে না। অফিসে বেরুবার সময় কম্‌লাকে তালা দিয়ে রেখে যাব। ঘরে কে আছে, বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না।'

'এভাবে কতদিন চলবে ?'

'দেখা যাক। তুমি আর দেরি করো না।'

অর্জুন আর কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে।

॥ দশ ॥

এই গ্রহের তুমুল হৈচৈ এবং ফেনায়িত উত্তেজনা থেকে অনেক দূরে শান্ত নিস্তরঙ্গ নগণ্য নমকপুরা টাউনের ওপর দিয়ে এর পরের দশটা দিন একেবারে ঝড় বয়ে যায়।

এর মধ্যে মান্ধাতারা চক বাজারের সামনের মাঠে পাটনা থেকে দু'জন মন্ত্রী, তিনজন এম. পি এবং স্থানীয় এম. এল. এ'কে নিয়ে এসে পর পর দু দিন মিটিং করেছে। গোটা নমকপুরা দু দিনই মিটিংয়ে ভেঙে পড়েছিল। মন্ত্রী এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা জানিয়ে গেছেন, সরকার যদিও সামাজিক সংস্কার এবং পারস্পরিক বৈষম্য দূর করার জন্য ইণ্টার-কাস্ট ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল বিয়েতে উৎসাহ দিতে চাইছেন, তবু এর ফলে কোনো সম্প্রদায় বা জাতির মনে যদি আঘাত লাগে, জোর ক'রে কিছু করা হবে না। জবরদস্তিতে ভাল কিছু হয় না। তার ফল অশুভ এবং ক্ষতিকর হয়ে থাকে। 'দিলসে' মেনে না নিলে চিরাচরিত নিয়মে যা চলেছে তাই চলবে। অর্থাৎ কয়েক দিন আগে অর্জুন আর কমলার বিয়ে নিয়ে এখানে যা হয়ে গেছে, নরম ক'রে এঁরা তাঁর উলটোটাই বলে গেলেন।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর যে ব্যাপারটি এই দশ দিনে এখানে ঘটেছে তা হলো চন্দ্রকান্তর ট্রান্সফার, তাঁকে মতিহারিতে বদলি করা হয়েছে। এখানে থেকে যাবার জন্য দু'বার পাটনায় গিয়ে অনেককে ধরাধরি করেছিলেন চন্দ্রকান্ত কিন্তু বৃথাই তাঁর আবেদন নিবেদন। অথরিটির এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত চলে যেতে না যেতেই নতুন এস. ডি. ও মহেশ্বর ত্রিবেদী এই সাব-ডিভিশনের দায়িত্ব নিয়ে নমকপুরায় এসে হাজির হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, লোকটি অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং কট্টর ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট।

অর্থাৎ মান্ধাতা এবং এখানকার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি যা যা চেয়েছিল হুবহু তাই ঘটেছে। শহরের বাসিন্দাদের ধারণা, অর্জুন অচ্ছুতের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে যে প্রচণ্ড তোলপাড় হ'য়ে গিয়েছিল, এরপর এমন হঠকারী ঘটনা আর ঘটবে না। নমকপুরা আবহমান কালের নিয়মে এবং স্থিতাবস্থায় আবার ফিরে আসবে।

এগার দিনের মাথায় আরো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। বিজয়ের বাড়িওয়ালা নৈটেয়ার সহায়ের কাছে অর্জুনরা ধরা পড়ে যায়। অচ্ছুতের মেয়েকে ঢুকিয়ে এ বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করার কারণে লোকটা এমন চেঁচায়, মনে হয়, মাথার শিরা ছিঁড়ে এই মুহূর্তে তার দেহান্ত ঘটে যাবে।

একটানা চিৎকারের দরুন ক্লান্ত হ'য়ে খানিকক্ষণ হাঁপায় নৈটেয়ার। তারপর আলটিমেটাম দেবার ভঙ্গিতে জানায়, অর্জুন আর কমলাকে এখনই তাড়িয়ে না দিলে বিজয়কেও এ বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না।

বিজয় অবিচলিত মুখে বলে, 'অত হল্লা করবেন না। ওরা চলে যাচ্ছে।'

ঘরে তালা লাগিয়ে তিনজন রাস্তায় নামে।

অর্জুন বলে, 'এবার?'

বিজয় বলে, 'দেখা যাক কী করা যায়।'

এরপর একটা টাঙ্গা নিয়ে তারা নমকপুরার পুরানা মহল্লা বাদে প্রায় প্রতিটি টৌলির প্রতিটি বাড়িতে হানা দেয়, যদি কোথাও ঘরভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে চারিদিকে এত রটে গেছে যে সবাই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

ক্লান্ত উৎকণ্ঠিত অর্জুনরা শেষ পর্যন্ত এস. ডি. ও'র বাংলোয় মহেশ্বর ত্রিবেদীর কাছে চলে আসে। সব কিছু জানিয়ে হাতজোড় ক'রে কোথাও একটা বাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিতে বলে।

মহেশ্বর বলেন, 'বহুত দুখকা বাত। লেকেন আমার কিছু করণীয় নেই।'

অর্জুন বলে, 'আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। তবে কেন আমাদের এ শহরে কেউ ঘরভাড়া দেবে না? সরকারই তো কানুন বানিয়েছে, যদি কেউ অচ্ছুতের মেয়ে সাদি করে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মহেশ্বর বলেন, 'সরকার কানুনের বাইরে কিছু করেনি তো। আমি যদিও এখানে নতুন এসেছি, তবু খবর পেয়েছি, সরকার আপনাদের সাদিতে মদত দিয়েছে, আপনাকে ভাল নৌকরি দিয়েছে, পাঁচ হাজার টাকা নগদও দিয়েছে। লেকেন ঘর খুঁজে দেবার দায় তো তার নয়। তবে হ্যাঁ—'

অর্জুনরা ভয়ানক দমে গিয়েছিল। তবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

মহেশ্বর বলেন, 'কেউ যদি আপনাদের ওপর উৎপাত করে আমাকে জানাবেন, সিকিউরিটির সবরকম বন্দোবস্ত করব।'

এরপর বলার কিছু থাকে না।

এস. ডি. ও'র বাংলো থেকে বেরিয়ে বিজয় বলে, 'আগেই ভেবেছিলাম, লোকটা তোমাদের জন্যে একটা আঙুলও তুলবে না। মান্ধাতাদের ও কোনোমতেই চটাবে না। নেহাত সরকারি নৌকরি করে, কিছু অসুবিধা আছে। নইলে ওর বাংলোয় আমাদের ঢুকতেই দিত না।'

অর্জুন তার কথা প্রায় কিছুই শুনছিল না। চাঁই চাঁই পাথরের মতো অসীম দুর্ভাবনা তার মস্তিষ্কে প্রবল চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলে, 'সব তো দেখা হলো। এবার কী করতে চাও?'

'এখন চার্চে যাওয়া যাক।'

'সেই ভাল। রেভারেন্ড টিরকেকে ব'লে আজ ওখানে থাকব। তারপর কাল যা করার করব।'

'কী করতে চাইছ?'

বিয়ের পর থেকে যে অর্জুন চারিদিকের চাপে প্রচণ্ড দিশেহারা

এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে আছে, হঠাৎ সে যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। তার মুখে কাঠিন্য ফুটে বেরোয়। দৃঢ় গলায় বলে, 'এখন কিছু বুঝতে পারছি না। তবে কিছু একটা করতে হবে। তুমি কাল সকালে একবার আসতে পারবে?'

'পারব।'

॥ এগার ॥

সেদিন রামঅবতার বাড়ি থেকে বার ক'রে দিলে রেভারেণ্ড টিরকের বাংলোয় এসে সারারাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিল অর্জুনরা। আজও তাদের চোখে ঘুম এল না।

মাঝ রাত পর্যন্ত বিছানায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছটফট করতে করতে হঠাৎ অর্জুনের মাথায় বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। এক টানে নিজেকে তুলে বিছানায় বসিয়ে দেয় সে। ভেতরে ভেতরে মারাত্মক উত্তেজনা বোধ করতে করতে ডাকে, 'কম্‌লা—কম্‌লা—'

কম্‌লা আস্তে আস্তে উঠে বসে। বলে 'কী বলছ?'

'এখানে পুরনো খবরের কাগজ নিশ্চয়ই আছে?'

কম্‌লা রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। তারপর বলে, 'আছে। কেন?'

অর্জুন ব্যস্তভাবে বলে, 'কয়েকটা নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে কালি, এক টুকরো কাপড় আর মোটা কাঠিও আনবে।'

বিমূঢ়ের মতো স্বামীর দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে যায় কম্‌লা, কিছুক্ষণ পর কাগজ-টাগজ নিয়ে ফিরে আসে।

দ্রুত কাপড়ের টুকরো কলমের পেছন দিকে জড়িয়ে তুলি বানিয়ে ফেলে অর্জুন। তারপর মেঝেতে পুরনো কাগজগুলো পেতে পোস্টার লিখতে বসে।

'সরকারকা ন্যায় বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'সমাজকা ন্যায় বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'হামলোগোকা—'

'সাহারা দো—'

'হামলোগ—'

'বঁচনা চাহ্‌তা হ্যায়।'

স্লোগানগুলো লক্ষ্য করতে করতে কম্‌লা জিজ্ঞেস করে, 'এসব লিখে কী হবে?'

অর্জুন বলে, 'কাল দেখতে পাবে।'

কথামতো পরদিন সকালে বিজয় রেভারেণ্ড টিরকের বাংলোয় চলে আসে। পোস্টার দেখে বলে, 'এগুলো দিয়ে কী করবে?'

অর্জুন এবার তার পরিকল্পনাটা জানিয়ে দেয়। এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে পোস্টারগুলো টাঙিয়ে দিয়ে সে আর কম্‌লা যতদিন না কোনো প্রতিকার হচ্ছে, বসে থাকবে। আসলে তাদের ওপর সামাজিক এবং প্রশাসনিক যে অবিচার আর লাঞ্ছনা চলছে, এভাবে বিদ্রোহ জানিয়ে তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। এ ছাড়া আপাতত তাদের অন্য কোনো পদ্ধতি জানা নেই।

উৎসাহে উত্তেজনায় বিজয়ের চোখ ঝকঝক করতে থাকে। সে বলে, 'ভেরি গুড আইডিয়া। কবে থেকে শুরু করতে চাও?'

'আজ থেকেই।'

'ঠিক আছে, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। আর সাহারসা পূর্ণিয়ায় আমাদের সংস্থানের মেম্বারদের খবর পাঠাচ্ছি। তারা যে ক'জন পারে যেন চলে আসে—'

হঠাৎ পত্রকার সুরেশ পাণ্ডের কথা মনে পড়ে যায় অর্জুনের। তার বিয়ের পর সে পত্রিকার 'স্টোরি' করার জন্য সুদূর পাটনা

থেকে ছুটে এসেছিল। জাত-পাত ভেঙে বিয়ে করা এবং সোসাইটিকে প্রগতির দিকে এক কদম এগিয়ে দেবার কারণে প্রচুর, অভিনন্দন জানিয়ে সে বলেছিল, কোনোরকম প্রয়োজন হ'লে অর্জুন যেন তাকে চিঠি লেখে। চিঠি পাওয়ামাত্র সে চলে আসবে। অর্জুন বলে, 'এখানে যদি একটা টেলিগ্রাম করে দাও ভাল হয়।' ব'লে সুরেশের ঠিকানা লিখে দেয়।

'জরুর।'

সেদিনই দুপুর থেকে নমকপুরার মানুষজন দেখতে পায়, এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর উলটোদিকে পোস্টার টাঙিয়ে অর্জুন বিজয় আর কম্‌লা বসে আছে।

বাকি দিন এবং রাতটা এইভাবেই কেটে যায়। এর মধ্যে মহেশ্বর ত্রিবেদীকে একবার বাংলোয় ঢুকতে এবং একবার বেরুতে দেখা গেছে। রাস্তার উলটোদিকে তাকিয়ে তিনি যথেষ্ট বিরক্ত, চোখমুখ দু'বারই তাঁর কুঁচকে গেছে।

রাস্তার লোকজনেরা কেউ কোনো মন্তব্য করেনি, শুধু কৌতূহলী চোখে তিনজনকে লক্ষ্য করেছে।

পরদিন বেলা একটু চড়লে অসীম উৎকন্ঠা নিয়ে কম্‌লার মা এবং বাপ নাথুনি আর জগলাল এসে নিঃশব্দে অর্জুনদের কাছে বসে পড়ে। তাদের সঙ্গে গাঙ্গোতাটোলার আরো কয়েকজন এসেছে। এতদিন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অর্জুনদের গোলমালটা চলছিল, কিন্তু এবার খোদ এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে প্রতিবাদ জানাতে বসে পড়েছে ওরা। সে জন্য খুবই ভয় পেয়ে গেছে জগলালেরা। হাজার হোক, ওরা তার মেয়ে জামাই। তাদের অনিষ্ট হোক, এটা তারা চিন্তাই করতে পারে না। যদি শেষ পর্যন্ত কোনো বিপদ আসে, ওরা অর্জুন এবং কম্‌লাকে বুক দিয়ে আগলে রাখবে।

দুপুরের দিকে সাহারসা আর পূর্ণিয়া থেকে বিজয়দের

সংস্থানের বেশ কিছু লোকজন এসে পড়ে। এসেই তারা স্লোগান দিতে শুরু করে ঃ

'সমাজকা ন্যায়বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'সরকারকো ন্যায়বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

বিকেলের দিকে পাটনা থেকে ঘুরতে ঘুরতে সুরেশ এসে হাজির। বিজয়ের টেলিগ্রাম পেঁছিবার আগেই সে এসে পড়েছে। তার আসার কারণ খানিকটা কৌতূহল এবং অনেকটা দুশ্চিন্তা। বিয়ের পর অর্জুনেরা কীভাবে আছে সেটা দেখার জন্য এবার তার আসা। আর এসেই এস. ডি. ও'র বাংলার সামনে তাদের পোস্টার নিয়ে বসে থাকতে দেখে সে-ও বসে পড়েছে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা স্লোগান চলতে থাকে। তার মধ্যে অচ্ছুতটোলা থেকে আরো অনেকেই এসে যায়। তারা সবাই গাঙ্গোতা না—দোসাদ ধাঙড় এবং কোয়েরিও রয়েছে। তবে উঁচু জাতের বামহন কায়াথরা কেউ আসেনি। হয়তো তারা এ জাতীয় প্রতিবাদে হকচকিয়ে গেছে এবং নতুন করে রণকৌশল তৈরি করছে।

সন্ধ্যের পর রাস্তার ওপারে ভিড় যখন আরো বেড়ে যায়, সেই সময় এস. ডি. ও'র বাংলো থেকে একজন আর্মড গার্ড এসে অর্জুন এবং কম্‌লাকে বলে, 'আপনাদের দু'জনকে এস ডি. ও সাহাব ডাকছেন।'

অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'স্রেফ আমাদের দু'জনকেই?'

'জি।'

'গেলে আমরা চারজন যাব।' বলে সুরেশ এবং বিজয়কে দেখিয়ে দেয় অর্জুন।

গার্ডটি বলে, 'হুকুম নেহী।' বলে রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ফের সেই কথাই বলে। অর্থাৎ এস ডি. ও সাহেব শুধুমাত্র অর্জুন আর কমলার সঙ্গেই দেখা করতে চান। কিন্তু অর্জুনকে টলানো যায় না।

বারকয়েক ছোটাছুটির পর শেষ পর্যন্ত গার্ডটি বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপনারা চারজনই আসুন।'

গার্ডের সঙ্গে বাংলোর ভেতর ঢুকে সোজা একতলার ড্রইং রুমে চলে আসে অর্জুনরা। মহেশ্বর ত্রিবেদী তাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখ থমথমে, গম্ভীর। তিনি বলেন, 'বাংলোর সামনে এ জাতীয় হল্লা আমি পছন্দ করি না।'

সুরেশ বলে, 'এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল কি?'

উত্তর না দিয়ে মহেশ্বর অর্জুনের উদ্দেশে বলেন, 'যাই হোক, কোনোরকম গোলমাল হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আশা করি অ্যাকসেপ্ট করবেন।'

অর্জুন বলে, 'প্রস্তাবটা না শুনে আমি কিছুই বলব না।'

'ঠিক আছে, শুনুন। আপনাদের জন্যে এখানকার পীস নষ্ট হচ্ছে। আপনাকে ধানবাদ পাটনা কিষেণগঞ্জ কাটিহার, যেখানে বলবেন ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করছি। সেখানে চলে যান। নতুন জায়গায় লোকে জানতেও পারবে না আপনার স্ত্রী গাঙ্গোতা।'

অর্জুনের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অসহ্য রাগে মাথার ভেতরটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সে বলে, 'আমি এখান থেকে যাব না। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর জাতও লুকিয়ে রাখতে চাই না। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমরা কোনোরকম অন্যায় করিনি।'

সুরেশ অর্জুনের ডান পাশে থেকে বলে ওঠে, 'আপনি কি জানেন আমি একজন পত্রকার?'

'জানি। খবর নিয়েছি।'

'অর্জুনকে যা বললেন সেই কথাগুলো কিন্তু আমাদের পত্রিকায়

ছাপা হবে। আমার ধারণা, ব্যাপারটা আপনার পক্ষে খুব হ্যাপি হবে না।'

রীতিমতো ঘাবড়ে যান মহেশ্বর। বলেন, 'এই জন্যেই আমি আপনাকে ডাকতে চাইনি। পত্রকারদের কাছে মুখ খোলা খুব বিপদ। আমাকে অর্জুনজির ওয়েল-উইশার ভাবতে পারেন। সেই জন্যেই অন্য জায়গায় বদলির কথা বলেছিলাম। যাক, এতে যখন আপনারা রাজী নন, বলুন আর কী করতে পারি ?'

সুরেশ বলে, 'সরকারের অনেক বাড়ি-টাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে অর্জুনদের থাকার ব্যবস্থা করে দিন।'

একটু চিন্তা ক'রে মহেশ্বর বলেন, 'পি. ডব্লু. ডি বাংলোর দু-একটা কামরা বোধ হয় খালি আছে। সেখানে ওরা এখন থাকুক। পরে কী করা যায় ভেবে দেখব।'

'ধন্যবাদ। আজই কিন্তু ওরা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় যাবে।'

'আচ্ছা।'

অর্জুন মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে। দূরমনস্কর মতো সে ভাবে, যুদ্ধের প্রথম পর্বটা আপাতত শেষ। কিন্তু মান্ধাতারা কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেবে না। হাজার বছরের সংস্কার এবং গোঁড়ামির এই পাহারাদারেরা অন্য রণকৌশল তৈরি ক'রে ফেলবে। নতুন আক্রমণের জন্য মনে মনে সে প্রস্তুত হ'য়ে যায়। কেননা সে জানে, এই যুদ্ধে সে একাই না, আরো অনেকেই তার পাশে আছে।

॥ বার ॥

নমকপুরা টাউনের উত্তর দিকের শেষ মাথায় পি. ডব্লু. ডি বাংলো। বিশাল কম্পাউন্ডের মাঝখানে টালির চালের পাকা বাড়ি। সব মিলিয়ে মোট ছ'খানা বিরাট বিরাট ঘর। বিশ ইঞ্চি পুরু দেওয়াল। বড় বড় জানালায় দুটো ক'রে পাল্লা—একটা

কাচের, অন্যটা কাঠের। তাছাড়া গ্রিল তো রয়েছেই। দরজা জানালায় দামী পর্দা। সীলিং থেকে চার ব্লেডের ঝকঝকে ফ্যান ঝুলছে।

সবগুলো ঘরই খাট, ড্রেসিং টেবল, ওয়ার্ডরোব ইত্যাদি নানা আসবাবে চমৎকার সাজানো। প্রতিটি কামরার গায়ে অ্যাটাচড্ বাথ। আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সবরকম উপকরণ এখানে মজুত।

এই ঘরগুলো ছাড়া রয়েছে একধারে কেয়ার টেকারের ছোট অফিস এবং বাংলোর সামনের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া লম্বা বারান্দা। সেখানে অনেকগুলো সোফা আর ছোট, নিচু টেবল সাজিয়ে রাখা আছে।

লম্বা বারান্দার তলা থেকে ফুলের বাগান। ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ঝাউ আর দেবদারু। বাগানের মাঝখান দিয়ে সুরকির রাস্তা। রাস্তাটা বাংলোর গেট পর্যন্ত চলে গেছে।

পেছন দিকে কেয়ার-টেকার এবং ক্লাস-ফোর স্টাফ কর্মীদের থাকার জন্য নানা মাপের টালির ঘর। পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘরগুলো ছোট বা বড়।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নতুন এস. ডি. ও মহেশ্বর ত্রিবেদী অর্জুন এবং কমলাকে একজন আর্মড গার্ডের সঙ্গে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পাঠিয়ে দেন। যাতে অর্জুনদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় সেজন্য একটা চিরকুট লিখে গার্ডের হাতে দিয়েছেন মহেশ্বর।

জগলাল নাথুনি এবং অচ্ছুতটোলার আরো দু'চারজন অর্জুনদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বিজয় আর সুরেশ এসেছে। যদিও একজন আর্মড গার্ড রয়েছে, তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি সুরেশরা। যেভাবে নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা খেপে আছে, রাস্তায় অর্জুনদের দেখলে হামলা করতে পারে।

তাছাড়া বাংলোয় অর্জুনরা কতটা নিরাপদ সেটাও হয়তো নিজেদের চোখে যাচাই করে নিতে চায় ওরা।

বাংলোয় পেঁছুতে পেঁছুতে ন'টা বেজে যায়। এত রাতে টাঙ্গা বা সাইকেল রিক্‌শা পাওয়া যায় নি। হেঁটেই আসতে হয়েছে সবাইকে।

সন্ধ্যের পর মাত্র অল্পক্ষণ নমকপুরা জেগে থাকে। তারপর গভীর ঘুমের আরকে ডুবে যায়।

এখন, এই রাত ন'টায় নমকপুরা টাউন যেন পুরোপুরি এক নিষুতিপুর। বেশির ভাগ বাড়িঘরের আলো নিভে গেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ দু-একটা গৈয়া গাড়ি বা মানুষ প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে এগিয়ে যাচ্ছে।

পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় একটা আলোও জ্বলছে না। চার পাশে চাপ চাপ অন্ধকার। কেয়ার-টেকার থেকে শুরু করে বেয়ারা মালী ঝাড়ুদার, সবাই নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে।

অনেক ডাকাডাকি এবং লোহার গেটে ধাক্কাধাক্কি করে আর্মড গার্ডটা কেয়ার-টেকার মালীটালীদের ঘুম ভাঙায়। ভেতর থেকে বিরক্ত জড়ানো গলা ভেসে আসে, 'কৌন রে, আধা রাতমে হল্লা মচাতা কৌন?'

আর্মড গার্ড বলে, 'বাহার আকে দেখো—কৌন। তুরন্ত আ—'

কিছুক্ষণ পর বারান্দা এবং বাগানের আলো জ্বলে ওঠে। দু-তিনটে লোক এলোমেলো পায়ে গেটের কাছে এসে একজন আর্মড গার্ডের সঙ্গে এতগুলো লোককে দেখে হকচাকিয়ে যায়।

সবার আগে যে গোলগাল মধ্যবয়সী লোকটি রয়েছে সে এই বাংলোর কেয়ার-টেকার। নাম জগন্নাথ সিং। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার, এত রাতে—' কথাটা শেষ না করে থেমে যায়।

আর্মড গার্ড বলে, 'আগে দরজা তো খুলুন। তারপর বলছি—'

গেটটা ভেতর থেকে তালাবন্ধ। মালীকে দিয়ে চাবি আনিয়ে তালাটা খুলে ফেলে জগন্নাথ। অর্জুনরা ভেতরে ঢুকে যায়।

আর্মড গার্ড মহেশ্বরের চিরকুটটা জগন্নাথকে দিয়ে বলে, 'এস. ডি. ও সাব এদের থাকার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।' সে অর্জুন এবং কমলাদের দেখিয়ে দেয়।

এস. ডি. ও'র নাম শুনে মুহূর্তে ঘুম ছুটে যায় জগন্নাথের। শশব্যস্তে চিরকুটে একবার চোখ বুলিয়ে অসীম কৌতূহলে অর্জুনদের দিকে তাকায় সে। বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জরুর। এখনই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।' বিজয় এবং সুরেশকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এঁরা ?'

আর্মড গার্ড জানায়, সুরেশরা অর্জুনদের বন্ধু। ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই সুরেশরা চলে যাবে।

'আইয়ে—'

সবাই জগন্নাথের সঙ্গে বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

বিজয় বলে, 'ওদের জন্যে একটা ভাল কামরা দেবেন।'

চলতে চলতে জগন্নাথের চোখ বার বার অর্জুনদের এবং কমলার ওপর এসে পড়ছিল। সে বলে, 'এখানকার সব কামরাই ভাল। তিনটি খালি আছে। দেখে যেটা আপনাদের পছন্দ হবে সেটাই পাবেন।'

বিজয় আর কিছু বলে না।

সুরেশ বলে, 'ওরা খেয়ে আসে নি। খাবার-টাবার কিছু পাওয়া যাবে ?'

'বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে এস ডি. ও সাহেব যখন পাঠিয়েছেন কুককে দিয়ে পুরী ভাজি করিয়ে দেবো. গেস্টদের নিশ্চয়ই ভুখা রাত কাটাতে হবে না।' বলে অর্জুনদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে জগন্নাথ।

বাংলোয় এসে তিনখানা খালি ঘরই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়। জগন্নাথ যা বলেছিল তা-ই। ঘরগুলো একই মাপের। আরামের দিক থেকেও হেরফের কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত পূব দিকের শেষ ঘরটা বেছে নেওয়া হয়। বিজয় অর্জুনদের বলে, 'সরাসরি অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। তোমরা রেস্ট নাও। আশা করি কেয়ার-টেকার সাহেব তাড়াতাড়িই তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। আমরা চলি।'

জগন্নাথ বলে, 'একটু বসে যান। কুককে চা করতে বলি।'

'না না, এত রাতে চায়ের ঝামেলা করতে হবে না অর্জুন আর কমলা তো রইলই। আমি রোজ একবার আসব। তখন চা খাওয়াবেন।'

জগন্নাথ বলে. 'ঠিক আছে।'

এরপর বিজয় সুরেশ এবং আর্মড গার্ডটি চলে যায়। বিজয় তার ভাড়া বাড়িতে ফিরবে। সুরেশ শহরের আর এক মাথায় ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের গেস্ট হাউসে উঠেছে। সে সেখানে যাবে। আর আর্মড গার্ডটি যাবে এস. ডি. ও'র বাংলোয়।

জগন্নাথও অর্জুনদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।• কুককে এখন কিচেনে পাঠাতে হবে।

সবাই চলে যাবার পর সোফায় বসে পড়ে অর্জুন এবং কমলা। সমস্ত দিন শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে! স্নায়ু টান টান করে সেই সকাল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল তাদের। অনিশ্চয়তা উত্তেজনা এবং সংশয়ের প্রচণ্ড চাপ আপাতত অনেকটাই কেটে গেছে। ফলে কষে-বাঁধা স্নায়ুগুলো হঠাৎ আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন। ভীষণ অবসাদ বোধ করে তারা।

আজ ক'দিন ধরে গরমও পড়েছে খুব। এত রাতেও উত্তপ্ত ঝড়ো বাতাস ছুটে যাচ্ছে। চারপাশের গাছপালার মাথায় ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ হচ্ছে সাঁই সাঁই।

ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, বাইরের বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ছে। অন্ধকারে কোনো একটা গাছ থেকে কামার পাখির কর্কশ চিৎকার ভেসে আসে। চরাচর জুড়ে

ঝিঁঝিদের শোকসভা বসে গেছে যেন। চারপাশে তাদের একটানা ক্লান্তিহীন বিলাপ বিষাদ ছড়িয়ে চলেছে।

একসময় কমলা বলে, 'চান না করলে ঘুমোতে পারব না। সারা গা ধুলোয় আর ঘামে চটচট করছে।' হঠাৎ কী মনে হ'তে একটু হতাশভাবেই আবার বলে ওঠে, 'এই যে, জামাকাপড় তো কিছুই আনা হয়নি। চান ক'রে কী পরব?'

এস. ডি. ও'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে একেবারে খালি হাত-পায়ে এই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় চলে এসেছিল অর্জুনরা। তাদের জিনিসপত্র সবই পড়ে আছে চার্চে, রেভারেণ্ড টিরেকের বাংলোয়।

অর্জুন বলে, 'আজ আর কাপড়-টাপড় বদলানো যাবে না।'

কমলা বলে, 'এই নোংরা চিটচিটে শাড়ি জামা পরে থাকব?'

অর্জুন আস্তে মাথা নাড়ে, 'তা ছাড়া উপায় কী?'

'কিন্তু চান করার পর গা-মাথা মুছব কী করে? গামছা কি তোয়ালে পাব কোথায়?'

কোনো দিন এ জাতীয় বাংলোয়, এত আরামের উপকরণের মধ্যে কাটায়নি অর্জুন বা কমলা। স্নান করার জন্য বাথরুমে সাবান থেকে শুরু ক'রে তোয়ালে শ্যাম্পু ইত্যাদি যে মজুত থাকে তা জানা ছিল না।

অর্জুন বলে, 'কেয়ার-টেকার এলে চেয়ে নেবো।'

কমলা বলে, 'আমার চোখ-মুখ জ্বালা করছে। এখন একটু জল দিয়ে আসি। পরে তোয়ালে-টোয়ালে পাওয়া গেলে চান করব।'

কমলা বাথরুমে ঢুকে সুইচ টিপে জোরালো আলোতে তোয়ালে সাবান-টাবান দেখে অবাক, এবং খুশিও। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অর্জুনকে বলে, 'এখানে সব কিছু আছে। কেয়ার-টেকারকে কিছু বলতে হবে না।' তারপরেই দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দেয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে জগন্নাথ এবং একটা অল্প বয়সী বেয়ারা এই কামরায় এসে ঢোকে। বেয়ারার হাতে মস্ত অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে। সেটায় নানা রকমের প্লেটে গরম চাপাটি, ডাল, দু রকমের তরকারি, পাঁপড়, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, জলের গেলাস ইত্যাদি সাজানো।

স্নান করে কম্‌লা এবং অর্জুন সোফায় বসে আজকের সমস্ত দিনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। জগন্নাথদের দেখে অর্জুন বলে, 'আসুন—'

জগন্নাথ বেয়ারাকে অর্জুনদের সামনের সেণ্টার টেবল দেখিয়ে বলে, 'এখানে খানা দিয়ে তুই চলে যা! নজদিগ থাকিস, ডাকলেই তুরন্ত চলে আসবি।'

'জি—' বেয়ারা খাবার দিয়ে চলে যায়।

জগন্নাথ অর্জুনদের দিকে ফিরে বলে, 'খেয়ে নিন। আমি আপনাদের কাছে বসছি।'

বিব্রতভাবে অর্জুন বলে, 'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আচানক চলে এসে অনেক জ্বালাতন করেছি। দয়া ক'রে আপনি শুতে চলে যান। আমাদের আর কিছু দরকার নেই।'

'তাই কখনো হয়। আপনারা আমার গেস্ট, তার ওপর খোদ এস. ডি. ও সাহেব পাঠিয়েছেন।' বলতে বলতে একটা সোফায় বসে পড়ে জগন্নাথ।

এত খাতিরদারি যে এস. ডি. ও মহেশ্বরপ্রসাদের কারণে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না অর্জুন বা কম্‌লার। বোঝা যায়, তাদের আপ্যায়নের ব্যাপারে কোনোরকম ত্রুটি ঘটতে দেবে না জগন্নাথ। হাজার অনুরোধ করলেও এখান থেকে তাকে এখন নড়ানো যাবে না।

এভাবে খাতির করার জন্য কেউ ঘাড়ের ওপর বসে থাকলে, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার কথা নয়। তাছাড়া এতে অভ্যস্তও নয় অর্জুনরা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তারা চুপচাপ খেতে থাকে।

অর্জুনদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল জগন্নাথ। আবহাওয়াটাকে সহজ করার জন্য সে একতরফা বকে যায়।

'আপনাদের কথা অনেক শুনেছি।' বা 'এই ছোটামোটা টাউনে আপনারা একেবারে রেভোলিউসান ঘটিয়ে দিয়েছেন।' বা 'আমার বহুত সৌভাগ যে আপনাদের মতো মেহমান এখানে পেলাম।' বা 'ইণ্ডিয়াতে আপনারা একটা গ্রেট একজ্যাম্পল সেট করে দিলেন।' কিংবা 'কত বছর কাণ্ট্রি স্বাধীন হয়েছে, লেকেন প্রগতি উগতি কিছুই হচ্ছিল না। সোসাইটি সেই পুরানা কুয়ার মধ্যে মুখ গুঁজে ছিল। আপনারা সেখানে নয়া স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।' ইত্যাদি।

জগন্নাথের কথা শুনতে শুনতে অর্জুনের মনে হচ্ছিল, লোকটা খুবই সংস্কারমুক্ত, এতদিনে একটা ভাল আশ্রয় পাওয়া গেছে। ক্রমশ অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে আসতে থাকে অর্জুনদের।

জগন্নাথ একসময় বলে, 'কে যেন বলছিল, আপনাদের নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছে।'

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ। বুঝতেই তো পারেন।'

'একেবারে ঘাবড়াবেন না। রেভোলিউসান ঘটালে প্রথম প্রথম একটু ঝঞ্ঝাট হয়। দু-চার দিন, বড়জোর দু-এক সাল। তারপর দেখবেন সবাই আপনাদের মেনে নিয়েছে। মাঝখানের সময়টাই যা কিছু কষ্ট।'

আধফোটা গলায় কী যেন উত্তর দেয় অর্জুন, বোঝা যায় না।

একটু চুপচাপ।

তারপর জগন্নাথ বলে, 'আজ রাতে আপনাদের বিরক্ত করব না। কাল রেজিস্টার বুকটা এনে আপনার সিগনেচার নিয়ে যাব।'

বেশ অবাক হয়েই জগন্নাথের দিকে তাকায় অর্জুন। জিজ্ঞেস করে, 'কিসের সিগনেচার?'

জগন্নাথ বুঝিয়ে দেয়, এই বাংলোতে কোত্থেকে কারা আসছে, ক'দিন কী উদ্দেশ্যে থাকছে তার রেকর্ড রাখা হয়। কেননা বাজে লোক এসে যদি কোনোরকম দুষ্কর্ম ক'রে ফেলে, পরে তাদের ধরার জন্য এই রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে খুঁটি-নাটি সব লিখে নিয়ে তার তলায় গেস্টদের সই করিয়ে নেওয়া হয়।

অর্জুন বলে, 'ও আচ্ছা—'

কথা বলতে বলতে অর্জুনদের খাওয়ার দিকে নজর রাখছিল জগন্নাথ। বলে, 'আর দু'খানা চাপাটি দিয়ে যাক।'

অর্জুন এবং কমলা একসঙ্গে জানায়, তাদের পেট ভরে গেছে, আর কিছু দরকার নেই।

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক।'

খাওয়া হয়ে গেলে বেয়ারাকে প্লেট গেলাস ইত্যাদি তুলে নিয়ে যেতে বলে জগন্নাথ। বেয়ারা এঁটো বাসন ট্রে-তে তুলে টেবল পরিষ্কার ক'রে চলে যায়।

জগন্নাথ সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলে, 'আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে।'

কেয়ার-টেকার লোকটির সহৃদয়তা সৌজন্য এবং মধুর ব্যবহার খুব ভাল লেগে যায় অর্জুনদের। আন্তরিকভাবেই সে বলে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখানে আসার আগে খুব ভয় হচ্ছিল, না জানি কী ব্যবহার পাব। আপনাকে দেখে খুব ভরসা পাচ্ছি।'

জগন্নাথ বলে, 'চিন্তা নেহ'ী করনা। আমি আপনাদের কথা সব শুনেছি। আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব প্রোটেকসান পাবেন।'

অর্জুন আর কিছু বলে না। গভীর কৃতজ্ঞতায় জগন্নাথের দুই হাত জড়িয়ে ধরে।

একটু পর বিদায় নিয়ে চলে যায় জগন্নাথ। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে কমলাকে বলে, 'অনেক রাত হ'ল। চল, শুয়ে পড়া যাক। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

জানলার ধার ঘেঁষে ডবল-বেড নিচু খাটে ধবধবে বিছানা। পায়ের দিকে মশারি এবং গায়ে দেবার পাতলা চাদর রয়েছে।

কমলা দ্রুত খাটের ছত্রিতে মশারি খাটিয়ে চারপাশে ডানলোপিলোর গদির তলায় ভাল ক'রে গুঁজে দেয়। তারপর দু'জনে বিছানায় ঢুকে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে।

অর্জুন হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই ঘরটা অন্ধকারে ডুবে যায়। মাথার দিকের জোড়া জানালার পাল্লা দুটো খোলা। তার ভেতর দিয়ে আকাশের অনেকখানি চোখে পড়ে। তারার বুটি-বসানো অন্ধকারের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ এক কোণে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সেটা থেকে যে আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে চরাচরের ওপর নেমে আসছে তাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। যতদূর চোখ যায়, গাছপালা শস্যক্ষেত্র—সবই ঝাপসা এবং রহস্যময়।

এখন রীতিমত গরম পড়ে গেছে। তবু মধ্যরাতে এই অঞ্চলে অল্প অল্প কুয়াশা পড়ে। মিহি সিল্কের মতো হিম দূরে আবছা একটা পোচ টেনে দিয়েছে।

অর্জুন ভেবেছিল শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। জানালার বাইরে তাকিয়ে এই ক'দিনের যাবতীয় ঘটনার কথাই বুঝিবা ভাবছিল সে। হঠাৎ একটি কোমল হাত তার কাঁধে এসে পড়ে। খুব নরম গলায় কমলা বলে, 'জেগে আছ?'

'হ্যাঁ।' কমলার হাতটা জড়িয়ে ধরে অর্জুন বলে।

কমলা বলে, 'আমার জন্য তোমার এত কষ্ট—'

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই অর্জুন বলে ওঠে, 'না না, কোনো কষ্ট নেই।' প্রগাঢ় আবেগে বুকের ভেতর কমলাকে টেনে নিয়ে আসে অর্জুন। একটু পর পাতলা উষ্ণ উন্মুখ দুটি ঠোঁট তার মুখের ভেতর যেন গলে যেতে থাকে।

॥ তের ॥

পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় অর্জুনদের যখন ঘুম ভাঙল তখনও রোদ ওঠেনি। দূরে ফসলের মাঠগুলোর ওপর এবং গাছপালার মাথায় কুয়াশার আবছা একটি রেখা আটকে আছে।

বাংলোর মানুষজন কেউ উঠেছে বলে মনে হয় না। তবে

সামনের বাগানে পাখিদের ঘুম অনেক আগেই ভেঙে গেছে। তারা এখন খাদ্যের খোঁজে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে যায় অর্জুন। দ্রুত মুখটুখ ধুয়ে ফিরে এসে কমলাকে বলে, 'আমি চার্চ থেকে সুটকেশ-টুটকেশগুলো নিয়ে আসি।'

দু'দিনের বাসি ময়লা জামাকাপড় তাদের পরনে। ওগুলো আজ না ছাড়লেই নয়। ভীষণ গা ঘিনঘিন করছে।

কমলা বলে, 'তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

মাথা হেলিয়ে বেরিয়ে যায় অর্জুন। বাইরের টানা বারান্দায় আসতে চোখে পড়ে সবগুলো কামরাই বন্ধ। শুধু বাগানে মালীটা লম্বা হাতাওলা ঢাউস কাঁচি দিয়ে গাছের পুরনো ডালাপালা আর পোকায়-কাটা মরা পাতা ছেঁটে দিচ্ছে।

অর্জুন সিঁড়ি দিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে আসে। দূর থেকে সে দেখতে পায়, গেটের তালা ভেতর থেকে বন্ধ। কাল রাত্তিরে লক্ষ করেছিল গেটের চাবি মালীর হেফাজতে থাকে।

এত ভোরে অর্জুনকে দেখে একটু অবাকই হয়ে যায় মালী। বুঝতে পারে কোনো প্রয়োজনে সে বাংলোর বাইরে যেতে চায়। মালী জানে, এস ডি. ও অর্জুনদের এখানে পাঠিয়েছেন। নিজের চোখে কেয়ার-টেকার জগন্নাথ লালকে কাল রাতে ওদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করতে দেখেছে সে। কাজেই এই সরকারি মেহমানকে তারও খাতিরদারি করা উচিত। শশব্যস্তে মালী কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'তালা খুলে দেব সাব?'

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

দৌড়ে চাবির থোকা নিয়ে এসে গেট খুলে দেয় মালী। বাইরের রাস্তায় চলে আসে অর্জুন।

এই ভোরবেলায় রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। গাড়িঘোড়াও কিছু চোখে পড়ছে না। নমকপুরা টাউন ঘুমের আরকে এখনও ডুবে আছে।

চার্চ এখান থেকে অনেকটা দূরে। অর্জুন ভেবেছিল, রিকশা বা টাঙ্গা নিয়ে সেখানে চলে যাবে কিন্তু এখন হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

অর্জুন যখন চার্চে পেঁছয়, বেশ রোদ উঠে গেছে।

রেভারেণ্ড টিরকেকে তাঁর ছোট বাংলোটিতেই পাওয়া যায়। দু'দিনের বাসি ডাক এডিসানের খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অর্জুনকে দেখে খুব খুশি হলেন। তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ ক'রে টেবলে রেখে বলেন, 'বসো, বসো—'

অর্জুন তাঁর মুখোমুখি বসে পড়ে।

গলার স্বর উঁচুতে তুলে কাজের মেয়ে মঙ্গলাকে দু কাপ কফি দিয়ে যেতে বলেন রেভারেণ্ড টিরকে। তারপর ফের অর্জুনের দিকে তাকান, 'আমি তোমাদের সব খবর পেয়েছি। কাল রাত্তিরে একটা জরুরি কাজে আটকে গেলাম, তাই আর পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় যেতে পারিনি। আজ বিকেলে একবার যাব।'

অর্জুন বলে, 'আসবেন।'

একটু চিন্তা করে রেভারেন্ড টিরকে এবার জিজ্ঞেস করেন, 'বাংলোর লোকজনেরা তোমাকে কী রকম রিসিভ করল?'

'ভাল, খুব ভাল।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এ ক'দিন তোমাদের ওপর দিয়ে কী ধকলটা না গেল! এগুলো সিম্পল টরচার।'

অর্জুন উত্তর দেয় না।

রেভারেণ্ড টিরকে এবার বলেন, 'গভর্নমেণ্ট থেকে যখন তোমাদের শেলটার দিয়েছে, আর ভয় নেই। আমার মনে হয়, এখন তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

অর্জুন এবারও কিছু বলে না।

রেভারেণ্ড টিরকে থামেননি, তিনি সমানে বলে যান, 'শেষ পর্যন্ত তোমরা যে জিতলে সেটা সাহসের জন্য। এই ফাইটিং

স্পিরিটটা বজায় রাখা দরকার।' একটু থেমে আবার বলেন, 'বেশির ভাগ মানুষেরই মেরুদণ্ডের জোর থাকে না। খানিকটা লড়াই করার পর ভয় পেয়ে সেরেণ্ডার করে। যাক, অফিসে যাচ্ছ তো?'

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, সুটকেশ বাস্কেট ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অর্জুন। ফেরার সময় অবশ্য হেঁটে যেতে হয় না। রিকশা টাঙ্গা ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় ছোটাছুটি করছে। একটা টাঙ্গা ডেকে সে উঠে পড়ে।

পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় ফিরে অর্জুন দেখতে পায়, এখানকার সবাই জেগে উঠেছে। মালীটা বাগানে সকালে গাছের মরা পাতা আর ডাল ছাঁটছিল, এখন মাটি থেকে গোড়াসুদ্ধ আগাছা তুলে ফেলছে। লোকটা আর যাই হোক, ফাঁকিবাজ নয়।

অর্জুনরা আসার আগে তিনটে ঘরে গেস্ট ছিল। কাল রাতে তাদের চোখে পড়েছে, কামরা বন্ধ করে গেস্টরা ঘুমোচ্ছে। আজ অবশ্য তাদের ঘরগুলো খোলা, তবে লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় সবাই ভেতরে আছে, শুধু তাদের দরজার পর্দাগুলো দমকা হাওয়ায় উড়ছে।

আর দেখা গেল ঝাড়ুদারনী এবং কাল রাতের সেই বেয়ারাটাকে। ঝাড়ুদারনী লম্বা ঝাঁটা দিয়ে কমপাউণ্ডের ভেতরকার রাস্তা সাফ করছে আর বেয়ারাটা ব্যস্তভাবে কিচেন থেকে ট্রে-তে খাবার-দাবার এবং চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে গেস্টদের কামরায় কামরায় ছোটাছুটি করছে। এ ছাড়া আপাতত আর কাউকে দেখা গেল না।

টাঙ্গাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে সুটকেশ আর বাস্কেট নিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে আসে অর্জুন। বাগানের ভেতরকার রাস্তা দিয়ে সে যখন বাংলোর দিকে যাচ্ছে, আগাছা বাছা স্থগিত রেখে সসম্ভ্রমে মালীটা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে মুখে

কিছু বলে না। ঝাড়ুদারনী এবং বেয়ারাটাও কয়েক পলক তাকে লক্ষ্য করে।

অর্জুন মালী বা ঝাড়ুদারনীর দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসে শুধু। একসময় সিঁড়ি বেয়ে বাংলোয় উঠতেই দেখতে পায়, দূরে কেয়ার-টেকার জগন্নাথ তার নিজস্ব অফিসটিতে বসে টেবলের ওপর ঝুঁকে কী সব লেখালিখি করছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় জগন্নাথ। পরক্ষণে কাগজপত্র পেপার-ওয়েটের তলায় চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জগন্নাথ বলে, 'আপনার কামরায় দু'বার গিয়েছিলাম। শুনলাম খুব সুবেহ্ সুবেহ্ বেরিয়ে গেছেন।' তারপর হাতের সুটকেশ-টুটকেশ লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করে, 'মালপত্তর আনতে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' অর্জুন আস্তে মাথা নাড়ে।

'আপনার শ্রীমতীজিকে ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। উনি বললেন, আপনি এলে খাবেন।'

অর্জুন উত্তর দিল না।

জগন্নাথ এবার বলে, 'আপনার কামরায় যান। ব্রেকফাস্টের ব্যওস্থা করছি।'

অর্জুন মাথা সামান্য হেলিয়ে তার ঘরে চলে যায়।

কমলা খাটের ওপর চুপচাপ বসে ছিল। অর্জুনকে দেখে বলে, 'এত দেরি হ'ল তোমার? একা একা আমার ভীষণ ভয় করছিল।'

চার্চে যাওয়ার সময় রিকশা বা টাঙ্গা না পাওয়ায় হেঁটে যেতে হয়েছে, তা ছাড়া রেভারেণ্ড টিরকের সঙ্গেও কথা বলতে হয়েছে খানিকক্ষণ, ইত্যাদি নানা কারণে যে দেরি হয়েছে তা জানিয়ে দেয় অর্জুন। তারপর বলে, 'তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে নাও। কেয়ার-টেকার বলল, এখনই খাবার পাঠিয়ে দেবে।'

সুটকেশ খুলে পরিষ্কার শাড়ি এবং ব্লাউজ নিয়ে প্রথমে কমলা

বাথরুমে চলে যায়। সে বেরিয়ে এলে ফর্সা পাজামা আর হাফ শার্ট নিয়ে অর্জুন ঢোকে।

বাসি চটকানো পোশাক পালটাতে পেরে বেশ আরাম বোধ করে দু'জনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জগন্নাথ কাল রাতের সেই বেয়ারাটাকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুনদের কামরায় আসে। বেয়ারার হাতের ট্রে-তে চা টোস্ট কলা জেলি এবং চা। জগন্নাথের হাতে একটা ঢাউস বাঁধানো খাতা।

জগন্নাথের কথামতো ট্রে-টা একটা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রেখে চলে যায় বেয়ারাটা। জগন্নাথ কিন্তু যায় না। সে একটা সোফায় বসে খাতাটা খুলতে খুলতে বলে, 'আপনারা খাওয়া শুরু করুন। আমি অফিসিয়াল কাজটা চুকিয়ে ফেলি। আপনাদের পুরো নাম আর ঠিকানা বলুন—'

কাল রাতেই জগন্নাথের সহৃদয় ব্যবহারে আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল অর্জুনদের। খেতে খেতে তার কথার উত্তর দিতে থাকে অর্জুনরা।

নামধাম ইত্যাদি টুকে নেবার পর জগন্নাথ জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা এখানে ক'দিন থাকবেন?'

প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে জগন্নাথের মুখের দিকে তাকায় অর্জুন। বলে, 'ক'দিন থাকব মানে?'

জগন্নাথ জানায়, এই পি. ডবু. ডি বাংলোয় একটানা সাত দিনের বেশি থাকার নিয়ম নেই। অর্জুনরা ইচ্ছা করলে সাত দিনই থাকতে পারে।

অর্জুন হকচকিয়ে যায়। তার ওপাশে খাওয়া থামিয়ে চুপচাপ বসে আছে কমলা। সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তাদের ধারণা ছিল, এই পি. ডবু. ডি বাংলোয় তারা স্থায়ীভাবেই থাকতে পারবে এবং সরকারি তরফে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

অর্জুন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সাত দিনের বেশি কি কোনোভাবেই থাকা যায় না?'

জগন্নাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, 'না, সরকারি কানুন ভাঙার ক্ষমতা আমার নেই। ভাঙলে নৌকরি চলে যাবে।'

'সাত দিন পর তা হ'লে আমরা কোথায় যাব?'

এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট ক'রে জানা নেই জগন্নাথের। এই বিপন্ন নবীন স্বামী-স্ত্রীর জন্য তার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। সাধ্যমতো সে তাদের সাহায্যও করতে চায় কিন্তু সরকারি নিয়ম-কানুনের বাইরে পা ফেলার সাহস নেই তার। কে কোত্থেকে রিপোর্ট ক'রে দেবে, তার ফল তার পক্ষে আদৌ সুখকর হবে না। জগন্নাথ ঘোর সংসারী মানুষ। দেশে স্ত্রী ছেলেমেয়ে রয়েছে। চাকরি চলে গেলে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। নিজের দিকটা পুরোপুরি বজায় রেখে এবং কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে অন্যের জন্য যদি কিছু করা যায়, জগন্নাথের তাতে আপত্তি নেই। তার উদারতা বা মহানুভবতার সীমারেখা ঠিক ঐ পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে জগন্নাথ। তারপর বলে, 'আমার একটা পরামর্শ যদি নেন তো বলি—'

গভীর আগ্রহে অর্জুন বলে, 'নিশ্চয়ই নেবো। আপনি বলুন—'

'হাতে তো কয়েক দিন সময় আছে। আপনারা এর ভেতর বাড়ি খুঁজতে থাকুন। একটু বেশি ভাড়া দিলে ঠিক পেয়ে যাবেন।'

অর্জুন উত্তর দেয় না, শুধু হতাশভাবে মাথা নাড়ে।

জগন্নাথ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হ'ল?'

অর্জুন বলে, 'এখানে আসার আগে অনেক খোঁজ করেছি। কেউ আমাদের বাড়িভাড়া দিতে চায় না।'

জগন্নাথের বিস্ময় বেড়েই যায়। সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে সে বলে, 'পয়সা দিয়ে থাকবেন, তবু বাড়ি দেবে না?'

'না।'

'বহুত তাজ্জবকি বাত।'

অর্জুন বলে, 'তাজ্জবের কথা নয়। আপনি খুব সম্ভব এখানে নতুন এসেছেন, তাই না?'

জগন্নাথ বলে, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'তাই এই শহরের হালচাল জানেন না। গাঙ্গোতাদের মেয়ের ছোঁয়া লাগলে তাদের বাড়ি অশুধ্ হয়ে যাবে যে।'

'সমঝ গিয়া।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অর্জুনদের সমস্যার গভীরতা ভাল ক'রে আন্দাজ করতে করতে জগন্নাথ এবার বলে, 'ভেরি ডিফিকাল্ট কেস। সারা টাউনের আপার কাস্ট পপুলেসন হোস্টাইল হয়ে গেলে কী ক'রে আপনাদের চলবে, ভাবতে পারছি না।' একটু থেমে ফের বলে, 'তবু হেরে গেলে চলবে না। একটা কিছু ব্যওস্হা করতেই হবে।'

অর্জুন চুপ ক'রে থাকে। বলার মতো কিছু নেই তার।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় জগন্নাথের চোখমুখ ঝকুমকিয়ে ওঠে। দারুণ উৎসাহের গলায় সে বলে, 'দেখুন. সমস্যাটার একটা সলিউসান হ'তে পারে।'

অর্জুন উৎসুক চোখে তাকায়, 'কী?'

'এস. ডি. ও সাহেবকে বলে এখানে বেশিদিন থাকার অর্ডার বের ক'রে নিন। আমার মনে হয় তিনি রাজী হবেন। অবশ্য—'

'কী?'

জগন্নাথ বলে, 'স্পেশাল কেস হিসেবে ব্যওস্হা ক'রে দিলেও দু-এক মাসের বেশি আপনারা থাকতে পারবেন না। পার্মানেণ্টলি থাকার জন্যে আপনাদের অন্য বাড়ি যোগাড় করতেই হবে।'

মস্তিষ্কের ভেতর দুশ্চিন্তার প্রবল চাপ অনুভব করতে থাকে অর্জুন। ঠিক বলেছে জগন্নাথ। চিরকাল সরকারি বাংলোয় থাকা যায় না। সেটা তাদের সমস্যার স্হায়ী সমাধানও নয়।

জগন্নাথ খাতা বন্ধ ক'রে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আচ্ছা, এখন চলি। আপনি কি আজ অফিসে যাবেন?'

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

দ্রুত হাত উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে জগন্নাথ। 'পৌনে ন'টা বাজে। আপনার জন্যে এখনই ডাল-ভাত-সবজি-উবজির বন্দোবস্ত করতে হয়। আপনি রেডি হয়ে নিন। ঠিক সাড়ে ন'টায় 'রসুই হয়ে যাবে।'

অর্জুন বলে, 'আমি কিন্তু শাকাহারী—'

জগন্নাথ জানায়, এখানে পবিত্র ভেজিটারিয়ান এবং নন-ভেজিটারিয়ান, দু'রকম ব্যবস্থাই আছে। অর্জুনের দুর্ভাবনার কারণ নেই। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সে। বলে, 'এস. ডি ও সাহেবের সঙ্গে আজই দেখা করবেন।'

'করব।'

জগন্নাথ আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

॥ চোদ্দ ॥

কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটায় খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ে অর্জুন। কমলা বাংলোর গেট পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে আসে। বলে, 'আমি একা থাকব। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

অর্জুন বলে, 'তাড়াতাড়ি কী ক'রে আসব ? ছুটির পর এস. ডি. ও সাহেবের কাছে একবার যেতে হবে না ?'

কথাটা মনে ছিল না কমলার। সে এবার বলে, 'তুমি একা যেও না। বিজয়জি আর সুরেশজিকে সঙ্গে নিয়ে যেও।'

বিজয় এবং সুরেশ দু'জনেই বেশ জবরদস্ত মানুষ, তারা দাপটের সঙ্গে কথা বলতে পারে। বিজয়রা গেলে তার সুবিধাই হবে। অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ, ওদের নিয়েই যাব। তুমি সাবধানে থাকবে। কেউ ডাকলেও দরজা খুলবে না। যা বলার জানালা দিয়ে বলবে।'

'আচ্ছা—'

অর্জুন গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে কমলা। তারপর সুরকির রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

দশটার তিন মিনিট আগেই অফিসে চলে আসে অর্জুন।

সেকসান অফিসার বিন্ধ্যাচলী তৈলাক্ত মসৃণ মুখ নিয়ে তার চেয়ারটিতে বসে আছে। প্রথম দিন থেকেই অর্জুন লক্ষ্য করেছে, বিন্ধ্যাচলী কামাই-টামাই করে না, দশটায় অফিসে চলে আসে। দশ মিনিট আগে আসবে কিন্তু এক সেকেণ্ডও লেট করবে না। এই একটা ব্যাপারে সে গভীর নিষ্ঠায় নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে।

বিন্ধ্যাচলী ছাড়া এখন পর্যন্ত সেকসানে আর কেউ আসে নি। এই ডিপার্টমেণ্টের বেশির ভাগই ডাহা ফাঁকিবাজ এবং লেট-কামার।

এদিক সেদিক তাকিয়ে বিজয়কে কোথাও দেখতে পেল না অর্জুন। সে কিছুটা অসহায়ই বোধ করে। বিজয় কাছে থাকলে সে অনেকটা ভরসা পায়।

বিন্ধ্যাচলী প্রথমটা অর্জুনকে লক্ষ্য করে নি। নিত্যকর্ম অনুযায়ী নিজের টেবলের ড্রয়ার থেকে গঙ্গাজলের বোতল বের করে ছিপি খুলে খানিকটা হাতের তেলোতে ঢেলে নেয়, তারপর চারিদিকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে সব কিছু পবিত্র করতে থাকে। কঠোর ধর্মপালনের মতো এই শুদ্ধিকরণের কাজটা রোজ সে করবেই।

গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে হঠাৎ বিন্ধ্যাচলী অর্জুনকে দেখতে পায়। বলে, 'আরে গাঙ্গোতাকা দামাদ, তুম আ গিয়া!'

তার বলার ধরনে এমন একটা বিদ্রূপ আর ঘৃণা মেশানো রয়েছে যে অর্জুন চলকে ওঠে। সে কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

গঙ্গাজল ছিটানো হয়ে গিয়েছিল। বিন্ধ্যাচলী বোতলটা ফের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে গলার স্বর পুরোপুরি

বদলে দিয়ে বলে, 'তোমাকে একটা অনুরোধ করব। নারাজ হয়ো না।'

কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তন অর্জুনকে অবাক ক'রে দেয়। সে বলে, 'কী অনুরোধ?'

'আমাদের অফিস দশটায় শুরু। তুমি কিরপা ক'রে সাড়ে দশটার আগে এসো না। আধ ঘণ্টা পর এলে লেট মার্ক করব না। ঐ টাইমটা তোমাকে গ্রেস দেওয়া হবে।' বলে পকেট থেকে তামাক এবং চুন বের ক'রে হাতের চেটোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে থাকে বিন্ধ্যাচলী।

অর্জুন হকচকিয়ে যায়। এরকম বিস্ময়কর এবং উদ্ভট অনুরোধের কারণ সে বুঝতে পারে না। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'দেরিতে আসব কেন? আধ ঘণ্টা গ্রেসই বা দেবেন কেন?'

একটা হাত তুলে বিন্ধ্যাচলী বলে, 'থামো থামো। সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি হচ্ছ সরকারি দামাদ। গভর্নমেণ্টকা প্যারা লাল। তোমাকে থোড়া কুছ খাতিরদারি না করলে চলে! আর—'

'আর কী?' রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে অর্জুন।

'দেখো ভাই, গুস্সা হয়ো না। গাঙ্গোতার দামাদের মুখ দেখে অফিসের কাজ শুরু করব, এতে গা ঘিনঘিন করে, নিজেকে অশুধ্ লাগে। আধ ঘণ্টা পর এলে তার মধ্যে আরো অনেকে এসে যাবে। অফিসে ঢুকে পয়লাই তোমার মুখ দেখতে হবে না। এই আর কি।' খৈনি তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল। দাঁতের ফাঁকে খানিকটা পুরে দিতেই বিন্ধ্যাচলীর মুখ লালায় ভরে যায়। জড়িত বগবগানো গলায় সে বলতে থাকে, 'দেখো ভাই, আমি সিধাসাদা আদমী, সিধা বাত সিধা করেই বললাম।'

এরকম একটা কারণে বিন্ধ্যাচলী যে তাকে দেরিতে অফিসে আসার কথা বলতে পারে, অর্জুনের কাছে তা খুবই অভাবনীয়। সে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে শুধু।

বিন্ধ্যাচলী ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের দেওয়ালে পিচকিরির মতো

পিচিক ক'রে খানিকটা গাঢ় খয়েরি রঙের থুতু ছিটিয়ে আবার মুখ ফেরায়। অর্জুন লক্ষ্য করে ওপাশের দেয়ালটা খৈনির দাগে কালচে হয়ে আছে। বোঝা যায়, দু-চারদিনে অমন রং ধরে নি, বহুকাল থুতু ছেটানোর কারণে দেওয়ালটার চেহারা ওরকম দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে ওঠে তার।

বিন্ধ্যাচলী বলে, 'আজ যখন অফিসে এসে পয়লাই তোমার মুখ দেখলাম তখন আর কিছু করার নেই। তোমরা নাকি কাল কী ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছ!' বলে একটা চোখ ছোট ক'রে, ঠোঁট কুঁচকে সোজা অর্জুনের চোখের দিকে তাকায় বিন্ধ্যাচলী।

অর্জুন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল মরিয়া হয়ে তাকে যা করতে হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে আদৌ ইচ্ছে নেই তার। সে চুপ করে থাকে।

বিন্ধ্যাচলী টেবলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বলে, 'তুমি না বললেও আমি কিন্তু সব শুনেছি। তোমার বাবুজি আর টৌলির লোকেরা বাড়ি থেকে ক'দিন আগে তোমাদের দু'জনকে ভাগিয়ে দিয়েছে, তারপর বিজয়ের কাছে গিয়ে শেলটার নিয়েছিলে, লেকেন বাড়িওলা টিকতে দেয়নি। তা হ'লে কী হবে, তুমি মানুষ না, বিলকুল শের। এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে কাল পিকেট ক'রে সরকারি বাংলোয় থাকার ব্যাওস্হা ক'রে নিয়েছ।' একটু দম নিয়ে ফের এভাবে শুরু করে, 'খেল দেখালে বটে, সম্রাট শাজাহানও তার ধরম-পত্নীর জন্যে এতটা করতে পারেনি। পেয়ারকা নয়া তাজমহল!' বলে আবার ঠোঁট দুটো পিচকিরির মুখের মতো ছুঁচলো ক'রে দেয়ালে খৈনি মেশানো থুতু ছিটিয়ে দেয়।

অর্জুনের মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে কোনো উত্তর দেয় না।

বিন্ধ্যাচলী গলার ভেতর হুঁ হুঁ ক'রে অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে দুলতে শুরু করে। বলে, 'আরে ভাই শরমাতা কিঁউ? লজ্জার কিছু নেই। এবার আমার একটা কথা ধ্যানসে শুনে নাও—'

বিন্ধ্যাচলীর দিক থেকে নতুন ক'রে আক্রমণটা কীভাবে কোন দিক থেকে আসছে, বুঝতে না পেরে ভীত চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

বিন্ধ্যাচলী বলে, 'পিকেটিং যখন আরম্ভ করেছ তখন বড় কাজের জন্যেই কর।'

নিজের অজান্তে ফস ক'রে অর্জুনের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'কী কাজ ?'

'ছ মাসের মধ্যে চুনাও আসছে, তাতে নেমে যাও। অচ্ছুতিয়াদের দামাদ হয়েছ। তুমি চুনাওতে নামলে ভুচ্চরের ছোঁয়াগুলো জরুর তোমাকে ভোট দেবে। তুমি এম. এল. এ হবে, তারপর এম. পি। বলা যায় না, মিনিস্টারও হয়ে যেতে পার। এখন তো শিডিউল্ড কাস্ট আর মাইনোরিটিদেরই জমানা।'

এই সময় বিজয় আসে। বিন্ধ্যাচলী তোড়ে যে বক্তৃতা দিচ্ছিল, তার একটা বর্ণও শোনে নি সে। তবে অর্জুনের কাঁচুমাচু ভয়ার্ত মুখ দেখে কিছু আন্দাজ ক'রে নেয়। জিজ্ঞেস করে, 'বিন্ধ্যাচলীজি লম্বাচওড়া স্পীচ দিচ্ছিলেন মনে হয়।'

বিন্ধ্যাচলী ঘাড় হেলিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যা যা আলোচনা হয়েছে, মোটামুটি জানিয়ে দেয় এবং সামনের নির্বাচনে কনটেস্ট করার কথাটাও বলে। গাঙ্গোতাদের জামাই হবার দৌলতে অচ্ছুতদের হানড্রেড পারসেন্ট ভোট যে অর্জুন পাবে, সে ব্যাপারে বিন্ধ্যাচলী গ্যারান্টি দিতে রাজী।

বিজয় বলে, 'খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। অর্জুন এম. এল. এ কি এম. পি হ'লে কোনো শালে তার গায়ে একটা টোকা মারতে পারবে না। সৎ পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। ওকে তা হ'লে ইলেকসানে নামিয়ে দিই, কী বলেন ?'

বিদ্রূপটা এভাবে ফিরে আসবে, ভাবতে পারেনি বিন্ধ্যাচলী। টেবল বাজানো এবং গা দোলানো বন্ধ হ'য়ে যায় তার। মুখ শক্ত হ'য়ে ওঠে। কঠোর চোখে বিজয়কে লক্ষ্য করতে করতে বলে, 'তুমি ওকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে হিন্দু ধরমের ক্ষতি করছ।'

'আমি ক্ষতি করছি! বাঃ বাঃ—' দারুণ মজাদার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে হাততালি দিতে থাকে বিজয়।

তার তালি বাজানো এবং বলার ভঙ্গিতে এমন ঝাঁঝ আর ব্যঙ্গ রয়েছে যে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় বিন্ধ্যাচলীর। কর্কশ গলায় সে বলে, 'ইয়ে অফিস হ্যায়। খচরাগিরি করার জায়গা নয়। যাও, আপনা কুর্সিতে ব'সে কাজ করো।'

বিজয় খেপে ওঠে, 'খচরাগিরি করছেন আপনি। অর্জুনকে তংগ করার রাইট আপনাকে কে দিয়েছে?'

কড়া ধমক দিয়ে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় বিন্ধ্যাচলী। বলে, 'নিজের নিজের জায়গায় যাও।'

'ঠিক হ্যায়।' অর্জুনকে সঙ্গে ক'রে বিজয় সেকসানের শেষ প্রান্তে নিজেদের সীটে চলে যায়।

এর মধ্যে অন্যান্য এমপ্লয়ীরা আসতে শুরু করেছে। বাঁকা চোখে তারা অর্জুনকে লক্ষ্য করে। তবে একজনও তার সঙ্গে কথা বলে না। অর্জুন যে প্রায় যুদ্ধ ক'রে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে তা জানতে এ শহরের কারো বাকি নেই। স্বভাবিকভাবেই অর্জুনের কলীগরা যে জানবে, সেটা তাদের মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়।

ডিপার্টমেণ্টের সবাই ফাঁকিবাজ হ'লেও কিছু না কিছু কাজ ক'রে থাকে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই অর্জুনকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। অফিসে এসে সে শুধু বসে থাকে। বিজয়ের সঙ্গেই তার যা কিছু কথাবার্তা হয়, তারপর ছুটি হ'লে চলে যায়।

অর্জুন নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলে, 'আজ সকালে আমাদের ওখানে তোমাকে আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম সুরেশজিকে নিয়ে তুমি আসবে।'

বিজয় জানায়, সকালে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বাংলো থেকে সুরেশকে তুলে নিয়ে অর্জুনদের কাছে যাবার কথা ভেবে রেখেছিল সে। কিন্তু হঠাৎ খবর পায় মান্ধাতা এবং তার দলবল বড় আকারে

অর্জুনদের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য বিজয় কয়েক জায়গায় গিয়ে বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিল। কাজেই এত দেরি হয়ে যায় যে যাবার সময় পাওয়া যায়নি।

গভীর উৎকণ্ঠায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'সত্যিই ওরা কিছু করছে নাকি?'

'তেমন খবর পাইনি। তবে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।' বিজয় বলতে থাকে, 'সে যাক। বাংলোয় তোমাদের কেউ ডিসটার্ব করেনি তো?'

'না না, কেয়ার-টেকার লোকটি বেশ ভাল। আমাদের খুব যত্ন করছে।'

'অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করেছ, সেটা কি সে জানে?'

'জানে। আমাদের সম্বন্ধে বেশ সিমপ্যাথি আছে।'

'গুড নিউজ। বিকেলে তোমার সঙ্গে তোমাদের ওখানে যাব। সুরেশজিও মনে হয়, সোজা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় চলে যাবেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় বিজয় একটা ফাইল দেখতে দেখতে অর্জুনকে বলে, 'সেকসান অফিসারের কাছ থেকে কাজ নিয়ে এসো। চুপচাপ বসে থেকে মাসের শেষে মাইনে নিয়ে গেলে রেকর্ড খারাপ হ'য়ে যাবে। ঐ শালাই ওপরে জানিয়ে দেবে তুমি অপদার্থ।'

অর্জুন আবার বিন্ধ্যাচলীর কাছে চলে আসে।

চোখে মুখে অসীম বিরক্তি ফুটিয়ে বিন্ধ্যাচলী জিজ্ঞেস করে, 'আবার কী হ'লো?'

অর্জুন বলে, 'আমাকে কাজ দিন।'

জিভ কেটে জোরে জোরে মাথা নাড়ে বিন্ধ্যাচলী। তারপর বলে, 'তুমি হ'লে সরকারি দামাদ। কত তাখলিফ ক'রে সবে নৌকরি পেয়েছ। এত তাড়াহুড়োর কী আছে। ক'দিন জিরিয়ে নাও। তারপর কাজ ক'রো। যাও, আপনা কুর্সি'তে গিয়ে বসো।'

অর্থাৎ অর্জুনকে কাজ দিতে চায় না বিন্ধ্যাচলী। এর পেছনে হয়তো তার বিচিত্র মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। চাকরি পেয়েছ, মাসের শেষে মাইনে পাবে, এসবই ঠিক আছে। কিন্তু কাজের ভেতর তোমাকে কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। গাঙ্গোতাদের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে সরকারি অফিসেও তোমাকে পুরোপুরি অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখা হবে।

অর্জুন খুবই অপমানিত বোধ করে। ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে গা এলিয়ে বসে পড়ে।

বিজয় তাকে লক্ষ্য করছিল। ডান পাশে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হ'লো?'

বিন্ধ্যাচলী যা যা বলেছে, সব বিজয়কে জানিয়ে দেয় অর্জুন।

শুনতে শুনতে মুখ শক্ত হয়ে ওঠে বিজয়ের, ভুরু কুঁচকে যায়। গম্ভীর গলায় সে বলে, 'ঠিক আছে, দেখা যাক দু-একদিন। তারপর কাজ না দিলে ওকে আমি ছাড়ব না।'

এই অফিসের কাজকর্মের ধরনটি খুবই ঢিলেঢালা। আড্ডা হৈচৈ খৈনি-ডলা সিনেমা আর নানা ব্যাপারে চিৎকার, এ সবেই ডিউটি আওয়ার্সের বেশির ভাগ সময় কেটে যায়।

একটায় টিফিন।

সবাই যখন যে যার সীট থেকে উঠে পড়ছে সেই সময় বাইরে থেকে তুমুল হল্লার আওয়াজ ভেসে আসে। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না, তবে বহু লোক একসঙ্গে যে চেঁচাচ্ছে, এটা বোঝা যায়।

সেকসানের সবাই চমকে ওঠে। দু-একজন বলাবলি করে, 'কী হ'লো? কারা শোর মচাচ্ছে?'

কয়েকজন বাইরে বেরিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে বিজয়ও যায়। নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে অর্জুন।

কিছুক্ষণ বাদে একটা অল্প বয়সের টাইপিস্ট, নাম মনোহর,

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ফিরে আসে। তার চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা এবং উল্লাসও।

সেকসানে ঢুকেই মনোহর চেঁচাতে থাকে, 'শুনা হ্যায়, কারা এসে শোর মচাচ্ছে ?'

যারা টিফিনের সময় বাইরে যায়নি তারা মনোহরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ে। এমন কি যে বিন্ধ্যাচলী এই সময় খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়, সে পর্যন্ত জরুরি দিবানিদ্রাটি স্থগিত রেখে নিজের গদিমোড়া চেয়ার থেকে উঠে আসে।

গোটা সেকসান প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করে, 'কারা হল্লা করছে ? কারা ?'

মনোহর বলে, 'নমকপুরার বামহনরা।'

'কী চাইছে তারা ?'

সোজা অর্জুনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মনোহর বলে, 'অচ্ছুতিয়ার দামাদকে এই অফিস থেকে ভাগিয়ে দিতে হবে। এটা ওদের ডিমাণ্ড।'

বিশ জোড়া চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার দিকে নজর রেখেই সমস্বরে সকলে জিজ্ঞেস করে, 'সচমুচ ?'

'সচমুচ। নিজেরা গিয়ে আপনা আঁখোসে দেখে এসো না।'

অর্জুন মারাত্মক ভয় পেয়ে যায়। তার হৃৎপিণ্ড এখন এত প্রচণ্ড গতিতে লাফাচ্ছে যে তার শব্দ পর্যন্ত যেন শুনতে পায় সে। নমকপুরার ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আক্রমণটা এভাবে আসতে পারে, তার পক্ষে এ ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়। অর্জুনের ধারণা অফিসে হানা দেওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত জোরালো এবং পাকা মস্তিষ্ক কাজ করছে। সেটা অবশ্যই মান্ধাতা শর্মার। লোকটা কোনোভাবেই তাকে নমকপুরায় টিকতে দেবে না। এই শহর থেকে উৎখাত করার জন্য নানা দিক থেকে চক্রান্ত ক'রে চলেছে।

বেঁটেখাটো হট্টাকাট্টা চেহারার এক কেরানী, যার নাম চুনীলাল,

জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ ক'রে অর্জুনের উদ্দেশে বলে, 'কা দুখকা বাত! এত তখলিফ ক'রে গাঙ্গোতাদের দামাদ হ'লে, আর দামাদ হ'য়েই সরকারী নৌকরি, রুপাইয়া বাগালে, লেকেন বামহনগুলো কিরকম হারামী দেখ, তোমার পেছনে লেগেছে। শালেদের মতলব বহুত বুরা। এত্তে বড়ে রেভোলিউসান ঘটালে, লেকেন ওই বুরবকগুলো এর সম্মান দিতে জানে না।' বলে চোখ কুঁচকে জিভের ছুঁচলো ডগাটি বের ক'রে অনেকক্ষণ চুক চুক আওয়াজ করে।

চুনীলাল লোকটা অতীব ধূর্ত, তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত শয়তানিতে ঠাসা। তার এই সব নকল সহানুভূতির কথাগুলোর ভেতর তীক্ষ্ম হুল রয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে জানে নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা তার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলার জন্য অফিসে হানা দিয়েছে, এতে পুরোপুরি সায় রয়েছে চুনীলালের।

প্রবল ঘৃণায় ঠোঁট কুঁচকে বিন্ধ্যাচলী অর্জুনকে বলে, 'ছো ছো, অফিসের মান-সম্মান তোমার জন্যে আর রইল না।' বলতে বলতে চুনীলালের দিকে ফেরে, 'কত আদমী শোর মচাতে এসেছে?'

চুনীলাল বলে, 'লগভগ বিশ তিশ হোগা।'

এই সময় বিজয় ফিরে আসে। তাকে উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। গজ গজ করতে করতে সে বলে, 'এ শালেরা কি মানুষ!'

বিন্ধ্যাচলী জিজ্ঞেস করে, 'কাদের কথা বলছ?'

'ঐ যারা চেল্লাচ্ছে।' বিজয় গলার স্বর চড়িয়ে বলতে থাকে, 'একটা ছেলে অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে টাউনের ব্রাহ্মণ সোসাইটি তাকে শেষ ক'রে দিতে চাইছে! গিধের পাল।'

বিন্ধ্যাচলী খেপে ওঠে, 'গালি দিচ্ছ!'

'হ্যাঁ, জরুর।'

'ব্রাহ্মণত্বের সত্যনাশ ক'রে দেবে ঐ ছোকরা—' অর্জুনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিন্ধ্যাচলী বলতে থাকে, 'ও যা ভাল বুঝেছে, করেছে। এখন ব্রাহ্মণরা তাদের জাতের পবিত্রতা রাখার জন্যে

যা চাইছে, করতে দাও। আমাদের গণতন্ত্রে ফ্রিডম অফ স্পীচ রয়েছে না ?'

'ফ্রিডম অফ স্পীচের কথা বলছেন ? ভেরি গুড। অচ্ছুতরা যদি কাল এসে অফিসে চড়াও হয় ? যদি বলে, অর্জুনের ওপর ব্রাহ্মণদের এই হামলা চলবে না, তখন কী হবে ?'

বিন্ধ্যাচলী চমকে ওঠে। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'অচ্ছুতিয়ারা এখানে হুজ্জুত করতে আসবে নাকি ?'

'আমার সঙ্গে ওরা পরামর্শ করেনি। তবে ওদের দামাদকে তংগ করলে ওরা ছাড়বে কেন ?'

'তুমি ওদের তাতাচ্ছ নাকি ?' বলে কুটিল চোখে তাকায় বিন্ধ্যাচলী।

বাইরে হল্লাবাজি আরো তুমুল হয়ে উঠেছে। মনে হয়, লোকগুলো এখন আর রাস্তায় নেই, অফিসে ঢুকে পড়েছে। এবার তাদের চিৎকার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'অচ্ছুতিয়াকা দামাদকো—'

'নিকাল দো, নিকাল দো —'

'বামহনকা সত্যনাশ—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'ইয়ে সরকার—'

'ব্রাহ্মণকো বিনাশ করনে—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'ইনকো—'

'রুখনাই পড়েগা।'

এই সব চড়া সুরের স্লোগানের ওপর গলা চড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল বিজয়, তার আগেই অফিসার-ইন-চার্জ সুধাকর দুবের আর্দালি দৌড়ুতে দৌড়ুতে এখানে চলে আসে। বলে, 'বড়ে সাহাব অর্জুন চৌবেকে এখনই তাঁর কামরায় যেতে বলেছেন।'

অর্জুনের বুকের ভেতরটা আশঙ্কায় ধক করে ওঠে। এই অফিসে জয়েন করার দিন একবারই মাত্র সুধাকরের কামরায় গিয়ে রিপোর্ট করেছিল সে। তারপর সেখানে আর ডাক পড়েনি, তাকে কোনো কারণে তলবও করা হয়নি। সে এতই ছোট মাপের সামান্য এমপ্লয়ী যে সুধাকরের মতো বড় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আদৌ প্রয়োজন নেই। হঠাৎ এভাবে আর্দালি পাঠিয়ে তলব করায় ভয় পাওয়ারই কথা। অর্জুনের মনে হয়, নমকপুরার ব্রাহ্মণরা এসে এই যে হল্লা শুরু করেছে তার সঙ্গে এই ডাকের সম্পর্ক রয়েছে। চেয়ার থেকে রুদ্ধশ্বাসে উঠে দাঁড়ায় সে। আর্দালির সঙ্গে যাবার জন্য যখন পা বাড়াতে যাবে সেই সময় বিজয় বলে, 'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

আর্দালি বলে, 'নেহী। বড়ে সাহাব অর্জুনজিকে একলাই যেতে বলেছেন। আপনি যাবেন না।'

'আমাকে যেতেই হবে। তোমার চিন্তা নেই। সুধাকরজিকে যা বলার আমি বলব।' বলে অর্জুনের দিকে তাকায় বিজয়, 'চল—'

বিজয়ের মতো সাহসী একটি মানুষ সঙ্গে যাচ্ছে। অনেকটা ভরসা পায় অর্জুন।

সুধাকর দুবের কামরার সামনে আসতেই পুরনো ভয়টা আবার ফিরে আসে অর্জুনের মধ্যে। নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা বাইরের টানা লবিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। এদের সবাই অর্জুনের চেনা। সুরযদেও, ভানপ্রতাপ, এমনি অনেকে। তবে এদের মধ্যে মান্ধাতাকে দেখা যায় না।

শুধু ব্রাহ্মণরাই না, এই অফিসের লোকজনও লবিতে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে।

অর্জুনকে দেখে স্লোগানের তোড় হঠাৎ বেড়ে যায়।

'ব্রাহ্মণকো—'

'রক্ষা করো।'

'ব্রাহ্মণ অচ্ছুৎ বরাবর করনা—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'এহী সরকার—'

'তোড় দো, তোড় দো—'

এ জাতীয় অভ্যর্থনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না অর্জুন। সে ভয়ানক ঘাবড়ে যায়।

নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটির সমস্ত ব্যাপারে অনিবার্য নিয়মেই মান্ধাতা সবার আগে আগে থাকে। নেতা হওয়ার জন্মগত অধিকার একমাত্র তারই। কিন্তু কোনো কারণে তাকে না পাওয়া গেলে নেতৃত্বটা সাময়িকভাবে এসে যায় ভানপ্রতাপের হাতে। ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে আজকের এই মিছিলটা সে-ই নিয়ে এসেছে।

হাত তুলে ভানপ্রতাপ স্লোগান থামিয়ে দেয়। তীক্ষ্ম বিদ্রূপের গলায় বলে, 'অচ্ছুতিয়াকা দামাদ আ গিয়া। অফসারের কামরায় যাবার জন্যে রাস্তা ক'রে দাও।'

সবাই প্রবল ঘৃণায় অর্জুনকে লক্ষ্য করছিল। তারা সরে সরে জায়গা করে দেয়।

কামরার ভেতরে ঢুকেই অর্জুন এবং বিজয়ের চোখে পড়ে উটের মত চেহারার সুধাকর দুবে তার চেয়ারটিতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন। বিরক্তি রাগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা—তার চোখেমুখে নানা বিচিত্র ধরনের অভিব্যক্তি খেলে যাচ্ছে। উত্তেজনায় কন্ঠনলীটা দ্রুত ওঠানামা করছে। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে সুধাকর বলেন, 'বৈঠো।' তারপর বিজয়ের দিকে ফিরে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এখানে কেন? তোমাকে তো আসতে বলিনি।'

সুধাকরের বলার তোয়াক্কা না ক'রে অর্জুনের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে বিজয়। বলে, 'না বললেও আসতে হয়েছে

আমাকে। অর্জুন ভালোমানুষ। ওর ওপর ঝামেলা হ'লে কাউকে তো সামলাতে হবে।'

চোখের কোণ দিয়ে বিজয়কে লক্ষ্য করতে করতে সুধাকর চাপা তীব্র গলায় বলেন, 'তুমি বুঝি ওর প্রোটেকটর? নাকি বডি গার্ড?'

বিজয় খেপে ওঠে না। শান্ত গলায় বলে, 'আপনার যা ইচ্ছে আমাকে বলতে পারেন।'

সুধাকর এ কথার উত্তর না দিয়ে ফের তার দুই চোখের কোঁচকানো নজর এনে ফেলেন অর্জুনের ওপর। জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তোমাকে এখানে ডাকিয়ে এনেছি, আন্দাজ করতে পার?'

অর্জুন চুপ করে থাকে।

বিজয় বলে, 'নিশ্চয়ই পারে। নমকপুরার আপার কাস্টের লোকেদের প্রেসার এসে পড়েছে আপনার ওপর, তাই না?'

'জবাবটা আমি তোমার কাছে চাইনি।' রূঢ় গলায় বলেন সুধাকর।

বিজয় বলে, 'আপনি তো বললেন আমি ওর প্রোটেকটর। ওকে রক্ষা করবই। যা জিজ্ঞেস করবার আমাকে করুন।'

'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ বিজয়।'

'আমি করছি, না আপনারা করছেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না সুধাকর। আরক্ত চোখে একবার বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আবার অর্জুনের দিকে ফেরেন, 'এই অফিসে কোনোদিন যা হয়নি, তোমার জন্যে আজ তা হ'লো?'

রুদ্ধস্বরে অর্জুন বলে, 'কী?'

এই সময় বাইরের লবিতে নতুন উদ্যমে স্লোগান শুরু হ'য়ে যায়।

'ব্রাহ্মণকো অশুধ্ করনা—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'ইয়ে বিধর্মী সরকার—'

'তোড় দো, তোড় দো।'

সুধাকর বলেন, 'ঐ শুনতে পাচ্ছ? তোমার জন্যে ওরা এই অফিসে হানা দিয়েছে।'

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দরজা ঠেলে ভানপ্রতাপ এবং আরো কয়েক জন ঢুকে পড়ে।

সুধাকর বলেন, 'আপনারা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

ভানপ্রতাপ ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'আমরা অনেকক্ষণ এসেছি। আর দাঁড়াতে পারব না।'

হাতজোড় ক'রে এবার সুধাকর বলেন, 'ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিন। তারপর আপনাদের সঙ্গে বসব। আপনার লোকদের কৃপা ক'রে স্লোগান দিতে মানা করুন। এত আওয়াজে কথা বলা যায় না।'

ভানপ্রতাপ গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। তবে সুধাকরের অনুরোধটা সে রাখে। একটু পর স্লোগান বন্ধ হয়ে যায়।

সুধাকর লম্বা ভণিতা ছেড়ে এবার সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসেন, 'নমকপুরার ব্রাহ্মণরা আমাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, অর্জুনকে এই অফিসে যেন কাজ করতে না দিই।'

বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'ও গাঙ্গোতার মেয়ে বিয়ে করেছে বলে?'

আস্তে মাথা নাড়েন সুধাকর।

বিজয় সরাসরি সুধাকরের চোখে চোখ রেখে বলে, 'কাজ করতে দিলে ওরা কী করবে?'

'ঝামেলা-টামেলা বাধাবে।'

বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু উকিলের মতো বিজয় প্রশ্ন করে, 'কী ধরনের ঝামেলা?'

কিছুটা বিব্রত বোধ করেন সুধাকর। তাঁর কন্ঠনলী আরো দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। বারকয়েক ঢোক গিলে বলেন, 'আজ

যেরকম মিছিল ক'রে এসেছে, সেইরকম রোজ রোজ এসে ডিসটার্ব করবে। এভাবে চললে তো অফিসের কাজকর্ম চালানোই যাবে না।'

বিজয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সে বলে, 'এই ব্যাপার? তা আপনি কী করতে চান?'

চতুর ডিপ্লোম্যাটের মতো সুধাকর এবার বলেন, 'সেটাই ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না। তাই অর্জুনকে ডাকিয়ে আনিয়েছি।' একটু ভেবে বলেন, 'তুমি সঙ্গে এসেছ, একরকম তাতে ভালই হয়েছে। ইউ আর এ ভেরি ইনটেলিজেন্ট ফেলো। আশা করি, তোমার কাছ থেকে সৎ পরামর্শ পাওয়া যাবে।'

সুধাকরের চালাকিতে এবং হঠাৎ তার সম্পর্কে সুর বদলে ফেলায় বিজয় যতটা বিরক্ত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মজা পায়। চোখ-দুটো সরু ক'রে বলে, 'কী ব্যাপার স্যার, অর্জুনের সঙ্গে আসার জন্যে কিছুক্ষণ আগে আমার ওপর আপনি না খেপে গিয়েছিলেন?'

সুধাকর হকচকিয়ে যান। বলেন, 'আচানক ব্রাহ্মণ কমিউনিটির লোকেরা এভাবে চলে এসে হল্লা করার জন্যে আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাই তোমাকে ওভাবে বলেছি। প্লীজ, ডোন্ট মাইন্ড। আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি।'

একটা বড় অফিস চালাবার মতো চাতুর্য এবং দক্ষতা দুই-ই রয়েছে সুধাকরের। রূঢ় ব্যবহারের পর মধুর কথা বলে কীভাবে মানুষকে ভিজিয়ে ফেলা যায় সেই কৌশলটি তাঁর আয়ত্তে। যে লোক রুক্ষ আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তাকে আর কী বলা যায়। বিজয় বলে, 'ঠিক আছে। আমি আপনার খারাপ ব্যবহারটা মনে ক'রে রাখলাম না। আই টোটালি ফরগেট। কিন্তু অর্জুন এখানে চাকরি পেয়েছে বলে আপনার কাস্টের লোকেরা ঝামেলা পাকাবে—এ ব্যাপারে আমি কী পরামর্শ দিতে পারি?'

'মতলব, আমার এই প্রবলেমে তোমাদের, স্পেশালি তোমার সাহায্য চাই।'

বিজয় আচমকা শব্দ ক'রে হেসে ফেলে।

সুধাকর অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বলেন, 'হাসছ যে?'

বিজয় মজার গলায় বলে, 'হাসির কথায় হাসব না? আমি একজন ছোটামোটা ক্লার্ক। আপনি এই অফিসের খোদ ভগোয়ান, মোস্ট পাওয়ারফুল গড। সেই আপনি কিনা আমার কাছে সাজেসান চাইছেন! বড়ে তাজ্জবকি বাত।'

সুধাকর আন্তরিক গলায় বলেন, 'তাজ্জবকি বাত নয়, সত্যি আমি তোমার সাজেসান চাই।'

এই পরামর্শ চাওয়ার পেছনে যে কারণটি তা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে বিজয়। সুধাকর জানেন বা শুনে থাকতে পারেন, অর্জুনের ওপর তার বিপুল প্রভাব। তা ছাড়া হিন্দু সমাজ সমস্কার সংগঠনের সে একজন স্থানীয় নেতা এবং অত্যন্ত জেদী ধরনের বেপরোয়া যুবক। তার সাহায্য পেলে অর্জুনকে ঘিরে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কিছুটা সুরাহা হয়ত হ'তে পারে। বিজয় বলে, 'অর্জুনকে ওরা এখানে নৌকরি করতে দিতে চায় না। তা সত্ত্বেও যদি সে কাজ ক'রে যায়, ওরা কতটা ডিসটার্ব করতে পারে?'

'বললাম তো, রোজ মিছিল নিয়ে আসবে।'

দ্রুত খানিকটা চিন্তা ক'রে নেয় বিজয়। তারপর বলে, 'দেখুন স্যার, আমার ধারণা রোজ ওরা হল্লা করতে আসবে না।'

সুধাকর অবাক। বলেন, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

বিজয় এবার যা বলে তা এইরকম। ব্রাহ্মণ সন্তানের অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করার ঘটনা নমকপুরায় এই প্রথম ঘটল। সেই কারণে আপার কাস্টের মানুষেরা ভীষণ বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রাথমিক এই ক্রোধ এবং উত্তেজনা বেশিদিন বজায় থাকবে না। কেননা সবারই কাজকর্ম আছে, পেটের ধান্দা আছে। জাতপাতের সওয়াল নিয়ে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা প্রায়

অসম্ভব ব্যাপার। তাদের এই মারমুখী 'অ্যাজিটেসান' ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য। খানিকটা খিঁচ থেকে গেলেও একসময় সবাই তা ভুলে যাবে, দু-চার বছর পর মেনেও নেবে।

সুধাকর হতাশভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। বিমর্ষ মুখে বলল, 'তুমি এই সব ফান্ডামেন্টালিস্টদের চেনো না বিজয়। ওরা কোনোদিনই ব্রাহ্মণ-অচ্ছুতের শাদি মেনে নেবে না।'

'তাহ'লে এক কাজ করুন।'

'কী?'

'আপনি ভানপ্রতাপদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন, ওরা অর্জুনের ব্যাপারে ঠিক কী চায়। তারপর আমাদের ডাকবেন। তখন আমার সাজেসন জানিয়ে দেবো।'

'সেই ভাল। তোমরা সেকসানে গিয়ে ওয়েট কর। ঘন্টাখানেক বাদে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

অর্জুন আর বিজয় উঠে পড়ে। সুধাকর বেল বাজিয়ে আর্দালিকে দিয়ে ভানপ্রতাপদের ডেকে আনতে বলেন।

ঘন্টাখানেক নয়, প্রায় পৌনে দু ঘন্টা বাদে সুধাকরের খাস আর্দালি আবার বিজয়দের সেকসানে এসে হাজির। তাদের বলে, 'বড়ে সাহেব আপলোগোনকো বুলায়া হ্যায়। তুরন্ত চলিয়ে।'

সুধাকরের কামরায় আসতেই বিজয়দের চোখে পড়ে ভগ্নস্তূপের মতো বসে আছেন তিনি। অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এবং বিপন্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। ভানপ্রতাপদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন। নির্জীব সুরে বলেন, 'ব'সো—'

টেবলের এধারে বসতে বসতে বিজয় বলে, 'কী বললে ভানপ্রতাপজি আর তার দলবল?'

'যা বললে তাতে প্রবলেমটা আরো বেড়ে গেল বিজয়।'

'কিরকম?'

'ওরা বলছে, অর্জুনকে এখান থেকে না তাড়ালে রোজ মিছিল ক'রে আসবে। কাজকর্ম স্রেফ বানচাল ক'রে দেবে। আমি এই অফিসের চার্জে রয়েছি। কাজ বন্ধ হ'লে আমার বিলকুল ডিসক্রেডিট। অথরিটির কাছে আমাকে পুরো বেইজ্জত হ'তে হবে।'

সুধাকরের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না বিজয়ের। লোকটা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। গাঙ্গোতাদের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতা যে নষ্ট হয়েছে, এতে সে আদৌ খুশি নয়। কিন্তু চাকরির ভয়টাও সেই সঙ্গে পুরো মাত্রায় রয়েছে। ব্রাহ্মণদের মিছিলের কারণে সরকারী কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তার অযোগ্যতা প্রমাণ হয়ে যায়, সে যে ট্যাক্টলেস অর্থাৎ সমস্যা সমাধানে তড়িৎ গতিতে প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবনে অক্ষম, সেটা চারিদিকে চাউর হয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রোমোশনের পক্ষে তা ক্ষতিকর। সে এমনই একজন মানুষ যে ব্রাহ্মণত্বের শুদ্ধতা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চাকরির সুরক্ষাও চায়। অর্জুন এ অফিসে জয়েন ক'রে তাকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যার দু পাশেই অতল খাদ। সামান্য অসতর্ক বা বেহিসেবি পা ফেললে তার চরম সর্বনাশ।

সুধাকরের মেরুদণ্ডের জোর কম, চরিত্রে দৃঢ়তা বলতে তেমন কিছু নেই। প্রাচীন সংস্কার থেকে তিনি যেমন নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না, তেমনি চাকরিতে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেবার মতো সাহসও তাঁর নেই। দু'দিক বজায় রেখে ভারসাম্যে এতটুকু হেরফের না ঘটিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চান তিনি।

বিজয় নির্লিপ্ত মুখে বলে, 'বেইজ্জত যাতে না হ'তে হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।'

'আমার একার পক্ষে তা সম্ভব না বিজয়। তোমরাই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারো।' বলতে বলতে টেবলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের একটা হাত প্রায় ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরেন সুধাকর।

খুব আস্তে আস্তে এবং সুকৌশলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় বিজয়। তার মুখে অদ্ভুত একটি হাসি ফুটে ওঠে। নিরুত্তেজ, শান্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'আপনার কাস্টের লোকেদের প্রেসারে ভীষণ নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন, তাই না ?'

সুধাকর চুপ ক'রে থাকেন।

বিজয় বলে, 'এই প্রবলেমটার একটাই মোটে সলিউসান আছে স্যার। সেটা হ'লে কারো আর দুশ্চিন্তা থাকবে না। তখন আপনার শান্তি, আমাদের শান্তি, আপনার কাস্টের শান্তি, অফিসের শান্তি। হোল অ্যাটমসফীয়ার পুরা পীসফুল হ'য়ে যাবে।'

গভীর ঔৎসুক্যে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন সুধাকর। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, 'কী সলিউসান বিজয় ?'

'যদি অর্জুন এই টাউন ছেড়ে চলে যায়, তবেই আর প্রবলেমটা থাকে না।'

'একজাক্টলি। ব্রাহ্মণ লবি আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলছিল।'

'আপনি তাদের কী বলেছেন ?'

'তোমাদের সঙ্গে কথা না ব'লে আমি কিছুই 'কমিট' করি নি।'

বিজয় হাসে। বলে, 'কমিট না করলেও মনে মনে আপনিও তো তাই চান। নেহাত খুদ মিনিস্টার নিজের হাতে অর্জুনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছেন ব'লে কিছু করতে সাহস পাচ্ছেন না।'

বিজয়কে রীতিমত সমীহই ক'রে থাকেন সুধাকর। এবং কিছুটা ভয়ও। সেটা তার বেপরোয়া ভঙ্গি এবং সাহসিকতার কারণে। তা ছাড়া অন্য জোরও রয়েছে। একটা বড় সংগঠনের স্থানীয় নেতা সে। যেভাবে বিজয় কথা বলছে, একজন অফিস মাস্টারের সঙ্গে সেভাবে বলা যায় না। কিন্তু ঢোক গিলে সুধাকরকে সবই হজম করতে হয়।

বিজয় আবার বলে, 'স্যার, আপনাকে সাফ সাফ একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই।'

বিজয়ের বলার ভঙ্গিতে রীতিমত ঘাবড়েই যান সুধাকর। আধফোটা গলায় বলেন, 'কী?'

'ব্রাহ্মণ লবির কাছে আপনি মাথা নোয়াবেন না। সরকারী কানুনে অর্জুন নৌকরি পেয়েছে। সে অন্যায় কিছু করে নি। মিনিস্টার, এম. এল. এ, এম. পি—সবার ব্লেসিং ছিল এই বিয়েতে।'

'আমি জানি।'

'সব জেনেশুনেও যদি নিজের চামড়া আর চাকরি বাঁচাবার জন্যে অর্জুনকে নমকপুরা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করাবার চেষ্টা করেন, আমরা কিন্তু কোনোভাবেই মেনে নেবো না।'

সুধাকরের ইচ্ছে ছিল, অর্জুনকে অন্য কোনো অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হ'তে পারবেন। সেই কারণেই তাকে ডাকিয়ে এনেছিলেন, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ট্রান্সফারে রাজী করানো যায়। সোজাসুজি ট্রান্সফারের কথাটা তিনি বলেন নি, আভাসে ইঙ্গিতে নিজের মনোভাব জানাতে চেয়েছেন শুধু। কিন্তু বিজয় যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তাঁর উদ্দেশ্য চট করে ধ'রে ফেলতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি।

শুকনো মুখে সুধাকর বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ বিজয়।'

বিজয় অদ্ভুত হাসে। বলে, 'আপনি নিজের দিকটাই শুধু ভাবছেন। অর্জুনের দিকটাও একটু আধটু চিন্তা করুন।'

শশব্যস্তে সুধাকর বলে ওঠেন, 'চিন্তা করেছি বৈকি। আমি ওর সম্পর্কে এত ভাল নোট দিয়ে পাঠাব যে, যেখানে যাবে সেখানে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। কেউ ওকে বিরক্ত করবে না।'

স্থির চোখে সুধাকরকে লক্ষ করতে করতে বিজয় বলে, 'চমৎকার, চমৎকার—'

তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু রয়েছে যাতে চমকে ওঠেন সুধাকর। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'মানে?'

'বহুৎ সিম্পল। অর্জুনকে এখান থেকে ভাগাতে পারলে বিনা ঝামেলায় আপনি অফিস চালাতে পারবেন। ট্যাক্টফুল এফিসিয়েন্ট অফিসার হিসেবে আপনার নাম ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই স্যার।'

'কী?'

'নমকপুরার ব্রাহ্মণ লবি রোজ এখানে মিছিল নিয়ে এসে যদি হুজ্জুৎ বাধায়, আমাদেরও নিজেদের রক্ষা করার জন্যে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। সেটা আপনার পক্ষে কিন্তু আনন্দের কারণ হবে না।'

দুশ্চিন্তায় এবং ভয়ে নিজের অজান্তেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আধাআধি উঠে দাঁড়ান সুধাকর। চেরা চেরা ভীত স্বরে বলেন, 'নেহী নেহী।' তারপর ফের বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, 'কী করতে চাও তোমরা?'

'আমরাও আমাদের লোকজন নিয়ে এখানে মিছিল ক'রে আসব। আপনি কী ক'রে অফিস চালান, দেখতে চাই।'

প্রায় হাতজোড় ক'রে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন সুধাকর, 'প্লীজ বিজয়, এসব ক'রো না। তুমি তো জানো বছরখানেক আগে আমার হার্টের ট্রাবল হয়েছিল। ডাক্তার টেনসান-ফ্রি থাকতে বলেছেন। দু তরফের গোলমালের ভেতর পড়ে গেলে আমি আর বাঁচব না। নিশ্চয়ই তুমি আমার মৃত্যু চাও না।'

বিজয় বলে, 'এই কথাগুলো আপনি নমকপুরার ব্রাহ্মণদের ভাল ক'রে বোঝান। ওরা ঝঞ্ঝাট না পাকালে আমরা বিলকুল চুপ ক'রে থাকব। আর যদি অর্জুনের কোনো ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, ছেড়ে দেবো না। এখন আমরা যাচ্ছি, বাইরে ওরা অস্থির হয়ে উঠেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলুন।'

অর্জুনকে সঙ্গে ক'রে বাইরে বেরিয়ে যায় বিজয়। আর ভানপ্রতাপরা হুড়মুড় ক'রে সুধাকরের কামরায় ঢুকে পড়ে।

পনের ॥

সুধাকর পাণ্ডের কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় চলে যেতে চেয়েছিল অর্জুন। ব্রাহ্মণরা এভাবে অফিসে মিছিল ক'রে আসায় সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তার মনে হয়েছিল, মান্ধাতাদের চক্রান্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর চারিদিকের উত্তেজনা এবং উত্তাপ ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু নমকপুরার ব্রাহ্মণরা যে কত হিংস্র এবং ভয়াবহ জীব, সে সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। অথচ সে তাদেরই একজন। যে মারাত্মক জেদ এবং নিষ্ঠুরতা লোকগুলোর ঘাড়ে চেপে বসেছে তাতে এই অফিস থেকে ওরা তাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

মনের ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ায় অর্জুন এমনই বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছে যে কী করবে, ঠিক ক'রে উঠতে পারছিল না। এটুকুই শুধু ভাবতে পেরেছে, বাংলোয় ফিরে কমলাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানাতে হবে। কিন্তু বিজয় ছুটির পর তাকে ছাড়ল না। অফিস থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে যেতে যেতে বলে, 'এখন আমরা একবার এস. ডি. ও'র সঙ্গে দেখা করব।'

চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক থাকলে এস. ডি. ও'র কাছে যাওয়ার কারণটা সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে ফেলত অর্জুন। বিমূঢ়ের মতো সে জিজ্ঞেস করে, 'এস. ডি. ও'র সঙ্গে দেখা করব কেন ?'

'আজ অফিসে যা যা ঘটেছে, সব তাঁকে জানাতে হবে। গভর্নমেন্ট তোমাকে নৌকরি দিয়েছে। তোমার প্রোটেকসানের দায়িত্ব তাদের।'

অর্জুন উত্তর দেয় না। অনেক ক্ষণ পাশাপাশি হাঁটার পর নিচু গলায় বলে, 'আমার ভয় করছে বিজয়।'

'কিসের ভয় ?'

'ওরা আমাকে সহজে ছাড়বে না।'

ওরা বলতে যে নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি, সেটা বুঝতে পারছিল বিজয়। সে অর্জুনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'এতগুলো লড়াই-এর পর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ, তুমি জানো। এখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না।' একটু মজা ক'রে বলে, 'রেভোলিউসান শুরু ক'রেছ, ওটা পুরো করতেই হবে। মাঝ রাস্তায় সব ফেলে পালিয়ে গেলে চলবে না।'

সংশয়ের গলায় অর্জুন বলে, 'এস. ডি. ও আমাদের থাকার জায়গা ক'রে দিয়েছেন। এর ওপর আর কি কিছু করতে রাজী হবেন ?'

'রাজী না হ'লে অন্য ব্যবস্থা তো রয়েছেই।'

অর্জুনের মনে পড়ে যায়, বিজয় সুধাকর পাণ্ডেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, তাঁর কাস্টের লোকেরা যদি রোজ রোজ মিছিল ক'রে অফিসে হানা দেয়, সে-ও লোকজন জুটিয়ে এনে সুধাকরের জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলবে।

অর্জুন এমনিতে যথেষ্ট সাহসী। নইলে আবহমান কালের সংস্কার ভেঙে গাঙ্গোতাদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারত না। কিন্তু তার সাহস অফুরন্ত কিছু নয়। বিয়ের আগে থেকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে তার জেদ এবং দৃঢ়তার ভিতে চিড় ধরতে শুরু করেছে। বিশেষ ক'রে আজ ভানপ্রতাপরা অফিসে এসে হৈচৈ বাধানোয় রীতিমত ঘাবড়েই গেছে সে। অর্জুন বলে, 'তুমি পাণ্ডে সাহেবকে যে বললে পালটা মিছিল নিয়ে যাবে, সত্যিই নেবে নাকি ?''

'নিশ্চয়ই। তোমার কি ধারণা পাণ্ডেকে ঝুটা ভয় দেখিয়ে এসেছি ?'

হঠাৎ তীব্র ব্যাকুলতায় বিজয়ের একটা হাত আঁকড়ে ধরে অর্জুন, বলে, 'না না, আর গোলমাল বাধিয়ে দরকার নেই।'

হাঁটতে হাঁটতে স্থির দৃষ্টিতে একবার অর্জুনকে লক্ষ করে

বিজয়। তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর বলে, 'অর্জুন, বন্দুকের নল থেকে গুলি বেরিয়ে যেতে দেখেছ?'

অর্জুন মাথা নাড়ে—দেখে নি।

তার হাতে আলতো চাপ দিয়ে বিজয় এবার বলে, 'না দেখলেও, নিশ্চয়ই জানো গুলিটা বেরিয়ে গেলে সেটাকে আর রোখা যায় না। আমাদের আর ফেরার পথ নেই।'

অর্জুন চুপ ক'রে থাকে।

বিজয় তাকে নজর করতে করতে বলে, 'তোমার ভয়ের কারণটা বুঝতে পারি। কিন্তু ওরা যদি ঝামেলা করে, আমাদের কি চুপচাপ বসে মার খেয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে? পালটা মার দেওয়া ছাড়া এমন কোনো পথ কি তোমার জানা আছে যাতে ওরা ঢিট হয়ে যায় কিংবা কোনো অশান্তি ঘটবে না?'

অর্জুনকে চিন্তিত দেখায়। কিন্তু অশান্তি ঘটবে না, এমন কোনো পদ্ধতির কথা এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে না। সে চুপ ক'রে থাকে।

বিজয় বলে, 'এখন যদি ভয়ে থেমে যাও, ওরা তোমাকে আর কমলাকে খতম ক'রে ফেলবে।' একটু থেমে আবার বলে, 'ছুঁয়াছুত আর জাতপাতের সওয়ালের বিরুদ্ধে যে প্রোটেস্ট নমকপুরায় শুরু হয়েছে সেটা একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাবে।'

জাতপাতের কূট সমস্যা অগ্রাহ্য ক'রে গাঙ্গোতাদের মেয়ে বিয়ে করার কারণে হাজার কুসংস্কারে ঘেরা এই নগণ্য শহরের ভিত যে তারা নাড়িয়ে দিতে পেরেছে কিংবা নানা বর্ণে নানা স্তরে ভাগ-করা হিন্দু সমাজের আবহমান গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবাদ করতে পেরেছে, ইত্যাকার বড় বড় কোনো ব্যাপারই অর্জুনের মাথায় ঢুকছিল না। সে যে একটা বিপুল সামাজিক বিপ্লব ঘটাবার জন্য কমলাকে বিয়ে করেছে তা একেবারেই না। প্রথম দেখেই মেয়েটাকে ভাল লেগে যায়। তারপর প্রতিদিনের সান্নিধ্য তাদের সম্পর্ক ক্রমশ গাঢ় ক'রে তোলে। তখন তারা এমন জোরাল

আবেগ এবং অলীক তরল স্বপ্নের মধ্যে ভাসমান যে অন্য কোনো দিকে নজর ছিল না। তারপর একদিন অর্জুনের মনে হ'ল, কমলাকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন আর থাকবে না।

যৌবন এমন এক ঋতু যখন পিছুটান থাকে না, চুলচেরা হিসেব ক'রে পা ফেলার কথা কেউ ভাবে না, তখন দুরন্ত উদ্দাম স্রোতে শুধু ভেসে যাওয়া। অর্জুনরা ভেসেই গিয়েছিল কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কী হ'তে পারে, ভাবে নি। বিয়ের পর নমকপুরা তার যাবতীয় নিষ্ঠুর প্রাচীন সংস্কার নিয়ে তাদের ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। অর্জুন এখন শুধু অসীম উৎকন্ঠায় তার আর কমলার নিরাপত্তার কথাই ভাবছে। তাদের ঘিরে যে বিপুল সামাজিক আলোড়ন শুরু হ'য়ে গেছে, সে ব্যাপারটা তার মাথায় একেবারেই নেই।

অর্জুন বিজয়ের কথার উত্তর দেয় না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বিজয় মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে বুঝতে পারছিল সে দুশ্চিন্তা বা আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সে তার কাঁধে চাপ দিয়ে দৃঢ় গলায় বলে, 'চিন্তা ক'রো না। গভর্নমেন্ট তোমাকে সবরকম প্রোটেকসান দিতে বাধ্য। তা ছাড়া নমকপুরার আপার কাস্টের ভুচ্চরগুলো ছাড়া অন্য মানুষও আছে। আমার ধারণা, তাদের বোঝাতে পারলে অনেকেই তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এস. ডি. ও'র বাংলোর কাছে এসে পড়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকে, 'রুখ যাইয়ে, রুখ যাইয়ে—'

চমকে মুখ ফেরাতেই অর্জুনরা দেখতে পায় একটা সাইকেল রিকশায় ক'রে সুরেশ আসছে।

আশ্চর্য, সকাল থেকে নানা উলটো-পালটা ঘটনায় সুরেশের

কথা একবারও মনে পড়ে নি অর্জুনের। অথচ পাটনার এই পত্রকার তাদের পক্ষে একটা বড় রকমের ভরসা। কাল রাতে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পৌঁছে দেবার পর সেই যে সে চলে গিয়েছিল তারপর এখন আবার দেখা হ'ল। সকাল থেকে এই সন্ধে পর্যন্ত সে কী করেছে, কে জানে।

রিকশা অর্জুনদের কাছে এসে থেমে যায়। সীট থেকে রাস্তায় নেমে দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুরেশ অর্জুনকে বলে, 'আপনাদের অফিসে এসেছিলাম, গিয়ে দেখি ছুটি হয়ে গেছে। তাই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় যাচ্ছিলাম। ভালই হয়েছে, রাস্তায় দেখা হ'য়ে গেল।' একটু থেমে ফের বলে, 'অফিসে গিয়ে একটা খারাপ খবর পেলাম। এখানকার ব্রাহ্মণরা নাকি অর্জুনের এগেনস্টে ডেমোনেস্ট্রেসন করেছে ?'

আস্তে মাথা নাড়ে অর্জুন, আবছা গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

মুখ শক্ত হ'য়ে ওঠে সুরেশের। কঠোর গলায় বলে, 'এরা ভেবেছে কী ? যা খুশি করবে ? দেশটা কি ওদের একার প্রোপার্টি ? ওদের ইচ্ছামতো সব চলবে ?'

কেউ উত্তর দেয় না।

সুরেশ এবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা নিশ্চয়ই এখন পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় ফিরছেন। ওখানে বসে একটা কিছু ঠিক ক'রে নিতে হবে। এই টরচার কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যায় না।'

বিজয় বলে, 'আমরা এখন বাংলোয় ফিরছি না।'

'কোথায় যাচ্ছেন তা হ'লে ?'

'এস ডি. ও'র বাংলোয়।'

বেশ অবাকই হ'য়ে যায় সুরেশ, 'হঠাৎ ওখানে !'

বিজয় কারণটা জানিয়ে দিলে সুরেশ বলে, 'ঠিক ডিসিসান নিয়েছেন। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।'

বিজয় বলে, 'নিশ্চয়ই যাবেন। যখন পেয়েই গেছি, আপনাকে

ছাড়ছে কে?' একটু চিন্তা ক'রে জিজ্ঞেস করে, 'সারাদিন কোথায় ছিলেন ?'

অর্জুন এবং বিজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ জানায়, পত্রকার হিসেবে অর্জুনদের বিয়ের ব্যাপারে একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করতে চায়। আগের বার যখন এসেছিল, তখন বিয়ের রিপোর্ট এবং শ্বশুরবাড়িতে কমলাকে কিভাবে এবং কতটা মেনে নেওয়া হয়েছে তার ওপর একটা 'স্টোরি' করেছিল। আজ সমস্ত দিন নমকপুরার নানা জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের সঙ্গে দেখা ক'রে এই বিয়ের ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া যোগাড় করছিল। স্কুলমাস্টার উকিল কবিরাজ ডাক্তার ছাত্র বিজনেসম্যান কেরানি—এমনি বহু ধরনের লোকের মন্তব্য টেপ করেছে সে। আরো অজস্র মানুষের বক্তব্য টেপ ক'রে দু-একদিনের মধ্যে লেখাটা পাটনায় তার অফিসে পাঠিয়ে দেবে। নানা জায়গায় ঘোরাঘুরির কারণে সুরেশ তাদের সঙ্গে এতক্ষণ যোগাযোগ করতে পারে নি।

বিজয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'লোকজনের রি-অ্যাকসান কেমন দেখলেন ?'

সুরেশ অল্প হাসে। বলে, 'সেটা আপনিও জানেন। ভেরি ভেরি ব্যাড রি-অ্যাকসান। এটাই এক্সপেক্টেড ছিল। তবে—'

'তবে কী ?'

'এর ভেতর একটা সিলভার লাইনিংও চোখে পড়েছে।

বিজয় এবং অর্জুন সুরেশকে লক্ষ করতে থাকে। গভীর আগ্রহে বিজয় বলে, 'কিরকম ?'

সুরেশ জানায় যারা পুরনো সংস্কার ছাড়ার কথা ভাবতে পারে না, যারা ঝানু ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট, তাদের ধারণা ব্রাহ্মণ-অচ্ছুতের বিয়েতে সনাতন হিন্দুধর্মের সত্যনাশ হয়ে যাবে। এই সব ভ্রষ্টাচার আর অন্যায় রুখতে না পারলে ভারতবর্ষের ধ্বংস অনিবার্য। বেদ-উপনিষদের সময় থেকে এ দেশের কিছু নিয়ম

কিছু প্রথা চলে আসছে, সেগুলিই ভারতকে স্থিতিশীলতা এবং মর্যাদা দিয়েছে। সেগুলো ভেঙে ফেললে দেশের আর রইল কী? ময়ূর আর নালিয়ার পোকা কি এক হ'তে পারে? পারে না। তেমনি বামহন আর অচ্ছুতের পক্ষে সমান মর্যাদা পাওয়া সম্ভব না। সবাই যদি এক হবে তা হ'লে ব্রাহ্মণ কায়াথ ক্ষত্রিয় অচ্ছুত সব আলাগ আলাগ কেন? ঈশ্বরের মর্জিতে ধর্মের সুরক্ষার জন্য জাতপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে যদি কল্যাণ না থাকত, এত জাত হ'ত না। এক মাপের হাজার ডিব্বা, হাজার গিলাস, হাজার কাকাই কারখানা থেকে বেরোয়। ভগোয়ান ব্রহ্মা ভাল না বুঝলে একহী ছাঁচ বানিয়ে সব মানুষকে বিলকুল একই রকম চেহারা, বুদ্ধি আর রুচি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতেন। আসলে ভগোয়ানের ইচ্ছা, আলাদা আলাদা জাত আলাদা আলাদা থাক। কোঈ বিরোধ নেহী, কোঈ ঝুটঝামেলা নেহী। নিজের নিজের বাউণ্ডারির ভেতর সবাই থাকো। কেউ অন্যের ব্যাপারে নাক ঢুকিও না, স্থিতিশীলতা এবং শান্তি বজায় থাক। কিন্তু অর্জুন আর কমলা যা করেছে তাতে এতদিনের সামাজিক প্যাটার্ন এবং স্থিতাবস্থা একেবারে চুরমার হয়ে যেতে বসেছে। এটা যেভাবেই হোক, আটকাতে হবে।

সুরেশ বলতে থাকে, 'সংস্কার ভাঙার কথায় যাদের রাতের ঘুম ছুটে যায় তারা ছাড়াও ইয়াংগার জেনারেসন রয়েছে। আমি এখানকার কলেজে গিয়েছিলাম। বেশ ক'টি ব্রাইট ছেলেমেয়ে আর অল্প বয়েসের দু'জন লেকচারার এই বিয়েকে স্বাগত জানিয়েছে। এই রকম আরো অনেক মানুষ আছে যারা অর্জুন-কমলাকে সাপোর্ট করবে। ভরসা হচ্ছে, দেশটা ওল্ড ফসিলদের হাতে পুরোপুরি চলে যায় নি।'

উৎসাহে চোখ চকচক করতে থাকে বিজয়ের, 'ঐ কলেজ স্টুডেণ্ট আর লেকচারার দু'জনের নাম জেনে নিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই। ওদের নাম ঠিকানা কমেণ্ট, সব কিছু ওদের ভয়েসে টেপ ক'রে নিয়েছি।'

'আচ্ছা—'

'বলুন।'

'যাদের ইন্টারভিউ টেপ করেছেন তারা কোন কাস্টের ?'

'সারনেম শুনে বুঝতে পেরেছি আপার কাস্টের। ব্রাহ্মণ, কায়াথ, রাজপুত ক্ষত্রিয়—এইসব। হঠাৎ কাস্টের কথা জানতে চাইলেন ?'

বিজয় বলে, 'লোয়ার কাস্টের লোকেরা এ বিয়ে ওয়েলকাম করতে পারে কারণ তারা হয়তো ভাববে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে নাতেদারি ক'রে আমরা উঁচুতে উঠলাম। আপার কাস্টের লোকেরা যদি এটা মেনে নেয় তা হ'লে বোঝা যাবে এদের ভবিষ্যৎ আছে। কেননা তারাই সোসাইটিকে কনট্রোল করে, দেশ চালায়।'

সুরেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'কারেক্ট, কারেক্ট।'

'আরেকটা কথা সুরেশজি—'

'কী ?'

'আমার ধারণা, আপনি আজ শুধু নমকপুরার আপার কাস্টের এডুকেটেড ক্লাসটারই ইন্টারভিউ নিয়েছেন।'

খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে সুরেশ বলে, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে বিজয় বলে, 'এই সঙ্গে আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে।'

'কী ?'

'অচ্ছুতটোলায় গিয়ে তাদের ইন্টারভিউও নেবেন। ওটার খুব দরকার।'

এদিকটা আগে ভেবে দেখেনি সুরেশ। বিজয় বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নেয় ঐ ইন্টারভিউ'র প্রয়োজন কেন এবং কতটা। সে উৎসুক সুরে বলে, 'নিশ্চয়ই নেব। ওদের মতামতও ভীষণ জরুরি। কিন্তু আপনি একটু আগে একটা কথা বলেছেন। সেটা—'

সুরেশকে শেষ করতে না দিয়ে বিজয় বলে ওঠে, 'উঁচু জাতের সঙ্গে নাতেদারি করতে পারলে অচ্ছুতরা খুশি হবে, এই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও সেই রকম ধারণা। কিন্তু সে কথা ওরা মুখ ফুটে বলতে পারবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

সুরেশ খানিকটা অবাকই হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'পারবে না কেন?'

'ভয়ে সুরেশজি, ভয়ে। বলছিলাম না, আপার কাস্টের লোকেরা দেশ কনট্রোল করে, সোসাইটি চালায়। ওরা খুশি হয়েছে জানালে মান্ধাতা শর্মারা ওদের শেষ ক'রে ফেলবে। একটা ব্যাপার হয়তো আপনি ভুলে গেছেন—'

'কী?'

'রামঅবতারজি অর্জুনদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর কম্‌লার বাবা কিন্তু মেয়ে আর দামাদকে নিজের বাড়িতে শেলটার দিতে সাহস পায় নি।'

'ঠিক।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সুরেশ।

কথায় কথায় অর্জুনরা এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে চলে আসে। গেটের সামনে যথারীতি দু'জন আর্মড গার্ড পাহারা দিচ্ছে। গার্ড দু'জন অর্জুনকে ভাল ক'রেই চেনে, বিজয় এবং সুরেশও তাদের অচেনা নয়।

একটি গার্ড এগিয়ে এসে বলে, 'ভাল আছেন অর্জুনজি—'

অর্জুন মলিন হেসে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়। বলে, 'এস. ডি. ও সাহেব বাংলোয় আছেন?'

'আছেন।'

'আমরা দেখা করতে চাই।'

'একটু দাঁড়ান। আমি খবর দিয়ে আসছি।'

চন্দ্রকান্ত সরযূ যতদিন ছিলেন ভেতরে যাবার জন্য অনুমতির দরকার হতো না। পাহারাদারদের হুকুম দেওয়া ছিল অর্জুনকে দেখলেই যেন গেট খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু চন্দ্রকান্তরা চলে

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাংলোর নিয়মকানুন একেবারে পালটে গেছে।

একটু পর প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই গার্ডটা এসে গেট খুলে দিতে দিতে বলে, 'আসুন। এস. ডি. ও সাব নিচের ঘরে আছেন। আপনাদের ওখানেই যেতে বলেছেন।'

কিছুদিন আগেও এই বাড়িতে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে গেছে অর্জুন। সামনের এই 'লন'-এ প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটিয়ে তার আর কমলার বিয়ে হয়েছিল। তাদের নিয়ে সেদিন কী বিপুল সমারোহ! পাটনা থেকে মন্ত্রী শুকদেও ঝা ছাড়া এম. এল. এ, এম. পি, এস. পি, ডি. এম ইত্যাদি কত যে মান্যগণ্য মানুষ এসেছিলেন তার হিসেব ছিল না। অবশ্য মান্ধাতারা মিছিল ক'রে হানা দেওয়ায় টেনসানও ছিল যথেষ্ট। তবু তাকে ঘিরেই ছিল সেদিনের যাবতীয় উৎসব। সমস্ত কিছুর নায়ক সে। এ জন্য এক ধরনের চাপা গর্ব অনুভব করেছিল অর্জুন। সে ছাড়া নমকপুরার আর কারো বিয়েতে এত হৈচৈ, এত গোলমাল, এত উত্তেজনা আর কখনও নি। এত বড় বড় সব লোকও নিজেদের সমস্ত জরুরি কাজকর্ম ফেলে রেখে একটি বিয়ের জন্য নমকপুরায় দৌড়ে আসেন নি।

সেদিনের তুলনায় আজ এই বাংলোটা একেবারে নিঝুম। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু চেনা মালীটা ওধারের বাগানে বড় কাঁচি দিয়ে ফুলগাছের মরা পাতা বা ডাল ছেঁটে যাচ্ছে। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে হাতজোড় ক'রে সে 'নমস্তে' জানায়। অর্জুনও হাতজোড় করে। যে ক'দিন সে এখানে থেকে গেছে, বাংলোর ক্লাস ফোর স্টাফের লোকেদের ব্যবহারে বিনয়ে মুগ্ধ হয়েছে অর্জুন। মানুষগুলি সত্যি চমৎকার।

একতলার ড্রইং রুমে আসতেই মহেশ্বরপ্রসাদকে দেখা গেল। তাঁর পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি। নমকপুরার সাব রেজিস্ট্রার ধনিকলাল তেওয়ারির সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন।

অর্জুনদের দেখে ধনিকলাল উঠে পড়েন, বলেন, 'আজ উঠি। পরশু আবার আসব।'

'ঠিক আছে।' মহেশ্বরপ্রসাদও উঠে দাঁড়ান। অর্জুনদের বসতে ব'লে ধনিকলালকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফের নিজের সোফায় এসে বসতে বসতে নিরুৎসুক স্বরে বলেন, 'নতুন কিছু প্রবলেম হয়েছে নাকি?'

সুরেশ বলে, 'হ্যাঁ।'

মহেশ্বরপ্রসাদ বলেন, 'অর্জুন চৌবেকেই বলতে দিন। প্রবলেমটা ওর।' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, একজন পত্রকারকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য তিনি খুশি হ'ন নি।

সুরেশ তর্কাতর্কির মধ্যে গেল না। তাতে মহেশ্বর-প্রসাদের মেজাজ খারাপ হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে চুপ ক'রে থাকে।

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ, স্যার। অফিসে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

ভুরু কুঁচকে যায় মহেশ্বরপ্রসাদের, 'কেন?'

আজ ভানপ্রতাপরা এসে অফিসে যে সব কাণ্ড করেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে অর্জুন বলে, 'এরকম চলতে থাকলে আমি কী ক'রে কাজ করব স্যার?'

বিজয় বলে, 'কোনো সিভিলাইজড কাণ্ট্রিতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবা যায় না।'

বিজয়কে পুরোপুরি অগ্রাহ্য ক'রে মহেশ্বরপ্রসাদ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনাকে কিন্তু সেদিনই একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম। আপনি তো শুনলেন না। তখন শুনলে এসব হাঙ্গামা হতো না।'

বুঝতে না পেরে অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী পরামর্শ?'

'অন্য কোথাও ট্রান্সফার নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তারপর টেনসান কমলে এখানে চলে আসতে পারতেন।'

ঠিক একই ধরনের কথাই আজ বলেছেন সুধাকর পান্ডে। সবাই অর্জুনের সমস্যা নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে চায়।

অর্জুন কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুরেশ হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনি কি প্রবলেমের সলিউসান হিসেবে এখনও অর্জুনের ট্রান্সফারের কথা ভাবছেন?'

মহেশ্বর বিরক্ত হলেন না। সুরেশের দিকে ফিরে বলেন, 'ঠিক তাই। মাঝে মাঝে সামনাসামনি কনফ্রনটেসনে না গিয়ে ডিপ্লোম্যাসির আশ্রয় নিতে হয়। তাতে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যায়। দু-একটা বছর অন্য জায়গায় থেকে এলে ক্ষতি কী? আপনি অর্জুনজিকে একটু বোঝান না—'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু—'

'কী?'

'অর্জুন কিন্তু একটা প্রিন্সিপ্যালের জন্য, তার রাইটসের জন্যে লড়ছে। ঝামেলা এড়াতে চাইলে আগেই ও ট্রান্সফার নিতে পারত।'

'তার মানে ও এখান থেকে যাবে না।'

'আমার তাই মনে হয়। এতটা লড়াই-এর পর পালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না।'

মহেশ্বর হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে যান। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'আমার কাছে আপনারা কী জন্যে এসেছেন? নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি অর্জুনজির অফিসে যে ডেমোনেস্ট্রেসন করেছে তার খবর দিতে?'

এবার বিজয় আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'না স্যার।'

'তবে?'

'আমরা অর্জুনের প্রোটেকসানের জন্যে আপনার কাছে অ্যাপীল করতে এসেছি।'

'তার মানে?'

'ওর বিরুদ্ধে যে হামলা হচ্ছে সেটা যাতে বন্ধ হয়, দয়া ক'রে আপনাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মহেশ্বরের ভুরু কুঁচকে যায়। ঠোঁট কামড়ে কী চিন্তা করেন, তারপর বলেন, 'অর্জুনজির গায়ে কি ওরা হাত তুলেছে? আই মীন কোনো ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট?'

'না স্যার।' বিজয় মাথা নাড়তে থাকে।

'মারধোর করে নি, এই অবস্থায় প্রোটেকসানের কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না। আর যদি ডেমোনেস্ট্রেসন মিছিল আর স্লোগানের প্রশ্ন তোলেন, তা হ'লে বলব ডেমোক্রেসিতে ওগুলো সবার বেসিক রাইট।'

সুরেশ বলে, 'যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

সুরেশের কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে সন্দিগ্ধ গলায় মহেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপারে?'

'আমরাও পাল্টা মিছিল, ডেমোনেস্ট্রেসন করতে পারব, স্লোগান দিতে পারব।'

মহেশ্বরকে বেশ বিচলিত দেখায়। তাঁর শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। বলেন, 'আপনারা ওসব করবেন নাকি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

'দরকার হ'লে অবশ্যই করব। আপনিই তো বললেন ডেমোক্রেসিতে ঐ রাইটগুলো সবার রয়েছে।'

মহেশ্বর বিব্রত বোধ করেন। বুঝতে পারেন একজন ঝানু প্রশাসক হ'য়ে অমন আলগাভাবে 'বেসিক রাইটে'র কথা বলা তাঁর উচিত হয় নি। নিজের তৈরি ফাঁদে তিনি আটকে গেছেন। নরম গলায় বলেন, 'ওসব করলে অশান্তি আর টেনসান শুধু বাড়বে সুরেশজি। আপনারা শিক্ষিত রিজনেবল লোক, অ্যাডমিনিস্ট্রেসন আপনাদের কাছ থেকে কো-অপারেসন আশা করে।'

বিজয় বলে, 'আমাদের কাছেই শুধু আশা করেন। ওদের কাছে করেন না?'

ওদের বলতে বিজয় যে আপার কাস্টের লোকজনের কথা বলছে, সেটা ধরতে অসুবিধা হয় না মহেশ্বরের। বলেন, 'ওদের কাছেও নিশ্চয়ই আশা করব। তবে জানেনই তো ওরা বেশ গোঁড়া, সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।'

'যাতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। অর্জুন কোনো বে-আইনি কাজ করে নি। মিনিস্টার, এম. পি, এম. এল. এ—এমনি অনেক বড় বড় লোক তার বিয়েতে হাজির ছিলেন। গভর্নমেন্টের ব্লেসিং সে পেয়েছে। তার ওপর টরচার ক'রে আপার কাস্টের লোকেরা বরং বে-কানুনি কাজ করছে। তার প্রোটেকসানের বন্দোবস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেসনকেই করতে হবে।'

'কিছুক্ষণ আগে আপনাদের তো বললাম গায়ে হাত না পড়লে আমরা কিছু করতে পারি না।'

'তার মানে খুন-জখম না হ'লে আপনারা কিছুই করবেন না।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। কিছু ক্ষমতা থাকলেও আমার হাত-পা বাঁধা। আইনের বাইরে বেরুবার উপায় আমার নেই।'

বিজয় জানায়, 'ঠিক আছে, অর্জুনের সুরক্ষার দায়িত্বটা তা হ'লে আপনাদেরই নিতে হবে। আচ্ছা নমস্তে —' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

মহেশ্বর ভেতরে ভেতরে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে যান। কৌশলী অফিসার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে বিজয়রা দেখা করতে চাইলে তিনি তাদের বাংলোয় ঢুকতেই দিতেন না। পাহারাদারদের দিয়ে গেটের বাইরে থেকে হাঁকিয়ে দিতেন। কিন্তু এই 'কেস'টা একেবারে আলাদা।

যদিও মহেশ্বর কট্টর ব্রাহ্মণ এবং উঁচু জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে প্রয়োজনমতো সরকারী ক্ষমতাও কাজে লাগাতে দ্বিধা করেন না তবু অর্জুন তাঁকে যথেষ্ট বিপাকে ফেলে দিয়েছে। এই ছোকরার বিয়েতে মন্ত্রী, এম. পি, এম. এল. এ-রা জড়িয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষ ক'রে সরকারী ক্ষমতা যাঁদের হাতে, ভীষণ ভয় ক'রে চলেন মহেশ্বর। ব্রাহ্মণত্বের গায়ে আঁচড় লাগলে তিনি যতটা কাতর হবেন তার হাজার গুণ বিচলিত হবেন যদি রুষ্ট প্রশাসন খেপে গিয়ে তাঁকে কোনো জায়গায় ছ'মাসও টিকতে না দিয়ে ক্রমাগত নেপাল বর্ডারে কি ভোজপুরে কি আরায় কি কোনো প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাটের জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আজকাল বিহারের নানা জায়গায় জাতপাত তো বটেই, জমি বা অরণ্যের অধিকার, বান্ধুয়া কিষাণদের মুক্তি, ইত্যাদি ব্যাপারে রোজ খুন খারাপি, গাঁ জ্বালানো, দাঙ্গাহাঙ্গামা, অশান্তি লেগেই আছে। ঐ সব 'ট্রাবলড স্পটে' তিনি একেবারেই যেতে চান না।

তা ছাড়া অর্জুনদের সঙ্গে একজন পত্রকার জুটে গেছে। এই শ্রেণীটিকে তিনি এড়িয়েই চলতে চান। কী লিখতে এরা কী লিখে বসবে, ঠিক নেই। তাতে অফিসার হিসেবে মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে, ডি. এম থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবাই তাঁর কৈফিয়ত তলব ক'রে বসবেন। চাকরি জীবনে সুনামের এতটুকু হানি ঘটুক, এটা তিনি একেবারেই চান না। নমকপুরায় আসার পর অর্জুনদের কেসটা তাঁকে এমন একটা সরু দড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার দু'ধারেই অতল খাদ। অসীম ধৈর্যে, খুব সন্তর্পণে তাঁকে পা ফেলতে হবে।

মহেশ্বর ব্যস্তভাবে বলেন, 'আরে উঠে পড়লেন কেন? বসুন বসুন—'

বিজয় তাঁর চোখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ফের বসে পড়ে।

মহেশ্বর এবার বলেন, 'ওদের নিশ্চয়ই বোঝাবো। কিন্তু সবার আগে আপনাদের সহযোগিতা আমার দরকার। বুঝতেই পারছেন ওরা খেপে রয়েছে। আপনারাও যদি মাথা গরম করেন, কাজের কাজ কিছুই হবে না। গোলমালটা ট্যাক্টফুলি সামলানো দরকার।'

মহেশ্বর যে ঝানু প্রশাসক, কথার মারপ্যাঁচে বিরুদ্ধ পক্ষকেও যে নরম ক'রে ফেলতে পারেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর যুক্তি যে একেবারে অসার নয়, বিজয় তা বুঝতে পারে। বলে, 'ঠিক আছে, আমাদের সহযোগিতা পাবেন কিন্তু ওদেরও আপনাকে বোঝাতে হবে, ঝামেলা করলে পার পাবে না। যদি না বুঝতে চায় কী ব্যবস্থা করা দরকার, সেটা আমার চেয়ে আপনি নিশ্চয়ই অনেক ভাল জানেন।'

মহেশ্বর আস্তে মাথা নাড়েন, তবে কোনো মন্তব্য করেন না।

ঠিক এই সময় জরুরি কথাটা মনে পড়ে যায় অর্জুনের। সে বলে, 'স্যার, আরেকটা নতুন প্রবলেম তৈরি হয়েছে।'

মহেশ্বরের কপাল কুঁচকে যায়। তিনি বলেন, 'আবার কী হ'ল?'

অর্জুন জানায়, যে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় সে এবং কমলা উঠেছে সেখানে সাত দিনের বেশি তাদের থাকতে দেওয়া হবে না।

মহেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কেন?'

'ওখানকার কেয়ার-টেকার বলছিলেন, এটাই নাকি নিয়ম।'

'আমি ঠিক জানি না। তবে কেয়ার-টেকার যখন বলেছে, জেনেশুনেই বলেছে।'

অর্জুন বলে, 'সাত দিন পর আমরা কোথায় যাব স্যার?' তার গলায় উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

তুখোড় প্রশাসকটি এবার মহেশ্বরের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নমকপুরার কোথাও থাকার জায়গা না পেলে শেষ পর্যন্ত ট্রান্সফার চাইতেই হবে অর্জুনকে। তাতে দুর্ভাবনা টেনসান কেটে যাবে মহেশ্বরের। তিনি নকল সহানুভূতির সুরে বলেন, 'বহুত আপসোসকি বাত। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার যে কিছুই করার নেই।'

'সাতদিন পর আমাদের কি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে?'

'এর জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। কানুনের মধ্যে

থেকে যা করতে বলবেন, করব। তার বাইরে পা ফেলা অসম্ভব। আমি কানুনের নৌকর।'

সুরেশ স্থির দৃষ্টিতে মহেশ্বরকে লক্ষ করছিল। এস. ডি. ও'র মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল সে। বলে, 'ঠিক আছে অর্জুনজি, আপাতত দিন সাতেকই থাকুন। তারপর কী করা যায়, ভাবা যাবে। হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে।'

বিজয় বলে, 'তা হ'লে এখন যাওয়া যাক।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'নমস্তে স্যার—'

মহেশ্বরও উঠে পড়েছিলেন। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

কেউ উত্তর দেয় না।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়ায় বিজয়। বলে, 'আরো একটা কথা ছিল স্যার।'

এবার বিরক্তই হ'ন মহেশ্বর। ঈষৎ রূঢ় গলায় প্রশ্ন করেন, 'অ্যানাদার নিউ প্রবলেম?'

বিজয় বলে, 'প্রবলেমও বলতে পারেন। তবে ষড়যন্ত্র বললেই ঠিক হয়।'

মহেশ্বর ভেতরে ভেতরে সামান্য থতিয়ে যান। সেই সঙ্গে সামান্য কৌতূহলও বোধ করেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কিরকম?'

'অফিসে অর্জুনকে কোনো রকম কাজ দেওয়া হচ্ছে না।'

'মানে?'

সারা দিন বিনা কাজে চুপচাপ বসিয়ে রাখার ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় বিজয়।

মহেশ্বর প্রশ্ন করেন, 'এর মধ্যে ষড়যন্ত্র কোথায়?'

'কী বলছেন স্যার! এভাবে বসিয়ে রাখতে রাখতে ওরা একদিন প্রমাণ ক'রে দেবে অর্জুন অপদার্থ, কাজ করার কোনোরকম যোগ্যতাই নেই।'

'এটা ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসের ব্যাপার। ওখানে আমার কিছু করণীয় নেই। তেমন বুঝলে অর্জুনজি ঐ ডিপার্টমেন্টের হায়ার অথরিটিকে জানাতে পারেন।'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকে বিজয়। তারপর বলে, 'ঠিক আছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সুরেশ বলে, 'এই ভদ্রলোক অর্জুনের জন্যে বিশেষ কিছু করবেন বলে মনে হয় না। তেমন কোনো সাহায্য ওঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।'

বিজয় মাথা হেলিয়ে সায় দেয়, 'আমারও সেইরকমই ধারণা।'

'যা করার অর্জুন আর আপনাকেই করতে হবে।'

'হ্যাঁ। আপনাকেও পাশে চাই।'

'আমি আপনাদের পাশেই আছি। তবে সবসময় তো আমার পক্ষে এই নমকপুরায় থাকা সম্ভব নয়। পাটনায় ফিরে যেতেই হবে। অবশ্য যখনই খবর দেবেন, চলে আসব।'

'তা হ'লেই যথেষ্ট। আপনি সঙ্গে থাকলে আমরা অনেক জোর পাব।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পৌঁছে যায়।

সূর্য পশ্চিম আকাশের দিগন্তের তলায় নেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে। রোদ নেই। তবু হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লালচে একটু আভা এখনও লেগে আছে গাছপালার মাথায়, ফসলের ফাঁকা মাঠে এবং আকাশের গায়ে।

॥ ষোল ॥

দিন চারেক কেটে যায়।

এর মধ্যে রোজই ভানপ্রতাপরা অর্জুনের অফিসে এসে হানা দিয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিকেট ক'রে বসে থেকেছে এবং গলা

ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েছে। ব্রাহ্মণত্বের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য অর্জুনকে নমকপুরা থেকে তাড়াতেই হবে। নইলে তার বিপজ্জনক নোংরা দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঁচু জাতের ছেলে ছোকরারা অচ্ছুৎটোলি থেকে একেকটা ছোকরি ধরে এনে 'সত্যনাশ' ক'রে ছাড়বে।

অর্জুনরা খবর পেয়েছে এভাবে অফিসে গোলমাল বাধিয়েই ব্রাহ্মণদের সব শক্তি এবং উদ্যম শেষ হ'য়ে যায় নি। স্বয়ং মান্ধাতা শর্মা নাকি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা পাটনা চলে গেছে। ক্যাবিনেটে শুকদেও ঝা'ই একমাত্র মন্ত্রী নেই, আরো অনেক মন্ত্রীই রয়েছেন যাঁরা ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতা রক্ষায় আগ্রহী, চরম বিনাশ থেকে উচ্চ বর্ণকে রক্ষার জন্য তাঁরা সব কিছু করতে পারেন।

মান্ধাতা ছোট শহরের নগণ্য এক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হ'লেও চুনাওতে জিতে তাকে নির্বাচিত হ'তে হয়েছে। ভোটের রাজনীতি সে ভালোই বোঝে। তার উদ্দেশ্য, পাটনায় গিয়ে তার জানাশোনা একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এম. এল. এ'কে ধরে মন্ত্রীদের কাছে যাবে। এমনকি স্বয়ং শুকদেও ঝা'র কাছেও। তাঁদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, নমকপুরায় মাইনোরিটি আর অচ্ছুৎদের ভোট মিলিনে শতকরা তিরিশ ভাগের বেশি ভোট হবে না। বাকি সেভেনটি পারসেন্ট ভোট আপার কাস্টের লোকেদের। পরের নির্বাচনের খুব দেরি নেই। বড় জোর বছরখানেক। মন্ত্রীরা, বিশেষ ক'রে শুকদেও ঝা যদি মনে ক'রে থাকেন ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে অচ্ছুতের মেয়ের বিয়ে দিয়ে থার্টি পারসেন্টের জোরে চুনাওতে তরে যাবেন, তা হ'লে মুর্খের রাজত্বে বাস করছেন। সেভেনটি পারসেন্টের কাছে হাঁটু গেড়ে তাঁদের হাত পাততেই হবে। অর্জুনকে যদি নমকপুরা থেকে তাড়ানো না হয়, বাধ্য হ'য়ে মান্ধাতারা শুকদেওদের অপোজিসান পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য আপার কাস্টের দরজায় দরজায় ঘুরবে। ব্রাহ্মণত্বের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো রফা নেই। আর কোনো অস্ত্রে না হ'লেও ভোট

এমনই এক ব্রহ্মাস্ত্র যাতে সব পার্টির সব ক্যান্ডিডেটই কাবু হ'য়ে যায়। এম এল. এ, এম. পি বা মন্ত্রী না হ'তে পারলে রাজনৈতিক কেরিয়ার তাদের শেষ। কাজেই ব্রুট মেজরিটির ভয় দেখালে সুড় সুড় ক'রে তাঁরা অর্জুনকে নমকপুরা থেকে অন্য কোথাও ট্রান্সফার করিয়ে দেবেন।

এই সব মারাত্মক খবর অর্জুনকে ভীষণ বিচলিত ক'রে তোলে। বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত। বিজয় বা সুরেশ কিন্তু একেবারেই ভয় পায় নি। এ ক'দিন তারা চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি। বিজয় রাঁচী আর মজঃফরপুরে তাদের 'প্রগতিবাদী হিন্দু সমস্কার সংস্থান'-এর অফিসে চিঠি লিখে জানিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু মেম্বারকে যেন নমকপুরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নমকপুরায় তাদের সংস্থান খুব জোরালো নয়। মাত্র ক'মাস হ'ল বিজয় এখানে এসেছে, এখনও সেভাবে সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি। তার ইচ্ছা রাঁচী মজঃফরপুর থেকে সংস্থানের ছেলেরা এসে গেলে তারা ব্রাহ্মণদের পাল্টা মিছিল বের ক'রে তাদের অফিসে তো যাবেই, সারা নমকপুরায় ঘুরে ঘুরে স্লোগান দেবে। নমকপুরা শহরকে বুঝিয়ে দেবে অর্জুনদের ওপর যে নির্যাতন চলছে সেটা বরদাস্ত করা হবে না, তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো মানুষও আছে।

শুধু রাঁচী মজঃফরপুরের ওপর নির্ভর ক'রে বসে থাকে নি বিজয়রা। সে জানে, স্থানীয় মানুষজনের সমর্থনও একান্ত জরুরি। 'সন্স অফ দা সয়েল'-এর সহযোগিতা না পাওয়া গেলে বাইরের মদতে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। তাই সুরেশ এবং সে এখানকার কলেজে আর ছেলেদের ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে ক'দিন ধরে সমানে বোঝাচ্ছে, ব্রাহ্মণ মৌলবাদীরা কিভাবে অর্জুনদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বার বার এসে বোঝানোয় নমকপুরার যুবকদের কাছ থেকে ভালই সাড়া পাওয়া গেছে।

বিজয় এবং সুরেশ অচ্ছুৎটোলিতেও গেছে। সেখানে ধাঙড় গাঙ্গোতা গঞ্জু দোসাদ হিন্দু খিস্টান—সবাইকে জড়ো ক'রে

বুঝিয়েছে অর্জুনদের পেছনে গিয়ে তাদেরও দাঁড়ানো দরকার। ভারতের সংবিধান দেশের সব মানুষকে সমানাধিকার দিয়েছে। এখানে কেউ কারো ওপরে বা নিচে নয়।

অচ্ছুৎদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর খবর। তারা জিজ্ঞেস করেছে, 'সব বরাবর (সমান)?'

বিজয়রা বলেছে, 'হ্যাঁ।'

'বামহন কায়াথের সঙ্গে ধাঙড় দোসাদের কোনো ফারাক নেই?'

'বিলকুল না। দেখ নি, ভোটে মান্ধাতা মিশ্রর ভোটের দামও যা, তোমাদের টৌলির লোকেদের ভোটের দামও তাই।'

এরপর কেউ আর কোনো প্রশ্ন করে নি।

বিজয় বলেছে, 'উঁচা জাতের সঙ্গে তোমাদের বরাবর করার জন্যে অর্জুন কত কষ্ট করছে। তোমরা যদি তার পাশে গিয়ে না দাঁড়াও মান্ধাতা শর্মারা তাকে আর কমলাকে শেষ ক'রে ফেলবে। কমলাকে বিয়ে ক'রে সে তোমাদের সম্মান দিতে চাইছে আর তার বিপদের সময় তোমরা তাকে দেখবে না?' একটু থেমে বলেছে, 'অর্জুনকে যদি মদত না দাও সারা জীওন উঁচা জাতের জুতোর তলায় তোমাদের পড়ে থাকতে হবে।'

বিজয়দের কথাগুলো শেষ পর্যন্ত খানিকটা মাথায় ঢুকেছে অচ্ছুৎটোলার বাসিন্দাদের। তারা বুঝেছে কমলা এবং অর্জুনের জন্য কিছু করা খুবই জরুরি।

এখানে কমলার মা এবং বাপ নাথুনি আর জগলাল বিজয়দের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছে। অর্জুনের সঙ্গে কমলার বিয়ের ব্যাপারটা চাউর হবার পর থেকেই ভয়ে তারা সিঁটিয়ে আছে। এ বিয়েতে তাদের একেবারেই মত ছিল না। তার কারণ সংস্কার। ব্রাহ্মণের মতো সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের সঙ্গে তাদের মতো অচ্ছুৎদের বিয়ে হওয়া সম্ভব, এটা তারা চিন্তাই করতে পারে না। তবু যখন বিয়েটা হ'য়েই গেল, তারা একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিল। বিয়েতে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে তাদের আলাদা

করে নিমন্ত্রণও করেছিলেন চন্দ্রকান্ত কিন্তু ভয়ে তারা যায় নি। তবে কম্‌লা অর্জুনের বিয়ের পর গোটা নমকপুরা জুড়ে যে তুলকালাম কান্ড চলছে তাতে নাথুনি এবং জগলাল ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। উৎকন্ঠায় দুর্ভাবনায় আর মারাত্মক ভয়ে তারা রাতে ঘুমোতে পারছে না। লোকে উল্টোপাল্টা নানারকম ভীতিকর খবর নিয়ে আসছে। এতে উদ্বেগ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। অথচ নিজেরা বাইরে গিয়ে যে কম্‌লাদের সঠিক খবর নিয়ে আসবে সেই সাহসটুকু পর্যন্ত নেই।

বিজয়দের অভাবিতভাবে কাছে পেয়ে হাতজোড় করে জগলাল বলেছে, 'বাবুজি, কম্‌লা আর অর্জুনজি কেমন আছে?'

বিজয় বলেছে, 'ভাল আছে।'

'সচ্ বাবুজি?'

'হাঁ হাঁ, সচ্।'

'লেকেন শুনেছি ওদের নাকি খুব মারধোর করেছে?'

'ঝুট, বিলকুল ঝুট।'

'ভগোয়ান রামজির কসম নিয়ে বলছেন তো?'

'হাঁ হাঁ, জরুর। ওরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলোয় আছে আপনারা গিয়ে দেখে আসুন না।'

নাথুনি পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমাদের কেউ মারবে না তো?'

বিজয় বলেছে, 'না না, কে মারবে?'

'ঠিক আছে, আপনা আঁখে একবার ওদের দেখে না এলে মনমে শান্তি পাচ্ছি না বাবুজি।'

এবার সুরেশ বলেছে, 'আমরা মিছিল করে এস. ডি. ও সাহেবের বাংলো আর অর্জুনের অফিসে এখন থেকে রোজ যাব। আপনারাও আসবেন।'

ভীরু গলায় জগলাল জিজ্ঞেস করেছে, 'মিছিল নিয়ে যাবেন কেন বাবুজি?'

কারণটা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেয় সুরেশ। এ ছাড়া সমস্ত অধিকার আদায় ক'রে সসম্মানে মাথা উঁচু ক'রে নমকপুরায় থাকা অর্জুনদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জগলাল জানতে চায়, 'কম্‌লা আউর অর্জুনজিকো কোঈ খত্‌রা তো নেহী হোগা?'

'না না, আমরা সবাই ওদের সঙ্গে থাকলে কে ওদের ক্ষতি করবে? আসবেন কিন্তু মিছিলে।'

·

এদিকে বিজয়দের সঙ্গে এই যে অচ্ছুৎটোলায়, কলেজে বা ছেলেদের ক্লাবে ঘুরে ঘুরে সুরেশ সবাইকে বোঝাচ্ছে, এর মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে সুরেশের। বিজয় অর্জুনদের ব্যাপারে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু একটা বিশেষ সীমার বাইরে এই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া সুরেশের পক্ষে সম্ভব না। কেননা একজন পত্রকারকে হ'তে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কারো দিকেই ঝোঁকা তার পক্ষে অনুচিত। সেটা তার প্রফেসানের পক্ষে ক্ষতিকর। তবু এত বড় একটা ঝুঁকি যে বিজয় নিয়েছে তার পেছনে রয়েছে তার সামাজিক দায়িত্ববোধ। পত্রকার হলেও সে সোসাইটিরই একজন সচেতন মানুষ। উদাসীন দর্শক হয়ে সে তাই দূরে সরে থাকতে পারে নি।

॥ সতের ॥

আজ সকালে রাঁচী এবং মজঃফরপুর থেকে প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ সম্‌স্কার সংস্থানের জন কুড়ি জঙ্গী মেম্বার এসে হাজির হয়েছে। তারা উঠেছে নমকপুরার সবচেয়ে বড় শিবমন্দিরের পাশের ধর্মশালায়।

দুপুরে বিজয় কলেজের কয়েকটি ছেলেকে জোগাড় ক'রে

ফেলে। তারপর ধর্মশালা থেকে তার সম্‌স্কার সংস্থানের মেমবারদের নিয়ে অফিসের দিকে মিছিল ক'রে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায়।

'উঁচা জাতকা জুলুম—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'অর্জুন চৌবেকো ট্রান্সফার—'

'নহী মানেগা, নেহী মানেগা।'

'অর্জুন-কম্‌লাকা সাদি—'

'স্বীকার করো, স্বীকার করো।'

সুরেশ দশটার ভেতর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে অচ্ছুৎটোলায় চলে গিয়েছিল। সে বেশ কিছু গাঙ্গোতা ধাঙড় এবং খ্রিস্টান যুবক জুটিয়ে মিছিল বের করে। তবে নিজে সঙ্গে থাকে না। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে। পত্রকার হিসেবে তাকে এই জটিল ব্যাপারে খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

সুরেশ এই মিছিলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে যে খ্রিস্টান ছেলেটির হাতে, তার নাম যোশেফ। দু পুরুষ আগে তারা ছিল দোসাদ। যোশেফ ম্যাট্রিক পাস, চার্চে যে প্রাইমারি স্কুল রয়েছে সেখানে পড়ায়। খুবই তেজী যুবক। নেতৃত্ব পেয়ে সে দারুণ খুশি। উত্তেজনায় টগবগ ক'রে ফুটছে যেন। হাতের মুঠো আকাশের দিকে ছুঁড়ে গলায় সবটুকু জোর ঢেলে স্লোগান দেয়।

'উঁচা জাতকা জুলুম—'

অন্য সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

নমকপুরায় চুনাও-এর সময় মিছিল বেরোয়। সেই মিছিলে বামহন কায়াথ রাজপুত ক্ষত্রিয়দেরই ভিড়। নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ পুরোপুরি সামাজিক কারণে আচ্ছুৎটোলা থেকে এরকম একটা মিছিল বেরুতে পারে, নমকপুরায় এমন ঘটনা অভাবনীয়। উৎসাহ এবং উত্তেজনা সেই কারণে।

ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ অফিসের সামনে বিজয় আর

যোশেফদের দুটো মিছিল একাকার হ'য়ে মিশে যায়। এবার স্লোগান তুমুল হয়ে ওঠে।

এই দুপুরবেলায় উল্টোপাল্টা গরম হাওয়া বয়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনো আড়াআড়ি পুব থেকে পশ্চিমে। দুই মিছিলের প্রচণ্ড চিৎকার উত্তপ্ত বাতাসে ভর ক'রে নমকপুরার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কোনো মিছিলের সঙ্গেই অর্জুন নেই। সে তার সেকসানে পরিত্যক্ত একঘরের মতো চুপচাপ এককোণে নিজের চেয়ারটিতে বসে আছে।

ভানপ্রতাপদের মিছিলটা এখনও এসে পেঁছয় নি।

হঠাৎ অন্যরকম স্লোগান শুনে অফিসার-ইন-চার্জ সুধাকর দুবে তাঁর কামরায় চমকে ওঠেন। সেকসান অফিসার বিন্ধ্যাচলী মিশ্রও তার সেকসানে আয়েস ক'রে হাতের চেটোতে তামাক এবং চুন ডলে খৈনি বানাতে বানাতে হকচকিয়ে যায়। অর্জুন দ্রুত জানালার দিকে তাকায়। তার চোখে পড়ে, বাইরে ঠিক তার জানালার নিচে সত্তর আশিটি যুবক জড়ো হয়েছে। তাদের অনেকেই অচেনা। তবে কয়েকজনকে আগেই দেখেছে অর্জুন। ওরা অচ্ছুৎটোলার ছেলে, আলাপ-টালাপ না থাকলেও মুখচেনা। তবে কলেজের ছেলেগুলোকে সে চেনে। তারা নমকপুরায় বামহন এবং কায়াথটোলার বাসিন্দা। এদের মধ্যে বিজয়কেও দেখা যাচ্ছে। সুরেশ অবশ্য ভিড়ের ভেতর নেই, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজয়রা এমন একটা কাণ্ড এত বিরাট আকারে ক'রে বসবে, ভাবতে পারে নি অর্জুন। নমকপুরায় ব্রাহ্মণ কায়াথদের সঙ্গে অচ্ছুৎ আর খ্রিস্টানরা একসঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে স্লোগান দিচ্ছে, এ জাতীয় দৃশ্য আগে কেউ কখনও দেখে নি। অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে সুধাকর দুবে তাঁর বেয়ারাকে ডেকে বলেন, 'দেখে

এসো তো কারা বাইরে হুজ্জুত করছে। মনে হচ্ছে এরা ভানপ্রতাপের দলবল নয়।'

বেয়ারা তক্ষুনি খবর নিয়ে আসে। জানিয়ে দেয় কারা স্লোগান দিচ্ছে।

খানিকক্ষণ বিভ্রান্তের মতো বসে থাকেন সুধাকর। তারপর বলেন, 'যাও, বিজয়কে ডেকে নিয়ে এসো।' বেয়ারাটা চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ওখানে পত্রিকার সুরেশ সহায়কে দেখলে?' তাঁর ধারণা, এই পাল্টা আন্দোলনের মধ্যে সুরেশ নিশ্চয়ই আছে। এবং এই মুহূর্তে নিচে তার থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বেয়ারাটি খুবই তুখোড়। সে সুরেশকে চেনে। বলে, 'আছে স্যার।'

'বিজয়ের সঙ্গে তাকেও ডেকে এনো। অর্জুন চৌবেকেও খবর দাও, সে যেন এখানে চলে আসে।'

কিছুক্ষণ পর বিজয় এবং সুরেশ সুধাকরের কামরায় এসে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসে অর্জুন।

সুধাকর তাদের বসতে ব'লে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কিরকম হ'ল বিজয়জি, সুরেশজি?'

বিজয় বলে, 'কোনটা?'

'আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম, কোনোরকম মিছিল নিয়ে অফিসে আসবেন না। সেই নিয়ে এলেন!' সুধাকর দুবেকে বেশ ক্ষুব্ধই দেখায়।

'অর্জুনকে বাঁচাতে হ'লে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না দুবেজি।' বিজয় বেশ জোর দিয়ে বলে।

সুধাকর উত্তর দেন না।

বিজয় এবার বলে, 'আপনি কি জানেন, অর্জুনকে এখান থেকে ট্রান্সফার করাবার জন্যে মান্ধাতা শর্মারা পাটনা গেছে। শুনলাম মন্ত্রীটন্ত্রীদের তারা ভয় দেখাবে, যদি তাদের কথামতো কাজ না

হয় নেক্সট চুনাওতে এখানকার আপার কাস্টরা অপোজিসান পার্টিকে ভোট দেবে। ওরা দু'দিক থেকে প্রেসার দিতে চাইছে। এক, পাটনায় গিয়ে থ্রেটেন করে আর এই অফিসে ভানপ্রতাপদের পাঠিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে। কাজেই অর্জুনদের রক্ষা করতে হ'লে এ ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি বলুন।'

খানিকক্ষণ বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকেন সুধাকর। তারপর বলেন, 'মান্ধাতা শর্মারা পাটনায় গেছে!' মুখচোখ দেখে মনে হয় এই খবরটা তিনি সত্যিই জানতেন না।

'হ্যাঁ স্যার।' আস্তে মাথা নাড়ে বিজয়। বলে, 'আপনাকে আরেকটা জরুরি খবর দেব।'

'কী?'

'আমরা যে মিছিল নিয়ে এসেছি তাতে প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ সংস্থানের মেম্বাররাই শুধু নেই, আমাদের সঙ্গে অচ্ছুৎ, খিস্টান, এমন কি আপার কাস্টের কিছু ছেলেও এসেছে।' একটু থেমে ফের বলে, 'পীপল্‌স সাপোর্ট আমরাও পেতে শুরু করছি স্যার।'

সুধাকর ঠিক এমন একটা খবরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'আপার কাস্টের ছেলেরা আপনাদের সঙ্গে মিছিল ক'রে এসেছে!'

বিজয় হাসে। বলে, 'বিশ্বাস না হ'লে নিচে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পারেন। চলুন না, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

সুধাকর বলেন, 'না না, নিচে যাবার দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন, বিশ্বাস করছি।'

'তা হ'লে স্যার, আমরা এখন যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় বিজয়। তার দেখাদেখি অর্জুন এবং সুরেশও।

চিন্তাগ্রস্তের মতো সুধাকর বলেন, 'আচ্ছা।'

বিজয়রা সুধাকরের ঘর থেকে বেরিয়ে যখন একতলার সিঁড়ির দিকে নামছে সেইসময় দূর থেকে স্লোগান ভেসে আসে।

'ভ্রষ্টাচার—'

'নেহী' চলেগা, নেহী' চলেগা।'

'ব্রাহ্মণকো—'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

'সমাজকো পবিত্রতা—'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

'ব্রাহ্মণ-অচ্ছুৎ শাদি—'

'নেহী' মানেগা, নেহী' মানেগা।'

বিজয়রা একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। অর্জুন এবং সুরেশের উদ্দেশে বলে, 'ভানপ্রতাপরা আসছে।'

'হ্যাঁ।' সুরেশ অর্জুন, দু'জনেই মাথা নাড়ে।

'তাড়াতাড়ি নিচে চলুন।'

অর্জুনরা যখন সুধাকরের ঘরে আলোচনা করছিল, মিছিলের লোকেরা স্লোগান দেয় নি। হৈচৈ না বাধিয়ে তারা এলোমেলো দাঁড়িয়ে বা বসে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল। দূরে স্লোগান শুনে তাদের স্নায়ু টান টান হয়ে যায়। যারা বসে ছিল, দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।

ঠিক এইসময় উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিচে নেমে আসতে আসতে চিৎকার করে ওঠে বিজয়, 'উ'চা জাতকা জুলুম—'

বাকি সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চে'চায়, 'নেহী' চলেগা, নেহী' চলেগা।'

'অর্জুন-কমলাকা শাদি—'

'স্বীকার কর, স্বীকার কর।'

এদিকে ভানপ্রতাপদের মিছিল স্লোগান দিতে দিতে অফিসের কাছে চলে এসেছিল। প্রথম দিকে নমকপুরার আপার কাস্টের যত উৎসাহ ছিল, এখন তাতে ভাটার টান লেগেছে। দুপুরে যখন উত্তপ্ত লু-বাতাসে চারিদিক ঝলসে যায়, তখন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য রোজ রোজ বেরুতে কার আর ভাল লাগে? নিজের

জাতের শুদ্ধতার ব্যাপারে তাদের সতর্কতার শেষ নেই। তাই বলে অসহ্য রোদে বেরিয়ে গায়ের চামড়া পোড়াবার কোনো মানে হয় না। কাজেই প্রথম দিন ভানপ্রতাপরা ব্রাহ্মণ আর কায়াথটোলা থেকে যত লোক জুটিয়ে আনতে পেরেছিল, আজ তার সিকিভাগও আসে নি। আর কয়েক দিন আন্দোলন চালালে দশ বারটি কট্টর ফাণ্ডামেন্টালিস্ট ছাড়া ভানপ্রতাপরা মিছিল করার লোক পাবে না।

বিজয়দের স্লোগান শুনে কাছাকাছি এসে ভানপ্রতাপদের মিছিল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু পক্ষের মাঝখানে তখন মাত্র কয়েক গজের দূরত্ব।

ভানপ্রতাপদের মুখচোখ দেখে মনে হয়, তারা ভীষণ হকচকিয়ে গেছে। পাল্টা একটা মিছিল আগে থেকে এসে এখানে স্লোগান দিতে থাকবে, এটা ছিল তাদের পক্ষে অভাবনীয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমূঢ়তা কেটে যায় ভানপ্রতাপদের। মাথার ওপর গনগনে আকাশ। হুহু বাতাস আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। এই সময় ভানপ্রতাপদের মাথায় সেই আগুন খানিকটা ঢুকে যায় যেন। রক্তের ভেতর ব্রাহ্মণত্বের তেজ দর্প এবং সংস্কার দশ গুণ জোরালো হ'য়ে আবার ফিরে আসে।

বিপুল চেহারার ভানপ্রতাপ আকাশের দিকে ঘুষি ছুঁড়ে চেঁচায়, 'ব্রাহ্মণকা বিনাশ—'

অন্য সবাই গলা মিলিয়ে গর্জে ওঠে, 'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

বিজয়রাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে না। তারাও গলার শির ছিঁড়ে পাল্টা স্লোগান দিতে থাকে।

দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে, এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি নমকপুরায়। অর্জুনদের অফিস থেকে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসে। এই দুপুরবেলা রাস্তাঘাট এমনিতেই ফাঁকা। যা দু-চারটে লোক এধারে ওধারে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছিল তারা দাঁড়িয়ে যায়। বয়েল

আর ভৈস্ম গাড়ি, টাঙ্গা কি সাইকেল রিকশা, সব কাছে এসে ভিড় জমাতে থাকে। আপার কাস্টের বিরুদ্ধে এভাবে এত লোক জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছে, এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। নমকপুরায় মানুষ সকলেই সকুলকে চেনে। ধাঙড় গাঙ্গোতা দোসাদ এবং খ্রিস্টানের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ কায়াথদের ছেলেরা উঁচা জাতের বিপক্ষে মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করছে—এতে সবাই চমকে গেছে। এমন ঘটনা এ শহরে আগে আর কখনও ঘটে নি।

উত্তেজনা যেভাবে বাড়ছিল, তাতে যে কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারত। ঘটল না, তার কারণ দু পক্ষের মিছিলের খবর পেয়ে আচমকা দুটো বড় ভ্যান বোঝাই হয়ে পনের ষোল জন আর্মড পুলিশ এসে পড়ে। এবং রাইফেল উঁচিয়ে দু পক্ষকে দু দিকে হঠিয়ে দেয়।

একদিকে বিজয়রা, আরেক দিকে ভানপ্রতাপের দলটা। মাঝখানে শ খানেক গজের দূরত্ব। দু পক্ষই দুধারে দাঁড়িয়ে সমানে গলার শির ছিঁড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আর আর্মড কনস্টেবলরা দু পক্ষের উদ্দেশেই চেঁচাতে থাকে, 'হট যাও, হট যাও—'

প্রায় ঘণ্টাখানেক চিৎকার এবং পাল্টা চিৎকারের পর দুই দল শেষ পর্যন্ত দু দিকে চলে যায়।

॥ আঠার ॥

আরো দু'দিন কেটে গেল।

এই দু'দিনই বিজয় এবং প্রগতিবাদী হিন্দু সমস্কার সংস্থানের ছেলেরা অর্জুনদের জন্য ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসের এবং এস. ডি. ও বাংলোর সামনে মিছিল নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ক'রে স্লোগান দিয়েছে। এই দু'দিনে তাদের মিছিলে

নমকপুরা টাউনের আরো বহু মানুষ এসে ভিড় করেছে। অচ্ছুৎ, খিরস্টান থেকে ব্রাহ্মণ-কায়াথ পর্যন্ত কেউ আর বাকি নেই। অবশ্য এদের বেশির ভাগই যুবক যুবতী। এদের সঙ্গে সুরেশ তো আছেই। অর্জুন আর কম্‌লাকে ঘিরে নমকপুরায় দারুণ উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে।

সুরেশ বলেছে, 'মানুষ যেভাবে অর্জুনজিকে সাপোর্ট করতে আসছে সেটা খুবই ভাল লক্ষণ। এই পীপলস সাপোর্ট আমাদের ধরে রাখতে হবে।'

এ ব্যাপারে সুরেশের মতো বিজয় এবং তার সংস্থানের ছেলেরাও খুব আশাবাদী। তাদের ধারণা, জনমতের চাপে ভানপ্রতাপদের পিছু হটতেই হবে।

এদিকে ভানপ্রতাপের দলে এখন ভাটার টান। এমন কি পাটনা থেকে ফিরে এসে মান্ধাতা শর্মাও লোকজন জোগাড় করতে পারছে না। ব্রাহ্মণত্ব এবং সামাজিক স্থিতিকে যে রক্ষা করা যাবে না, এমন ইঙ্গিত সে বুঝিবা পেয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভ্রষ্টাচারে সে যত না বিস্মিত, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখিত এবং বিষণ্ন। তার ধারণার মডেল হিন্দু সমাজকে বোধহয় আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না। প্রথম দিকে যত লোক তাদের মিছিলে আসত, শেষ দু'দিনে তার সিকির সিকিও আসে নি। সব মিলিয়ে বড় জোর বিশ পঁচিশ জন। তাদের মধ্যে আগের সেই জেদ এবং জঙ্গি ব্যাপারটা বিশেষ অবশিষ্ট নেই। তারা ধরেই নিয়েছে এই যুদ্ধে তাদের হার ঠেকানো যাবে না।

তবু যতক্ষণ প্রাণটা আছে, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

এদিকে কাল রাতে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় অর্জুনদের থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

আজ সকালে চা-টা খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই কেয়ার টেকার

জগন্নাথ সিং অর্জুনদের কামরায় এসে হাজির হয়। কাচুমাচু মুখে বলে, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে অর্জুনজি।'

ভাল ক'রে রোদ উঠতে না উঠতেই জগন্নাথ কী কারণে হানা দিয়েছে সেটা মোটামুটি ধরে ফেলেছে অর্জুন। তবু কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখেই সে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'আপনাদের এখানে সাত দিন থাকার পারমিসান ছিল। কাল রাতেই তা শেষ হয়েছে। আজ কম্পার্টমেণ্ট খালি ক'রে দিতে হবে।'

'আর দু-একটা দিন কি থাকতে দিতে পারেন না?'

'আমি ছোটামোটা নৌকরি করি অর্জুনজি। ওপর থেকে হুকুম এসেছে আজই যেন আপনারা কামরা খালি ক'রে দ্যান।'

সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'ওপর থেকে কে হুকুম দিল—এস. ডি. ও সাহেব?'

এবার রীতিমত ঘাবড়ে যায় জগন্নাথ। হাতজোড় ক'রে সে বলে, 'আমাকে তা জিজ্ঞেস করবেন না অর্জুনজি। আমি বহোত ছোটামোটা সরকারি নৌকর।'

এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না অর্জুন। শুধু বলে, 'এখনই চলে যেতে বলছেন?'

'ওপর থেকে সেই রকম ইনস্ট্রাকসান এসেছে।' জগন্নাথ বলতে থাকে, 'আমাকে দয়া ক'রে ভুল বুঝবেন না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনাদের ওপর আমার কত সিমপ্যাথি। লেকেন আমার হাত-পা একেবারে বাঁধা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'না না, ক্ষমার কথা বলবেন না। আপনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন। শুধু ছোট একটা অনুরোধ করব। যদি আপনার অসুবিধা না হয়—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যায় অর্জুন।

জগন্নাথ ভয়ে ভয়ে, চিন্তিতভাবে অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'কী অনুরোধ অর্জুনজি?'

'দশটা পর্যন্ত যদি থাকতে দ্যান, খুব উপকার হবে। আমার বন্ধুরা খানিকটা পর আসবেন। স্নান খাওয়া সেরে তাঁদের সঙ্গে চলে যাব।'

জগন্নাথ লক্ষ করেছে, রোজই ন'টা সাড়ে ন'টায় বিজয় বা সুরেশ, কেউ না কেউ এখানে আসে। তাদের সঙ্গে অর্জুন বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সে। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' বলতে বলতে উঠে পড়ে।

কমলা কাছেই বসে ছিল, জগন্নাথ চলে যাবার পর অর্জুন তাকে বলে, 'জামা কাপড়-টাপড় গুছিয়ে নাও।'

কমলা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। জগন্নাথ এবং অর্জুনের কথা শুনতে শুনতে তার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। সে বলে, 'এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে উঠব? আমাদের জন্যে নাকপুরায় আর তো কোনো জায়গা নেই।'

অর্জুন বলে, 'বিজয়রা নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যবস্থা করবে।'

সুটকেশ এবং কাপড়ের ব্যাগে নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রথমে স্নান সেরে নেয় কমলা। তারপর বাথরুমে ঢোকে অর্জুন। সে বেরিয়ে এসে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় কমলাকে দেখতে পায়। দূরের সোফায় সে চুপচাপ বসে আছে। স্নান করার পরও তার মুখচোখ থেকে দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগের চিহ্ন মুছে যায় নি।

কমলার দিকে না ফিরে অর্জুন বলে, 'অত ভেবো না। আমাদের সঙ্গে এখন অনেক মানুষ। আমরা শেষ হয়ে যাব না।'

কমলা উত্তর দেয় না।

অর্জুন ফের বলে, 'যখন আমরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব, আমাদের পাশে কেউ ছিল না। চোখ বুজে একরকম দরিয়াতেই ঝাঁপ দিয়েছিলাম। এখন আমাদের সাহায্য করার জন্যে কত মানুষ

এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ না কেউ থাকার একটা জায়গা ক'রে দেবেই।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে কমলা। অর্জুনের কথাগুলো সাহস যুগিয়ে তাকে আশান্বিত ক'রে তুলতে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ পর বিজয় এসে পড়ে। একধারে রাখা সুটকেশ এবং ব্যাগটা লক্ষ করতে করতে সে বলে, 'একেবারে রেডি হ'য়ে আছ দেখছি। ডেফিনিটলি বাংলো ছাড়ার নোটিশ পেয়ে গেছ—তাই না ?'

আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় অর্জুন।

বিজয়কে খুব একটা বিচলিত বা চিন্তাগ্রস্ত মনে হয় না। ধীরেসুস্থে একটা সোফায় বসে কয়েক পলক দ্রুত কিছু ভেবে নেয় সে। তারপর বলে, 'একরকম ভালই হয়েছে। এই সুটকেশ ব্যাগসুদ্ধ কমলাকে নিয়ে আজ আমরা মিছিল করে এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে যাব।'

কমলা ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'গোলমাল হবে না তো?'

বিজয় হাসে, 'গোলমাল একটু আধটু তো হবেই। তা ফেসও করতেও হবে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?'

'না।'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।'

খাওয়া শেষ হ'লে পি. ডব্লু. ডি বাংলোর বিল মিটিয়ে অর্জুনরা বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তায় এসে দুটো রিকশা থামিয়ে তারা উঠে পড়ে। একটা রিকশায় উঠেছে অর্জুন এবং বিজয়, অন্যটায় সুটকেশ ব্যাগ নিয়ে কমলা।

একসময় রিকশা দুটো সোজা এস. ডি. ও বাংলোর সামনে চলে আসে। আগেই ঠিক করা আছে, সব মিছিল আজ এখানে এসে জড়ো হবে। এখানে পিকেটিং এবং মিটিং করার পর তারা যাবে ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে।

ভাড়া মিটিয়ে রিকশা দুটোকে ছেড়ে দেয় বিজয়রা। এস. ডি. ও বাংলোর সামনের ফাঁকা জায়গায় মিটিংয়ের জন্য দু'দিন আগেই কাঠ দিয়ে একটা উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। বিজয়রা সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মিনিট দশেকের ভেতর স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল নমকপুরার দক্ষিণ দিক থেকে এসে পড়ে। মিছিলটার সামনের দিকে রয়েছে সুরেশ। পেছনে নমকপুরার কলেজের ছেলেমেয়েরা। তা ছাড়া আরো অজস্র যুবক এবং কিছু বয়স্ক মানুষ। এ ক'দিন মিছিলে শুধু পুরুষদেরই দেখা গেছে, আজই প্রথম দেখা গেল কয়েকটি ছাত্রীকে। সংস্কারের দেওয়াল ভেঙে তারা বেরিয়ে এসেছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে আরো একটা বড় মিছিল এসে পড়ে। এতে রয়েছে দোসাদ, ধাঙড়, তাতমা, কোয়েরি এবং খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা। অর্থাৎ হিন্দু সোসাইটির নিচের তলার মানুষ এবং মাইনোরিটিরা। তাদের ভেতর জগলাল এবং নাথানিকেও দেখা যায়। এই মিছিলটা নিয়ে এসেছে যোশেফ।

দুই মিছিল একাকার হয়ে মিশে যাবার পর প্রবল উৎসাহে ফের কিছুক্ষণ স্লোগান চলে। সবার মুষ্টিবদ্ধ হাত এখন আকাশের দিকে।

এরই মধ্যে দু'টি লোক এসে মঞ্চে মাইক লাগিয়ে দিয়ে যায়।

রাস্তার ওধারে এস. ডি. ও বাংলোর ভেতরে দুটো কালো রংয়ের ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভেতর রয়েছে পঁচিশ তিরিশ জন আর্মড কনস্টেবল। এখানে মিছিল মিটিং এবং ধরনা শুরু হওয়ার পর থেকে পুলিশ ভ্যান দুটো সারাক্ষণ এস. ডি. ও বাংলোয় মজুদ থাকছে।

মিছিল আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যান থেকে বেরিয়ে কনস্টেবলরা বাংলোর গেটের বাইরে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মুখচোখ দেখে মনে হয়, তাদের মধ্যেও এক ধরনের টেনসান চলছে।

স্লোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার বিজয় অর্জুন কমলা যোশেফ এবং আনন্দকে নিয়ে মঞ্চে ওঠে। আনন্দ নমকপুরা কো-এডুকেসন কলেজের ছাত্র-নেতা। কলেজ স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি। এদের মঞ্চে তুললেও বিজয় সুরেশকে ডাকে না। পত্রকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে সে নিচেই দাঁড়িয়ে থাকে।

এইসময় দেখা যায় ভানপ্রতাপ এবং মান্ধাতা শর্মারাও তাদের মিছিল নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। প্রথম দিকে মান্ধাতাদের মিছিল যত মানুষ হ'ত এখন তার আট ভাগের এক ভাগও নেই। সব মিলিয়ে পনের যোল জন। তাদের চিৎকার বায়ুমণ্ডলে সামান্য একটু ঢেউ তুলেই বিলীন হয়ে যায়।

মান্ধাতাদের দেখামাত্র এস. ডি. ও বাংলোর সামনের জনতা গলা কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয়। অসংখ্য মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর সমুদ্র গর্জনের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মান্ধাতারা। এত মানুষ দেখে তারা ভীষণ দমে যায়। বুঝতে পারে, এই যুদ্ধে তাদের আর কিছু করার নেই।

ধীরে ধীরে মান্ধাতা এবং ভানপ্রতাপেরা হতাশ ভঙ্গিতে স্লোগান দিতে দিতে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যায়।

বিজয় মাইকের সামনে এসে শুরু করে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, আমরা ক'দিন ধরে কী উদ্দেশ্যে এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সামনে আর অর্জুনের অফিসে মিছিল ক'রে আসছি, আপনারা জানেন। আমরা লড়াই চালাচ্ছি সুবিচারের জন্যে। সমাজে কট্টর মৌলবাদীরা যে পুরানা দুর্গন্ধওলা সমস্কার কায়েম রাখতে চাইছে, আমাদের লড়াই তার বিরুদ্ধে। সরকার অর্জুন আর কমলার শাদিতে মদত দিয়েছিল। এটা খুব বড় কথা। আমরা ভেবেছিলাম সরকার সোসাইটিকে সামনের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে নিয়ে যাবে। লেকেন এখন দেখা যাচ্ছে সর্ষের মধ্যেই ভূত থেকে গেছে। সরকারের একটা অংশ যেমন সোসাইটির

উন্নতি চায়, প্রোগ্রেস চায়, আরেকটা অংশ তেমনি সোসাইটিকে পেছনে টেনে রাখতে চাইছে। আমাদের লড়াই তারও বিরুদ্ধে। আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমাদের কাজটা কত শক্ত। লেকেন ভিক্টরি আমাদের চাই-ই চাই। জিততে আমাদের হবেই। আমাদের সামনে অনেক উঁচা উঁচা দীবার খাড়া হ'য়ে আছে। সে সব ভাঙতেও হবে। আমরা যদি হেরে যাই, আর কোনো ভরসা নেই। সোসাইটি হাজার সাল আগের পুরানা জমানায় পড়ে থাকবে।

'এখন একটাই আশা, আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন। হর রোজ নয়া নয়া সাথী আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নিজের চোখেই দেখলেন ফাণ্ডামেণ্টালিস্টদের দলে মানুষ কত কমে গেছে। আজ তো তারা সামনে আসতেই সাহস পেল না। দূর থেকে আমাদের হিম্মৎ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে গেল ব'লে ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন ভাববেন না। যে কোনো সময় আবার হানা দিতে পারে।

'যাই হোক, এখন আপনাদের একটা নয়া সমস্যার কথা বলব। কমলা আর অর্জুনকে এই শহরে কেউ থাকার জায়গা দেয় নি। ওরা আমার কাছে কিছু দিন লুকিয়ে থেকেছে। অর্জুনের থাকার ব্যাপারে কারো আপত্তি ছিল না, লেকেন বাড়িওলা যেদিন কমলাকে ধরে ফেলল সেদিন এক মিনিটও আর থাকতে দেয় নি। শেষে এস. ডি. ও'র কাছে ধরনা দিয়ে পি. ডব্লু ডি বাংলোয় ওদের থাকার ব্যবস্থা করি। সরকারি কানুনে সাত দিনের বেশি ওখানে থাকার উপায় নেই। অর্জুনদের আজ বাংলো ছেড়ে দিতে হয়েছে। সিধা সেখান থেকে সুটকেশ ব্যাগ নিয়ে ওরা আমার সঙ্গে চলে এসেছে।

অর্জুনদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিজয় বলতে থাকে, 'ঐ যে ওদের দেখুন। ওরা কোনো অন্যায় করে নি, বেকানুনি কোনো কাজ করে নি, স্রেফ দু'জনের জাত 'আলাগ' ব'লে আজ ওদের এই

হাল। আপনারা বলুন এমন বে-সাহারা হয়ে রাস্তার কুত্তা-বিল্লির মতো এখন থেকে কি ওদের আসমানের নিচে রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতে হবে ?

জনতা চিৎকার করে ওঠে, 'নেহ্‌ী নেহ্‌ী, কভি নেহ্‌ী।'

বিজয় আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, সেই সময় এস. ডি. ও বাংলোর দিক থেকে দু'জন আর্মড গার্ড দৌড়তে দৌড়তে মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ায়। বিজয়ের দিকে হাত তুলে নাড়তে থাকে। বোঝা যায় তারা কিছু বলতে চাইছে।

বিজয় মঞ্চের ধারে চলে আসে। একজন গার্ড বলে, 'এস. ডি. ও সাহেব আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তুরন্ত আ যাইয়ে।' ব'লেই তার সঙ্গীকে নিয়ে গার্ড ফিরে যায়।

বিজয় মাইকের কাছে এসে জনতার উদ্দেশে এবার বলে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, এস. ডি. ও সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ডেকেছেন। অর্জুন আর কমলাকে নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছি। আপনারা কৃপা ক'রে এখানে অপেক্ষা করুন। এস. ডি. ও'র সঙ্গে কী কথাবার্তা হ'ল, ফিরে এসে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি।'

একটু পর অর্জুনদের সঙ্গে ক'রে বিজয় সুরেশ যোশেফ এবং আনন্দ এস. ডি. ও'র বাংলোয় চলে আসে। আজ যে ছাত্ররা এখানে এসে জমায়েত হয়েছে, সেটা আনন্দর কারণে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে হ'য়েও দারুণ টগবগে আর লড়াকু ধরনের যুবক। সেই সঙ্গে উদার এবং সংস্কারমুক্তও।

এস. ডি. ও মহেশ্বরপ্রসাদ নিচ তলায় ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছিলেন। একজন আর্মড গার্ড বিজয়দের সোজা সেখানে নিয়ে চলে আসে।

মহেশ্বরের মুখ থমথম করছে। অর্জুনদের সঙ্গে কমলাকে দেখে তাঁর চোখ সামান্য কুঁচকে যায়। কপালে ভাঁজ পড়ে। গম্ভীর গলায় সামনের সোফাগুলো দেখিয়ে তিনি বলেন, 'বসুন।'

বিজয় হাতে ঝুলিয়ে অর্জুনদের সুটকেশ এবং ব্যাগ নিয়ে

এসেছিল। সেগুলো একধারে নামিয়ে রেখে অন্য সবার সঙ্গে মহেশ্বরের মুখোমুখি বসে পড়ে।

চোখের কোণ দিয়ে সুটকেশ এবং ব্যাগটা একবার দেখে নেন মহেশ্বর। তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন না। ব্যাগ-ট্যাগ থেকে তাঁর চোখ এবার ঘুরে যায় যোশেফ আর আনন্দর দিকে। অপরিচিত দুই যুবককে দেখে তিনি খুশি হ'ন না। অসন্তোষ নিয়েই ফের বিজয়ের দিকে তাকান। বলেন, 'আপনাদের সেদিন ব'লে দিয়েছিলাম, আমার যেটুকু করা সম্ভব, সবই করেছি। তবু আজ আবার লোকজন এনে আমার বাংলোর সামনে হল্লা করছেন কেন?'

বিজয় খেপে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টের পায়. এখন রাগারাগি বা উত্তেজনা অর্জুনদের কোনো উপকারই করবে না, বরং তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে। নিজেকে সামলে নিয়ে যতটা সম্ভব বিনীত ভঙ্গিতে সে বলে, 'স্যার, যদি মনে কিছু না করেন, একটা কথা বলব।'

মহেশ্বরের কপালের ভাঁজ আরো একটু গভীর হয়। তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'কী কথা?'

'আপনার যা ক্ষমতা তার সবটা আপনি অ্যাপ্লাই করেন নি। যদি করতেন, সব সমস্যার সলিউশান হ'য়ে যেত।'

মহেশ্বরের শিরদাঁড়া টান টান হ'য়ে যায়। বলেন, 'তার মানে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগের চেয়ে এবার অনেক বেশি তীক্ষ্ণতা।

'সেই পুরনো কথাটা তা হ'লে আবার বলি। অর্জুনদের অফিসে তাকে এখনও নানাভাবে ঝঞ্চাটে ফেলা হচ্ছে। কাজকর্ম দেওয়া হচ্ছে না, অচ্ছুতের মতো একধারে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। আপনি ফার্ম হ'লে অবস্থাটা বদলে যেত। অর্জুন সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারত।'

আনন্দ এইসময় বলে ওঠে, 'অফিসে আমরা ওর ফুল প্রোটেকশান চাই।'

কড়া চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে মহেশ্বর বলেন, 'হু আর ইউ ?'

বিজয় দ্রুত বলে ওঠে, 'ওর নাম আনন্দ ঝা। এখানকার কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি।'

মহেশ্বর বলেন, 'সেক্রেটারি না হয় হলেন, এঁর সঙ্গে অর্জুনদের কী সম্পর্ক ? কলেজ ছেড়ে এখানে কেন ?'

প্রশ্নটা যদিও বিজয়কেই করা হয়েছে, উত্তরটা কিন্তু আনন্দই দিল। সে বলে, 'অর্জুনদের ব্যাপারটা একটা বড় সোসাল আর হিউম্যান প্রবলেম। তাই একজন কনসাস মানুষ হিসেবে আমাকে আসতে হয়েছে।'

মহেশ্বর কিছুটা চমকে ওঠেন। বলেন, 'কলেজের ছেলেরাও আপনাদের সঙ্গে এসেছে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। শুধু ছেলেরাই না, কয়েকজন ছাত্রীও এসেছে। অর্জুন আর কমলার বিয়েটা আমরা সমর্থন করি।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল সুরেশ। এবার সে বলে ওঠে, 'ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আজ এ শহরের প্রচুর ইয়াংম্যানও এসেছে। এমন কি মাইনোরিটি কমিউনিটির, যেমন খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা। আর এসেছে আপার কাস্টের যারা লিবারেল তাদের একটা অংশ। স্যার, প্রতিদিন অর্জুনদের ফেভারে জনসমর্থন বেড়েই যাচ্ছে। দয়া ক'রে একটু বাইরে যদি তাকান, দেখতে পাবেন, কত মানুষ অর্জুনদের জন্যে এখানে এসেছে।' একটু থেমে যোশেফকে দেখিয়ে বলে, 'এঁর নাম যোশেফ। মাইনোরিটি কমিউনিটির একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

মহেশ্বর যোশেফকে এক পলক দেখেন, তবে উত্তর দেন না।

ওধার থেকে বিজয় বলে, 'যত দিন যাবে, পীপলের এই সাপোর্ট বাড়তেই থাকবে।'

মহেশ্বর এবার মুখ খোলেন, 'তার মানে ব্রুট ফোর্স দেখিয়ে আপনারা আমার ওপর প্রেসার দিতে চাইছেন ?'

মহেশ্বর রাস্তার মাঝখান দিয়ে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলার মানুষ। নেতা, মন্ত্রী, এম. পি, ডি. এম ইত্যাদি ওপরওলার মন যুগিয়ে, সবার সঙ্গে আপস ক'রে কোনোরকমে চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই তিনি খুশি। সারভিস কেরিয়ারে এতটুকু দাগ লাগুক, এই দুর্ভাবনায় সারাক্ষণ কুঁকড়ে থাকেন মহেশ্বর। কিন্তু সেই মানুষটাকেই আজ অন্য সুরে অন্য ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হ'য়ে যায়। এ ক'দিন তাঁকে এত কড়া হ'তে দেখা যায়নি।

বিজয় স্থির চোখে কিছুক্ষণ মহেশ্বরকে লক্ষ করে। তারপর চতুর ডিপ্লোম্যাটের মতো বলে, 'স্যার, আপনাকে প্রেসার দেওয়ার সাহস আমাদের হওয়া কি সম্ভব? আমরা শুধু বলতে চাইছি অর্জুনরা কোনো অন্যায় করে নি, নমকপুরায় অনেক মানুষের সমর্থন আর আশীর্বাদ ওরা পেয়েছে।'

মহেশ্বর বলেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথা না হয় মেনেই নেওয়া গেল। কিন্তু এভাবে বার বার এখানে লোকজন এনে ঝামেলা করাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

বিজয় বলে, 'আমরা অন্যায় কোনো দাবী নিয়ে আপনার কাছে আসছি না। অর্জুনদের থাকার একটা পার্মানেণ্ট ব্যবস্থা আর অফিসে তার প্রোটেকশান, এর বেশি আমরা কিছু চাই নি।'

'দুই ব্যাপারেই বহুবার জানিয়ে দিয়েছি, আমার যা করার করেছি। এর বেশি আর কিছু আশা করবেন না।'

'এটাই কি আপনার শেষ কথা?'

খুবই বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করেছে বিজয়, তবু তার মধ্যে কোথাও একটা দৃঢ়তা ছিল। মহেশ্বর প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করেন। তারপর বলেন, 'হঠাৎ একথা বলছেন?'

বিজয় বলে, 'আপনি যদি ভরসা না দিতে পারেন, আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

এরকম উত্তর আশা করেন নি মহেশ্বর। তিনি প্রথমটা

হকচকিয়ে যান, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'কী করতে চান আপনারা ?'

মহেশ্বরের কাছ থেকে ভরসা না পাওয়া গেলে কী করা দরকার, সেটা ঠিক ক'রে রাখেনি বিজয়রা। দ্রুত ভেবে নিয়ে সে বলে, 'আমরা আপনার কাছে আর আসব না।'

বিমূঢ়ের মতো মহেশ্বর বলেন, 'তা হ'লে ?'

'সোজা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গিয়ে ডি. এম-এর কাছে ধর্না দিয়ে বসে থাকব এক উইক। তাতেও কাজ না হ'লে পাটনায় সেক্রেটারিয়েট আর চিফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে গিয়ে পিকেট করব। যতদিন প্রবলেমটার সলিউসান না হচ্ছে আমরা ছাড়ছি না।'

মহেশ্বর চমকে ওঠেন। বিজয়রা যদি ডি. এম-এর বাংলো কিংবা পাটনার সচিবালয়ে বা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হামলা চালায় সেটা হবে তাঁর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর আর বিপজ্জনকও। তিনি যে অত্যন্ত অযোগ্য, সামান্য একটা সমস্যাও ঠিকঠাক সামাল দিতে পারেন না—এসব প্রমাণ হ'য়ে যাবে। প্রবলবেগে হাত নেড়ে তিনি বলেন, 'না না, ডি এম কি চিফ মিনিস্টারের কাছে আপনাদের যেতে হবে না। দেখি অর্জুনের অফিসের ব্যাপারটা কিভাবে মেটানো যায়।' বলে পাশের ছোট নিচু টেবল থেকে ফোন তুলে তিনি ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে সুধাকর দুবেকে ধরেন। 'বলেন, একটু কষ্ট ক'রে যদি আমার বাংলায় একবার আসেন, ভাল হয়। সঙ্গে ক'রে আপনার সেকসান ইন-চার্জ বিন্ধ্যাচলীজিকেও নিয়ে আসবেন। খুব জরুরি কাজ আছে।'

লাইনের ওধার থেকে সুধাকর কী উত্তর দেন, শোনা যায় না। মহেশ্বর শুধু 'হাঁ হাঁ, নমস্তে—' বলে ফোন নামিয়ে রাখেন।

মিনিট পনের বাদে শশব্যস্ত সুধাকর এবং বিন্ধ্যাচলী প্রায় দৌড়তে দৌড়তে মহেশ্বরের ড্রইং রুমে এসে ঢোকেন। অর্জুনদের এখানে দেখে দু'জনেই ভীষণ হকচকিয়ে যান।

মহেশ্বর বলেন, 'বসুন।'

সুধাকররা ডান পাশের দুটো সোফায় বসে পড়েন। তবে তাঁদের চোখেমুখে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা ফুটে বেরিয়েছে। অর্জুনদের নিজের কাছে বসিয়ে মহেশ্বর কেন তাদের এখানে ডেকে এনেছেন, তা বুঝতে পারছেন না সুধাকররা। উৎকণ্ঠা সেই কারণে।

মহেশ্বর এবার সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসেন। বলেন, 'অর্জুন আপনার অফিসে কতদিন আগে জয়েন করেছে?'

একটু ভেবে সুধাকর বলেন, 'মাসখানেকের ওপর।'

'অর্জুনের অভিযোগ, তাকে এখন পর্যন্ত কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। অফিস আওয়ার্সে সারাক্ষণ তাকে চুপচাপ বসিয়ে রাখা হয়। অভিযোগটা কি সত্যি? আপনার সেকসান ইন-চার্জ এ ব্যাপারে কী বলেন?'

বিন্ধ্যাচলী এবং সুধাকর অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

মহেশ্বর আবার বলেন, 'ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম আমার দেখার কথা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদের ডাকিয়ে আনার কারণটা হ'ল, আমার কাছে অভিযোগ করার পরও যদি কোন কাজ না হয়, ওঁরা পাটনায় হায়ার অথারিটির কাছে চলে যাবেন।'

বিন্ধ্যাচলী এবং সুধাকর দু'জনেই ভীষণ ঘাবড়ে যান। ভয়ে ভয়ে বিন্ধ্যাচলী বলে, 'স্যার, অর্জুন সবে জয়েন করেছে। সারা জীবন তো খাটতে হবে। তাই ক'দিন থোড়া কুছ রিলিফ দিচ্ছি। আপনি যখন বলছেন, কাল থেকে কাজ দেবো। ও কাজ করলে আমারই তো সুবিধা। আমার অনেক প্রেসার কমে যাবে।'

মহেশ্বর বলেন, 'ঠিক আছে, কালই ওকে কাজ দেবেন। অর্জুন আবার অভিযোগ করুক, এটা আমি চাই না।'

দু হাত এবং মাথা প্রবলবেগে নেড়ে বিন্ধ্যাচলী বলে, 'না না স্যার, আপনি হুকুম দিয়েছেন, এর নড়চড় হবে না।'

মহেশ্বর ভেতরে ভেতরে খুশি হন, তবে বাইরে তার প্রকাশ নেই। গম্ভীর মুখে এবার বলেন, 'আরেকটা কথা—'

'বলুন স্যার।'

'শুনলাম, আপনার সেকশনে অর্জুনের সঙ্গে সবাই ভীষণ খারাপ ব্যবহার করছে। কথাটা কি ঠিক?'

বিন্ধ্যাচলী হকচকিয়ে যায়। কাচুমাচু মুখে বলে, 'না স্যার, খারাপ ব্যবহার করবে কেন? সবাই কলীগ তো। এই একটু ঠাট্টা টাট্টা হয়ত ক'রে থাকবে।'

মহেশ্বর বলেন, 'অন্য স্টাফের সম্পর্কে তো অর্জুন বলেছেনই। তবে ওর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। অফিসে গেলেই আপনি নাকি ওকে উত্ত্যক্ত ক'রে তোলেন।'

দুই হাত এবং মাথা একসঙ্গে প্রচণ্ডভাবে নাড়তে নাড়তে বিন্ধ্যাচলী বলেন, 'না না, এটা ঠিক না। এসব বললে আমার ওপর খুব অবিচার করা হবে স্যার।'

উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিল অর্জুন। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় বিজয়। আসলে যে মহেশ্বর এতদিন অর্জুনের ব্যাপারে প্রায় কোনো কথাই শুনছিলেন না, তিনিই যখন বিন্ধ্যাচলীদের ডেকে এনে কড়া গলায় ধমকাতে শুরু করেছেন তখন বোঝাই যাচ্ছে আবহাওয়া বদলে গেছে। যা করার এবং বলার এখন মহেশ্বরই করুন আর বলুন। তাতে কাজ বেশি হবে।

মহেশ্বর এবার বলেন, 'আপনি সেকসান অফিসার হিসেবে দেখবেন, অর্জুনের ওপর কোনো দুর্ব্যবহার যেন না করা হয়। নতুন ক'রে আবার যদি অভিযোগ আসে অ্যাডমিনিস্ট্রেসন চুপচাপ বসে থাকবে না, তাকে ফার্ম স্টেপ নেবার কথা ভাবতে হবে। আমার কথাটা আশা করি, আপনারা বুঝতে পারছেন।' হুঁশিয়ারিটা একই সঙ্গে সুধাকর এবং বিন্ধ্যাচলীর উদ্দেশে। কথা শেষ ক'রে পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে দু'জনকে লক্ষ করতে থাকেন মহেশ্বর।

সুধাকররা শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'অর্জুনের সঙ্গে কেউ যাতে ভবিষ্যতে আর মিসবিহেভ না করতে পারে, সেটা আমরা এখন থেকে দেখব।'

'ধন্যবাদ।'

'স্যার, আমাদের আর কি থাকার দরকার আছে?'

'না। আপনারা এখন আসুন।'

নমস্কার জানিয়ে সুধাকর এবং বিন্ধ্যাচলী চলে যায়।

মহেশ্বর বিজয়দের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অফিসের সমস্যাটার সলিউসান হয়ে গেল। আশা করি, এ নিয়ে আর কিছু বলার নেই আপনাদের।'

এতক্ষণ চুপচাপ সাংবাদিকের নিরপেক্ষতা নিয়ে বসে ছিল সুরেশ। এবার ফস ক'রে সে বলে ফেলে, 'না। তবে—' কথা শেষ না ক'রে হঠাৎ থেমে যায়।

'তবে কী?'

'আপনি স্যার, আপনি আগেই বিন্ধ্যাচলী মিশ্রদের ডেকে ওয়ার্নিং দিলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না।'

মহেশ্বর ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে যান। সুরেশের কথার উত্তর না দিয়ে থমথমে মুখে বলেন, 'আমাকে এবার উঠতে হবে। আমার অন্য এনগেজমেণ্ট আছে।' বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ান।

বিজয় বলে, 'স্যার, দয়া ক'রে আর কয়েক মিনিট বসে যান। একটা সমস্যা আপনি মিটিয়েছেন কিন্তু আরো একটা ভাইটাল ব্যাপার রয়েছে।'

মহেশ্বরের কপাল কুঁচকে যায়। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছেন তিনি। বলেন, 'অর্জুনদের থাকার ব্যাপার তো?'

মহেশ্বর বসেন নি, অগত্যা বিজয়দেরও উঠে দাঁড়াতে হয়। বিজয় বলে, 'হ্যাঁ।' ঘরের কোণে সুটকেশ ব্যাগ দেখায় সে, 'ঐ যে মালপত্র নিয়ে ওদের পি. ডব্লু. ডি গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে

আসতে হয়েছে। থাকার ব্যবস্থা না ক'রে দিলে অর্জুনদের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

'আমার পক্ষে বাড়িটাড়ি জোগাড় ক'রে দেওয়া সম্ভব না। আমি যতদূর পেরেছি, করেছি। এর বেশি আমার কাছে এক্সপেক্ট করবেন না।' মহেশ্বর বলতে থাকেন, 'আপনারা ইচ্ছা করলে ডি. এম কি চীফ মিনিস্টারের বাংলোর সামনে গিয়ে ধরনা দিতে পারেন।'

বিজয়রা বুঝতে পারছিল, আইনের দিক থেকে যেটুকু করা সম্ভব ঠিক ততটুকুই করেছেন মহেশ্বর। এর বাইরে আর কিছুই করানো যাবে না তাঁকে দিয়ে। বিজয় বলে, 'ঠিক আছে স্যার, আমরা তাহলে চলি।'

॥ উনিশ ॥

এস. ডি. ও বাংলোর লন-এ নেমে গেটের দিকে যেতে যেতে অনিশ্চিতভাবে সুরেশ বলে, 'এস. ডি. ও তো সাফ জানিয়ে দিলেন, অর্জুনদের থাকার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। কানুনের বাইরে এক কদমও তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন তা হ'লে কী করা যায় ?'

একই কথা ভাবছিল বাকি সবাই। বিজয় বলে, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

সকলেই উৎসুক চোখে তার দিকে তাকায়। বলে, 'কী ?'

'বাইরে গিয়ে বলছি।'

অর্জুন এই সময় ভয়ে ভয়ে বলে, 'কোথাও জায়গা না পাওয়া গেলে রেভারেণ্ড টিরকের কাছেই না হয় চলে যাব। উনি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন না।'

বিজয় বলে, 'রেভারেণ্ড টিরকে তো রইলেনই। কিন্তু এই

শহরে এত মানুষ থাকতে বার বার ওঁকেই বা শেলটার দেওয়ার কথা বলতে হবে কেন? আর কি একজনও নেই যে অর্জুনদের, আশ্রয় দিতে পারে?'

কেউ উত্তর দেয় না। চুপচাপ সবাই গেটের বাইরে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

এখনও ওধারে বিশাল জনতা বসে আছে। অর্জুনরা এস. ডি. ও'র কাছ থেকে কী প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে সে জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। তাদের দেখে সকলে উঠে দাঁড়ায়। একসঙ্গে তারা প্রশ্ন করতে থাকে, 'কী হ'ল অর্জুনদের? কী বলল এস. ডি. ও সাহেব?'

অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননেতার মতো হাত তুলে জনতাকে থামিয়ে দেয় বিজয়। তারপর অর্জুনদের নিয়ে উঁচু মঞ্চে এসে সোজা মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভাইয়ো আউর বহেনজিলোগ, আপনারা নিশ্চয়ই এস. ডি. ও সাহেবের সঙ্গে আমাদের কী কথাবার্তা হ'ল শুনতে চাইছেন। প্রথমে একটা সুখবর দিই। অর্জুনের অফিসের সমস্যা মিটে গেছে। এস. ডি. ও সাহেব অর্জুনের দুই অফিসারকে ডেকে কড়া ধমক দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, তাকে যেন কোনোভাবে বিরক্ত করা না হয়, কেউ যেন অর্জুনের ওপর উৎপাত না করে। করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। অফিসাররা কথা দিয়েছেন এখন থেকে কোনো গোলমাল হবে না।'

জনতা আকাশের দিকে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার ক'রে ওঠে, 'বহুৎ আচ্ছা খবর, বহুৎ আচ্ছা—'

দু হাত তুলে বিজয় বলে, 'থামুন। এবার আপনাদের একটা খারাপ খবর দেবার আছে। ভেরি ভেরি ব্যাড নিউজ।'

জনতা চুপ ক'রে যায়।

বিজয় এভাবে শুরু করে, 'আপনারা জানেন, আজ পি. ডব্লু. ডি গেস্ট হাউস থেকে অর্জুনদের চলে আসতে হয়েছে।

কানুন আছে এক সপ্তাহের বেশি ওখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। আমরা এস. ডি.ও সাহেবের কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম, অর্জুন আর কমলাকে ওখানে আরো কিছুদিন থাকতে দেওয়া হোক। উনি রাজী হ'ন নি, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কানুন ভাঙতে পারবেন না। এতে যদি আমরা খোদ মুখ্যমন্ত্রী কি ডি. এম-এর কাছে গিয়ে নালিশ করি, ওঁর আপত্তি নেই। কানুনের দিক থেকে এস. ডি ও সাহেব ঠিকই বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁকে চাপ দিয়ে লাভ হবে না। কিন্তু অর্জুনরা এখন কোথায় থাকবে? কেউ যদি তাদের সাহারা না দেয়, আসমানের নিচে স্রিফ রাস্তায় তাদের পড়ে থাকতে হবে। তাই আপনাদের কাছে আমি একটা আর্জি রাখতে চাই।'

কথা শেষ ক'রে সামনের কয়েক শ মানুষের দিকে তাকায় বিজয়। কেউ কিছু বলে না, শুধু অসীম ঔৎসুক্যে তাকে লক্ষ করতে থাকে। বিজয়ের আর্জি'টা কী ধরনের হ'তে পারে৹ তা যেন খানিকটা আঁচ করতে চাইছে তারা।

বিজয় এবার বলে, 'আমি চাইছি, যতদিন না অর্জুনদের পার্মানেন্ট কোনো থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে, আপনারা পালা ক'রে দু-চারদিন ক'রে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখুন। আপার কাস্টের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ শুরু করেছেন। যুদ্ধটা যে শুধু মুখে মুখে নয়, সেটা আমাদের সবাইকেই প্রমাণ করতে হবে। বলুন, কারা অর্জুনদের আশ্রয় দেবেন?'

চারিদিক ঘিরে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে আসে। তার মধ্যেই বিজয় আবার বলে, 'যাঁরা আশ্রয় দেবেন তারা সোজা মঞ্চে আমাদের কাছে চলে আসুন।'

কোনো দিক থেকেই সাড়া পাওয়া যায় না। সব এত চুপচাপ যে গাছের পাতা নড়লেও যেন তার আওয়াজ শোনা যাবে।

বিজয় বলতে থাকে, 'আমরা যে অর্জুনদের ভালোবাসি, আমরা যে হিন্দু সোসাইটির পুরানো খতারনাক সম্স্কার ভাঙতে

যাচ্ছি, সেটা প্রমাণ করতে হবে। নইলে আমাদের এই লড়াই, এই আন্দোলন একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাবে। আপনারা ভাল ক'রে ভেবে দেখুন, বার বার ভাবুন—'

এবারও সবাই চুপচাপ। প্রচণ্ড উন্মাদনায় এবং নতুন কিছু করার উৎসাহে সামনের এই সব লোকজন ছুটে এসেছিল। কিছুক্ষণ হৈচৈ ক'রে, স্লোগানে স্লোগানে নমকপুরার বাতাস গরম ক'রে নিজেদের দায়িত্ব চুকিয়ে দিতে চেয়েছিল তারা। এখন দেখা যাচ্ছে, আঁচটা সোজাসুজি তাদের গায়ে এসে লাগছে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গা বাঁচানো আর যাবে না, সরাসরি অর্জুনদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। এর জন্য কেউ আগে থেকে তৈরি ছিল না। এমন একটা জটিল সমস্যার মধ্যে এসে পড়তে হবে, আগে জানা থাকলে অনেকেই হয়ত আসত না।

নৈঃশব্দের মধ্যেই দেখা গেল ভিড়ের ভেতর থেকে পা টিপে টিপে অনেকে চলে যাচ্ছে। সেটা লক্ষ করেছিল বিজয়। সে বলে, 'দয়া করে আপনারা যাবেন না। জবরদস্তি কারো ওপর অর্জুনদের চাপিয়ে দেওয়া হবে না। খুশি মনে, সহানুভূতির সঙ্গে যাঁরা দায়িত্ব নেবেন, ওরা শুধু তাঁদের কাছেই যাবে। আমি জানি, জবরদস্তির ফল ভাল হয় না।'

যারা চলে যাচ্ছিল, তারা থমকে দাঁড়ায়।

বিজয় কিছুক্ষণ জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে। তারপর গাঢ় আবেগের গলায় সে বলে, 'তবে কি আমরা ধরে নেব হরিজনের মেয়ে বিয়ে করার অপরাধে অর্জুন নমকপুরার কোনো বাড়িতেই জায়গা পাবে না? এখানে এমন কেউ নেই যার কাছে সামান্য মহত্ত্ব বা উদারতা আশা করা যায় না? মনে রাখবেন, আপার কাস্টের গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের জন্যে হিন্দু সোসাইটির অনেকেই অন্য ধর্ম নিয়েছে। আমরা যদি অর্জুনদের কাছে টেনে নিতে না পারি, তারা হয়ত হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দেবে।'

বিজয়ের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা

দেয়। চারিদিকে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়। ক্রমশ সেটা উত্তেজনার চেহারা নিতে থাকে।

এরই ভেতর ভিড় ঠেলে ঠেলে কম্‌লার মা-বাবা জগলাল এবং নাথুনি মঞ্চের নিচে এসে দাঁড়ায়। তাদের দেখে বিজয় এক কিনারে এসে ওপর থেকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কিছু বলবেন?'

জগলালরা সমস্বরে বলে, 'হাঁ।'

'ওপরে চলে আসুন।'

মঞ্চের গা ঘেঁষে আলগা ইট বসিয়ে বসিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে জগলালরা। তাদের চেয়ারে বসিয়ে বিজয় বলে, 'এবার বলুন।'

জগলাল এবং নাথুনি হাতজোড় ক'রেই আছে। তারা যা জানাল তা এইরকম। অনেক আগেই তাদের ইচ্ছা ছিল কম্‌লা এবং অর্জুনকে তাদের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু মান্ধাতাদের ভয়ে নিতে সাহস হয় নি। তা ছাড়া অর্জুন তাদের দামাদ হ'লেও, সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ। বিলকুল দেওতা-বরাবর। তাদের মতো অচ্ছুৎ কী করে নিজেদের ঘরে তাকে নিয়ে যায়, এটা ভাবতেও ভরসা পায় নি তারা। কিন্তু এখন বে-সাহারা মেয়ে-জামাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, তা কী ক'রে হ'তে পারে? তাই ভয়, সঙ্কোচ এবং সমস্কার ভেঙে তারা এগিয়ে এসেছে। মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে নিজেদের কাছে।

বিজয় বলে 'খুব ভাল কথা। আপনারা তো রইলেনই, কিন্তু আমরা আরো অনেককে চাই।'

আসলে বিজয়ের পরিকল্পনার মধ্যে সূক্ষ্ম একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। সে যে বহু লোকের বাড়িতে পালা ক'রে অর্জুনদের রাখতে চাইছে তার কারণ একটাই। সামাজিক দিক থেকে নমকপুরার যত বেশি লোক তাদের মেনে নেবে, ঐ আন্দোলন ততই সার্থক হ'য়ে উঠবে। অচ্ছুৎ এবং বামহন-কায়াথদের মাঝখানে যে বিশাল দেওয়ালটি আবহমান কাল মাথা খাড়া ক'রে

রয়েছে তা ভেঙে মাটিতে মিশে যাক, অর্জুনের কাছে সেটাই একমাত্র কাম্য।

নমকপুরা কলেজের স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি আনন্দ এতক্ষণ মঞ্চে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বলে, 'বিজয়জি, আমি ভাবছি, অর্জুনজি আর কমলাজিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

বিজয়ের চোখ হঠাৎ চকচক ক'রে ওঠে। তার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে হাজার ঘোড়া যেন ছুটতে থাকে। সে যা চাইছিল তা যেন করতলে পেয়ে গেছে। দৌড়ে মাইকের সামনে চলে যায়, বলে, 'আপনারা শুনে খুশি হবেন, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি আনন্দজি আর অর্জুনের শ্বশুর-শাশুড়ি অর্জুন আর কমলাকে সাহারা দিতে রাজী হয়েছেন। আপনারা আর কেউ যদি ওদের আশ্রয় দিতে চান, কৃপা ক'রে জানান।'

আনন্দ'র নামটা শোনার পর জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য হঠাৎ অনেকটাই বেড়ে যায়। এবার একজন একজন ক'রে বারো চোদ্দজন মঞ্চে উঠে আসে। তাদের বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ বা কায়াথ। দু-একজন খ্রিস্টানও রয়েছে। এরা সকলেই অর্জুনদের নিজেদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য মনস্থির ক'রে ফেলেছে।

এতগুলি আশ্রয়দাতা যে এভাবে এগিয়ে আসবে, ভাবতে পারে নি বিজয়। উত্তেজনায়, খুশিতে এবং এক ধরনের প্রবল আবেগে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হ'য়ে যাচ্ছিল। সবাইকে বসিয়ে সুরেশকে মঞ্চের একধারে ডেকে নিয়ে যায় সে। কেননা সুরেশই আগাগোড়া এই আন্দোলনে তাদের পাশে রয়েছে। উৎসাহ এবং পরামর্শ দিয়ে এই বিরাট যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। তাকে ছাড়া এতদূর এগিয়ে আসা সম্ভব হ'ত না।

বিজয় নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'এত লোক অর্জুনদের শেলটার দিতে চাইছে। প্রথমে কাদের বাড়ি পাঠাব?'

সুরেশ ঠোঁট টিপে হাসছিল। সে বলে, 'আপনার প্ল্যানটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি।'

বিজয় চমকে ওঠে, 'কিরকম ?'

'আপনি হয়ত নমকপুরার বহু লোককে দিয়ে সামাজিকভাবে অর্জুনদের অ্যাকসেপ্ট করিয়ে নিতে চান, তাই না ?'

বিজয় হেসে ফেলে। বলে, 'হ্যাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

সুরেশ বলে, 'তা হ'লে আমি বলব, জগলালদের দাবি সবার আগে থাকলেও আনন্দদের বাড়ি অর্জুনদের প্রথমে যাওয়া উচিত। কারণ ওরা ব্রাহ্মণ। ওদের বাড়িতে অর্জুনদের মেনে নিলে অন্য ব্রাহ্মণদের রেজিস্টান্স কমে যাবে। ধীরে ধীরে টেনশান কেটে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে।'

'আমিও এই কথাই ভেবেছি।' ব'লে আবার মাইকের সামনে এসে দাঁড়ায় বিজয়, 'ভাইয়ো আর বহেনজিরা, আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। আপনারা নিজের চোখেই দেখলেন, অনেকে অর্জুন আর কমলাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা মঞ্চে এসে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। নমকপুরায় যে সংস্কারমুক্ত, মানুষের মতো মানুষ অনেকেই আছেন, সেটা জেনে আমি গৌরব বোধ করছি। আমি জানি এরপর আরো অনেকে অর্জুনদের আশ্রয় দেবার জন্যে এগিয়ে আসবেন। যাই হোক, এখন পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি অনন্দজির বাড়িতে সবার আগে যাবে অর্জুনরা। তারপর পালা ক'রে অন্য সকলের বাড়িতে।' যতদিন না ওদের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে, নমকপুরার সব বাড়িই হোক ওদের বাড়ি।'

বিজয়ের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই চারিদিকে হাততালি শুরু হয়ে যায়। আওয়াজ একটু থিতিয়ে এলে বিজয় ফের শুরু করে, 'এখনই আমরা আনন্দজিদের বাড়ি যাব। আমার অনুরোধ আপনারা আমাদের সঙ্গে অর্জুনদের আনন্দজির বাড়ি পেঁছে দিতে যাবেন।'

জনতা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জরুর, জরুর।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, বিপুল জনতা অর্জুন এবং কমলাকে সামনে রেখে নমকপুরার বড় সড়ক ধ'রে ব্রাহ্মণ টোলিতে আনন্দদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।